সুভাষ স্মৃতি

বিশ্বনাথ দে
সম্পাদিত

সাহিত্যম্ ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়। ১৩৬৬

প্রকাশক
শ্রীনির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম্
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

ব্লক-প্রচ্ছদ ও অন্যান্য চিত্র মুদ্রণে
ন্যাশনাল হাফটোন কোম্পানী
৬৮, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
শ্রীহরি প্রেস
১৩৫এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

উৎসর্গ

আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকান্তরিত সেনানীদের

স্মৃতির উদ্দেশে

SUBHASH SMRITI

বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত

'স্মৃতি' পর্যায়ে আমাদের অন্যান্য বই :

বিদ্যাসাগর স্মৃতি

মধুসূদন স্মৃতি

শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতি

বিবেকানন্দ স্মৃতি

নিবেদিতা স্মৃতি

শ্রীঅরবিন্দ স্মৃতি

শরৎ স্মৃতি

নজরুল স্মৃতি

রবীন্দ্র বিচিত্রা

মানিক বিচিত্রা

সুকান্ত বিচিত্রা

নজরুল-কথা

ভূমিকা

বাঙালির প্রাণ-পুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

দেশের জন্য নিঃশেষে মন-প্রাণ-জীবন দান করে দিয়েছেন, এমন মানুষ আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র ছাড়া আর কেউ আসেননি বললেও চলে। অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল অনিশ্চয়ের পথকে নিজের জয়যাত্রার পথ হিসাবে নির্বাচন করে সুভাষচন্দ্র সারা বিশ্বের কাছে বাঙালিকে শ্রদ্ধেয় করে তুলেছেন। বাংলার মানুষ যে শুধু কাঁদতেই জানে না, কণ্টকময় দুর্গম পথের নির্ভীক যাত্রীও হতে পারে, সুভাষচন্দ্রের আগে তার নজির বড় একটা কেউ দেখাতে পারেননি। আঘাতের পর আঘাত হেনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ব্যস্ত-উত্যক্ত করে তুলেছেন যিনি, তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছাড়া আর কেউ নন।

তাই শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের অযুত জন-মানসের মন-মন্দিরে, সুভাষচন্দ্রের আসন আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

ইদানীং সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে অনেক জীবন-কথা ও স্মৃতিচারণ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে জন-সমাদৃত হচ্ছে, এটা অত্যন্তই আনন্দের কথা। সুভাষচন্দ্রের নিকট-সান্নিধ্যে এসেছিলেন এমন অনেক কবি-সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক কর্মীর লেখা প্রামাণ্য-গ্রন্থ আজকাল পাওয়া যায়, যা পড়লে সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তি-মানস সম্পর্কে ধারণায় আসা সম্ভব হয়। কিন্তু সমগ্র সুভাষচন্দ্র মানুষটির জীবন, তাঁর সংগ্রামের কাহিনী ও নানাজনের লেখার মাধ্যমে তাঁর হৃদয়-মনের সঠিক ঘরোয়া ছবিটি পাওয়া যাবে—এমন একটি গ্রন্থের খুবই অভাব ছিলো। এই কথা মনে রেখেই সুভাষ-জীবনের নানাদিক, তাঁর নিকট-সান্নিধ্যে আসা মানুষ-জনের লেখা স্মৃতিচারণ-গ্রন্থের অংশবিশেষ নিয়ে এই 'সুভাষ-স্মৃতি' সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হলো।

কেবলমাত্র ইংরাজী বর্ষের প্রথম মাসের তেইশ তারিখে সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে তাঁর ফটোতে মালা পরানোটাই যে বড় কথা নয়, এটা আমাদের ছেলে-মেয়েদের আজকের দিনে বিশেষ করে জানা দরকার। সুভাষচন্দ্রকে সঠিকভাবে শ্রদ্ধা জানাতে হলে আগে জানতে হবে এই মহামনীষীর কঠিন

কর্মময় জীবনের কথা, তাঁর আদর্শের কথা, তাঁর জীবনের আশা নিরাশা, সুখ-দুঃখ, সংঘাত ও সংগ্রামের কাহিনী। এই কথা ভেবে, বিশেষ করে আমাদের কিশোর বয়স্ক পাঠক-পাঠিকা ও সাধারণ মানুষের কাছে বহুল প্রচারের জন্য এতো অল্প মূল্য ধার্য করে 'সুভাষ-স্মৃতি' প্রকাশ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত জানাই, সুভাষচন্দ্রের স্বরচিত গ্রন্থাবলী, তাঁর মূল্যবান চিঠিপত্রের সংগ্রহ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করে, এলগিন রোডের নেতাজী ভবনে প্রতিষ্ঠিত 'নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো' বিশ্বের নেতাজী-কৌতূহলী পাঠক-সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করেছেন। শুধু তাই নয়, সুভাষচন্দ্র-বিষয়ক সর্বরকমের গবেষণা-কার্যে সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য 'নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো'-র দক্ষিণ হস্ত সদাই প্রসারিত থাকতে দেখা যায়। সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ শিশিরকুমারবসুর সুচিন্তিত ও সুষ্ঠু পরিচালনায় এই রিসার্চ ব্যুরো আজ একটি পূর্ণাঙ্গ সুভাষ-গবেষণা সদনে পরিণত হয়েছে। এটা অত্যন্ত আশা ও আনন্দের কথা। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বাজে গল্প-কথা প্রকাশ করা ও আকাশ-কুসুম রচনা করার অবকাশ আজ আর নেই। সুভাষ-চর্চাকারীদের সঠিক পথে চালনা করার জন্য 'নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো'-র দাক্ষিণ্য আজ সর্বজনগ্রাহ্য। এজন্য শুধু সুভাষ-চর্চাকারীরাই নন, দেশের আপামর জনসাধারণ ও পাঠক সমাজ রিসার্চ ব্যুরোর ঋণ স্বীকার করবে।

সুভাষচন্দ্রের চিত্র ও মূল্যবান পরামর্শ দান করার জন্য 'নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো'কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি 'সুভাষ-স্মৃতি'-র সমগ্র লেখক ও লেখার স্বত্বাধিকারীদের—যাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া এই সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। হিটলার সম্পর্কে লিখিত সুভাষচন্দ্রের মূল্যবান পত্রখানি আমাদের এই সংকলনে প্রকাশ করার জন্য দিয়েছেন কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর মূল্যবান রচনাটি শ্রীমতী সুতপা চক্রবর্তীর সৌজন্যে পেয়েছি, শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনের অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ লেখাটি পেয়েছি 'রোশনাই' সম্পাদিকা গীতা দত্ত ও প্রকাশক মৃণাল দত্তর সৌজন্যে, এঁদের কাছে আমি অশেষ ঋণী। বইপত্র ও কয়েকটি ফটোর ব্লক দিয়ে আমার যে সব বন্ধু সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন—তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

—বিশ্বনাথ দে

সূচীপত্র

ভাষণ :

স্মৃতি-কথা :

জীবন-কথা :

[ফটো নেতাজী রিসার্চ বুরো-র সৌজন্যে].

১৯০২ সালে কটকের বাগান বাড়ীতে। বাঁদিক থেকে সুধীরচন্দ্র, সতীশচন্দ্র, সুনীলচন্দ্র, জানকীনাথ বসু, সুভাষচন্দ্র (৫ বছর বয়স), শরৎচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্র
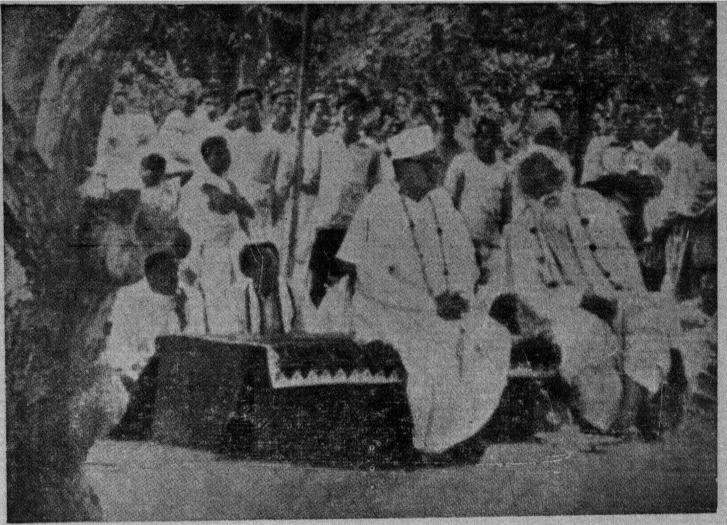
শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলায় রবীন্দ্রনাথের পাশে সুভাষচন্দ্র

১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর—আন্দামান সেলুলা জেলের মধ্যে নেতাজী
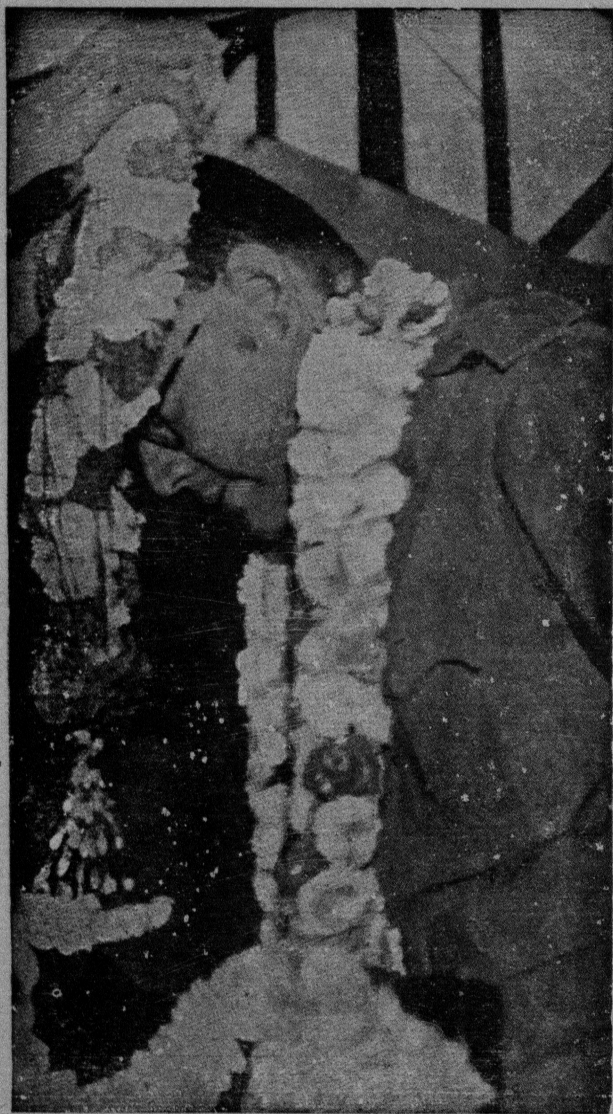
দেশনায়ক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুভাষচন্দ্র, বাঙালি কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি।...দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। রাজশাসনের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, আত্মবিরোধের দ্বারা বিক্ষিপ্ত-শক্তি বাংলাদেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ আজ ঘনীভূত। নিজেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্বলতা, বাইরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধশক্তি। আমাদের অর্থনীতিতে কর্মনীতিতে শ্রেয়োনীতিতে প্রকাশ পেয়েছে নানা ছিদ্র, আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে হালে দাঁড়ে তালের মিল নেই। ...এইরকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত, যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন।

সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো-আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা —তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে অভিভূত করেনি; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে।

দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানোনি। তোমার এই চারিত্রশক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।...

বাঙালি অদৃষ্ট-কর্তৃক অপমানিত হয়ে মরবে না এই আশাকে সমস্ত দেশে তুমি জাগিয়ে তোলো: সাংঘাতিক মার খেয়েও বাঙালি মারের উপরে মাথা তুলবে। তোমার মধ্যে অক্লান্ত তারুণ্য, আসন্ন সংকটের প্রতিমুখে আশাকে অবিচলিত রাখার দুর্নিবার শক্তি আছে তোমার প্রকৃতিতে। সেই দ্বিধাদ্বন্দ্বমুক্ত মৃত্যুঞ্জয় আশার পতাকা বাংলার জীবনক্ষেত্রে তুমি বহন করে আনবে সেই কামনায় আজ তোমাকে অভ্যর্থনা করি দেশনায়কের পদে—অসন্দিগ্ধ দৃঢ়কণ্ঠে বাঙালি আজ একবাক্যে বলুক, তোমার প্রতিষ্ঠার জন্যে তার আসন প্রস্তুত। বাঙালির পরস্পরবিরোধের সমাধান হোক তোমার মধ্যে, আত্মসংশয়ের নিরসন হোক তোমার মধ্যে, হীনতা লজ্জিত ও দীনতা ধিক্কৃত হোক তোমার আদর্শে—জয়ে পরাজয়ে আপন আত্মসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখার দ্বারা তোমার মর্যাদা সে রক্ষা করুক।

...বাঙালির সম্মিলিত ইচ্ছা বরণ করুক তোমাকে নেতৃত্বপদে, সেই ইচ্ছা তোমাকে সৃষ্টি করে তুলুক তোমার মহৎ দায়িত্বে। সেই ইচ্ছাতে তোমার ব্যক্তিস্বরূপকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হোক সমগ্র দেশের আত্মস্বরূপ।

আমি আজ তোমাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি।...

[মে, ১৯৩৯]

সুভাষ-স্মৃতি

বাসন্তী দেবী

আজ সুভাষের জন্মদিন। তাই ওর কথাই আজ সকাল থেকে খালি বার বার মনে পড়ছে।

সুভাষ সেই যে গেল—আর এল না। ও যে নেই একথা ভাবা এখনও আমার পক্ষে ভয়ানক কষ্টের। কিন্তু ও যে আছেই একথাই বা আর কি করে জোর করে বলি। শুধু আমি তো নয়, দেশের কোটি কোটি মানুষই তো ও কথা ভেবে এখনও দিশেহারা।...

কেমন খ্যাপাটে ছিল ও, শোনো। আমার ওপর ওর যত জেদ, যত আবদার, যত অভিমান। বলা নেই, কওয়া নেই, সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরত ফিরত। রাত ১১টার পরে হুম্ করে এসে হাজির আমার কাছে। এসেই হুকুম—'শীগগির খেতে দিন, ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

আমি বলি, 'ওমা, সেকি কথা! খাওয়া-দাওয়া কখন শেষ—কাজের লোকেরা সব পাট চুকিয়ে বিশ্রাম নিতে চলে গেছে। এখন আমি তোমার জন্য রান্না করতে বসি আর কি!'

বাবু কি আর সে কথা শোনেন। আবদার ধরে বসেছেন—'কেন, ভাতে ভাত খাব।'

তবু বোঝাই, 'ওরে লক্ষ্মীছাড়া, ওদিকে যে তোমার মা না খেয়ে-দেয়ে খাবার নিয়ে পথ চেয়ে বসে আছে।'

কিন্তু বৃথা অনুরোধ। শেষ পর্যন্ত ঐ রাত্রে যা হোক দুটো সেদ্ধ করে, আমাদের পূর্ব বাংলায় যাকে বলে ভাতে-ভাত রেঁধে, পেট ঠাণ্ডা করে না দেওয়া পর্যন্ত আমারও রেহাই পাবার কোন উপায় ছিল না। তাই বুঝি ওর মা আমাকে প্রায়ই একথা বলতেন—'ওর আমি জন্মই দিয়েছি—কিন্তু ওর মা তো আপনি।'

এমনিতে সহজে কঠোর হলেও মনের ভেতরে ওর যে কী আশ্চর্য কোমলতা ছিল তা হয়ত তোমরা অনেকেই জানো না।

ও যখনই যেখানে যেত, ওর পেছনে গোয়েন্দা লেগে থাকত। একদিন রাত্রে ও আমাদের বাড়ী এসেছে—এসেই যেমন অভ্যেস, খাটের ওপর টান হয়ে শুয়ে পড়া—কিছুটা বিশ্রাম, সেই অবকাশে বোধ হয় নতুন কিছু চিন্তার মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া। সেদিন, লক্ষ্য করলাম বাড়ীর বিপরীত দিকের ফুটপাথে একজন ঠিক ঘোরাঘুরি করতে লেগে গেছে। আমি সুভাষকে কিছুতেই বাড়ী পাঠাতে পারছি না। বাইরে তখন টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে।

শেষে বলি—'হ্যাঁ সুভাষ, তুমি তো দিব্যি এখানে পড়ে রইলে, আর ওই বেচারা যে তোমার জন্য বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় ঠায় দাঁড়িয়ে—ও তো নড়তে পারছে না ডিউটি ফেলে।'

সুভাষ মজা পেয়ে বলে উঠল, 'ভিজুক ব্যাটা দাঁড়িয়ে, যেমন পেছনে লেগেছে।'

আমি বলি, 'তা ওর কী দোষ বলো। বেচারার চাকরি বাঁচাতেই না এই কষ্ট! কিন্তু ওর তো বাড়ীতে স্ত্রী কিংবা মা আছে, ছেলে-মেয়ে কিংবা ভাইবোন আছে। ভেবে দেখো তো, ওর জন্য তাদেরও কত ভাবনা হচ্ছে'—

এটুকু বলতেই দেখি সুভাষের চোখ সজল, কোনমতে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে, চোখাচোখি হতে হয়ত বা একটু লজ্জিতও হল। আমি ওর অবস্থা বুঝতে পারছিলাম—অন্যের কষ্ট ও যে কিছুতেই সহ্য করতে পারত না—এমন কি, কানে তেমন কিছু শোনামাত্র ওর মন যেন ব্যথায় গলে পড়ত।...

সেই সুভাষ।

তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে।—ঠিক করলাম আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়ব সে আন্দোলনে।

সুভাষ তো কিছুতেই রাজী হবে না। অথচ সে তখন 'বি পি সি সি'র

প্রেসিডেণ্ট। তার অনুমতি না নিয়ে আমাদের যাওয়াও চলে না। সে বলে, 'আগে আমরা যাই, তারপর তো মেয়েরা। এখনও আপনাদের যাওয়ার সময় হয়নি।'

তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি—কিন্তু সে কি বোঝে। অনেক করে বুঝিয়ে শেষে রাজী করলাম। ৬ই মে আমরা আন্দোলনে যোগ দিলাম। ওঁর সম্মতি তো আগেই পেয়েছি। আমি, আমার ননদ উর্মিলা দেবী আর সুনীতি মিত্র গ্রেফতার হলাম।—আমাদের নিয়ে যাওয়া হল বটতলা থানায়।

এদিকে আমাদের গ্রেফতারের খবর পেয়ে প্রায় পাঁচ হাজার লোক বটতলা থানা ঘেরাও করে ফেলেছে। দারুণ উত্তেজনা। সেই জনতাকে কোন শক্তি দিয়েই রোখা যাচ্ছে না।

পুলিশ অফিসারকে বললাম, আমাদের বাড়ীর গাড়ী আনার ব্যবস্থা করে দিতে—সেই গাড়ীতেই আমি জেলে যাবো, নইলে ওঁদের গাড়ীতে আমাদের নিয়ে যাওয়ার ধাক্কা ওঁরা সামলাতে পারবেন না।

আমরা লালবাজারে এলে একজন উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসার জানালেন, আমরা যদি লিখিতভাবে শপথ করি আন্দোলনে আর যোগ দেবো না, তবেই আমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। মজার কথা শোনো, শপথই যদি করবো তবে গ্রেফতার হলাম কেন!

কর্তৃপক্ষ পড়লেন মহা বিপদে, একদিকে স্বাধীনতাকামী ক্ষুব্ধ দেশবাসী—আর একদিকে আইন। যা হোক, আমাদের জেলে পাঠানোই সাব্যস্ত হল।

গেলাম জেলে।

ওমা, রাত দুটোয় হাঁকাহাঁকি।

কী ব্যাপার?

মুক্তির আদেশ এসে গেছে। চলে যেতে হবে।

জেলের অধ্যক্ষকে বললাম—'রাতটা কাটুক, কাল সকালেই না হয় যাবো।'

কিন্তু না, গভর্নরের আদেশ অবিলম্বে মুক্তির।

রাত দুটোয় অগত্যা বাড়ী।

আমাদের দেখে উনি তো অবাক, সেই সঙ্গে মহা ক্ষুণ্ণও হলেন।

—'ফিরে এলে?'

—'কী করবো? ছেড়ে দিলে যে।'

রাত দুটোয় সুভাষও কোত্থেকে খবর পেয়ে এসে হাজির হয়েছে। মুখ তার তখনও কালো, সে মুখে কালবৈশাখীর গভীর অন্ধকার।

বুঝলাম, সুভাষ তখনও শান্ত হয়নি।

হেসে বললাম—'কি, এবার হয়েছে? ফিরে তো এলাম; আর কেন?'

কালবৈশাখীর মেঘ সরে গেল, শুরু হল বর্ষণ। সুভাষের সে কী কান্না! কী ভালোই যে বাসতো আমাকে!···

সুভাষ কিন্তু খুব ভালো রাঁধতে পারতো, তা জানো? ওঁর জন্য দিনের খাবার তো আমিই তৈরী করে নিয়ে যেতাম—রাত্রে ওঁর রান্না জেলের মধ্যে সুভাষ তৈরী করে দিতো। আর আমার কাজ কি শুধু রোজ সকালের খাবার বয়ে নিয়ে যাওয়া? রোজই সুভাষের ফর্দ থাকতো—বাজার থেকে এটা আনা চাই, ওটা আনা চাই। আর তার চাই বললেই তো সে এক প্রচণ্ড দাবি হয়ে দাঁড়ানো!

অবশ্য মায়ের মতো বলে ছেলের আবদার ছিলো যেমন, তেমনি বন্ধুর মতো তার মনের গোপন কথাগুলোও আমার কাছেই বলা চাই। ওর দুর্বলতা কোথায়, কতটুকু—তা ও আমার কাছে গোপন করতে পারতো না- এই জন্য কতো সময় কতো যে আমরা হাসি-ঠাট্টাও করেছি!

আজ সে সব দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে।

[দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহধর্মিণী বাসন্তী দেবীর এই রচনাটি শ্রীমতী সুরূপা চক্রবর্তীর দ্বারায় অনুলিখিত।]

নজরুলের গানে আছে "দুর্গম গিরি কান্তার মরু" পার হয়ে আমাদের অভিযানে নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হবে, কিন্তু নাবিকের লক্ষ্য স্থির থাকা চাই। সুভাষচন্দ্র বসু এক সময়ে চেয়েছিলেন অসাধ্য সাধন ক'রতে, একশো বছরের উপর যে বৃটিশ-শাসন এ দেশে কায়েম হয়েছিল তার গোড়ায় ঘা দিয়ে টলিয়ে দিতে এবং সুযোগ নিয়েছিলেন সেই সময়ে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের সঙ্গে বৃটিশ ও সম্মিলিত মিত্রশক্তির সংঘাত বাধে। এই দেশ থেকে পাহারার শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে হাজার হাজার মাইল গোপনে অতিক্রম করে তিনি গিয়েছিলেন—তার খবর এখন অনেকাংশে আমরা জেনেছি—তবে সবটা পরিষ্কার নয়, বিশেষতঃ ইউরোপে গিয়ে কিভাবে হিটলার-মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর সমঝোতা হয়েছিল সে বিষয় অনেকটা রহস্যের যবনিকায় ঢাকা। হিটলারী একনায়কত্ব ইউরোপের লোকেও মেনে নেয়নি সকলে। রোঁলার ডায়েরীতে সুভাষের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার কথা আছে। কৌতূহলী পাঠক সে সব কথা খুঁজলে জানতে পারবেন।

এ দেশে তখন কংগ্রেস নীতি গান্ধীবাদী। সকলে ভেবেছিলেন অসহযোগ চালিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে যুদ্ধের মধ্যে পঙ্গু করে দেবেন, আবার কম্যুনিষ্টপন্থী যাঁরা ছিলেন তাঁরা অনেকে হিটলারের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে প্রচার করেছিলেন। তখন কংগ্রেসের অনুচরদের সঙ্গে তাদের মতদ্বৈধতা এবং পরস্পরের প্রতি দোষারোপের পালা শুরু হয়েছিল। সেই থেকে ঝগড়ার শুরু, এখনও শেষ হয়নি।

জাপানের সঙ্গে সুভাষ মিতালী করতে চেয়েছিলেন। তার আগে শোনা যায়, রাসবিহারী বসু অনেক প্রচার চালিয়েছিলেন। তিনি

ভেবেছিলেন জাপান এশিয়ার ত্রাণকর্তারূপে রঙ্গমঞ্চে নামবে। সুভাষ এসেছিলেন সিঙ্গাপুরে এবং অল্প কিছুদিনের জন্য দেশের নানা জাতীয় সেপাইদের অধিনায়কত্ব করে অভিযান চালিয়ে কোহিমা পার হয়ে ভারতের জমিতে এসেছিলেন—সে সব কথা চিরকাল ভারতের ইতিহাসে অমর অক্ষরে লেখা থাকবে।

বহু শতাব্দী ধরে বিদেশী শত্রু ভারতের সীমানা পেরিয়ে এ দেশে হামলা করেছে—পরস্পরের মধ্যে বিবদমান রাজশক্তিদের হতবল করেছে। সারা দেশকে অধীনতার অপমানে জর্জরিত করেছে। এই প্রথম ভারতের সন্তান ভারত মাতার শৃঙ্খল মোচন করবার জন্য প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে নির্ভয়ে দাঁড়াতে সাহস করেছিলেন—সে কথা ভোলার নয়। পরে অবশ্য কি হল জানা নেই—এই বীর সন্তান গগনে উল্কার মত আবির্ভূত হয়ে আবার কোথায় মিলিয়ে গেলেন সেটার ইতিহাস জানা নেই—নানা লোকে নানা কথা বলে - এ বিষয় অনেকটা আন্দাজী। আমার মনে হয়, সুভাষ বেঁচে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই দেশে ফিরে আসতেন—লোকে যে বলে তিনি নির্যাতন এড়িয়ে আত্মগোপন করে আছেন সেটা তাঁর স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায় না।

কলকাতা সহরের ময়দানের মধ্যে গান্ধীজীর অগ্রগামী মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। কলকাতায় শ্যামবাজারে পাঁচমাথার মোড়ে নেতাজীর ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। দুই-ই অবশ্য নির্ভীক অভিযানের প্রতীক—আমি এক বন্ধুকে বলেছিলাম এ যেন তীর্থ-সন্ধানী সন্ন্যাসীর পদযাত্রা। সুভাষের মূর্তি সেই ভাবের এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর রূপ—আজকে এই দুই নায়কের পেছনে অনুযাত্রী কে আছেন জানি না, কারণ দেশের মধ্যে এখন যারা মুখর—তারা অনেকেই গান্ধী বা সুভাষের আদর্শের কথা ভুলে গিয়েছে। গণতন্ত্র বা বিশ্বতন্ত্র এসব অনেক হেঁদো কথা আমরা শুনেছি। আমি বৃদ্ধ বয়সে রাস্তায় বাহির হই, কালো লাল নানা কালিতে নানা শ্লোগান দেখতে পাই—চোখের জ্যোতি ম্লান হয়ে এসেছে, দেশ-এর ভবিষ্যৎ দেখবার মত জ্যোতি আর নেই।

আমার বন্ধু সুভাষ

দিলীপকুমার রায়

সুভাষের সঙ্গে আমার মিল ছিল না, তার স্বধর্ম আমার নয়। অবশ্য দু'জনেই জানতাম যে, আমরা আলাদা ছাঁচে গড়া। সুভাষের জীবন আধ্যাত্মিক পথে চ'ল্‌বে না এ-কথাটা যতই বুঝতে পারি, দুঃখ আমার ততই বাড়ে। তা'র অস্থিতে মজ্জাতে রয়েছে বিপুল কর্ম-চেতনা, জরুরী কাজের জন্য সব সময়েই তৈরী যেন সে। সেও বুঝেছিল যে, আমার পথ আর তা'র পথ এক নয়। তবু আমরা বরাবরই ছিলাম পরস্পরের পরম বন্ধু। ভুল বোঝার মেঘ সে আকাশকে কোনদিন আচ্ছন্ন করেনি কোন মুহূর্তেই। আমাদের অন্তর্গূঢ় ভালবাসা এসব বাহ্যিকভাবে ছাড়িয়ে গভীরে পৌঁছেছিল বই কি। হ্যাঁ, সুভাষ ভালো ক'রেই জানত, সে যদি আমাকে তা'র পথে টানবার জন্য জোর করে তবে হয়ত আমি তা'র কথা এড়াতে পারব না—তাকে মেনে নেবো। রাজনীতির পথ তা'র জীবনের পথ আর আমি পছন্দ করি না সেটা—সুভাষের এজন্য দুঃখের অবধি ছিল না। কিন্তু জীবনে কখনো মুখ ফুটে সে খেদ করেনি এজন্য। কেবল একবার মাত্র, কোন্ অতর্কিত মুহূর্তে, বেদনার আতিশয্যে সে একটা কথা ব'লেছিল। আমি আত্মীয়স্বজন, সংসারের সকল বন্ধন কেটে দিয়ে যৌগিক জীবন যাপনের জন্য শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে এসেছিলাম—১৯২৮ সালে। সেই সময়ে সে আমার এই পলায়নী মনোবৃত্তির নিন্দা করেছিল। কিন্তু তা'তে ক'রে সে এই বিপথ-চারীটিকে ভুলতে পারেনি, বরং তারপর থেকে সে যেন আমায় বেশি ভালবেসেছে। তাই আমি বলবই বলব যে, সুভাষ কখনো অপরের ওপর জুলুম করত না, ঝগড়া-বিবাদ তো দূরের কথা। যারাই তা'র সঙ্গে থেকে কাজ করেছে, দাঁড়িয়েছে তা'র পাশে এসে—

কয়েকটি দিনের জন্যও তা'র অন্তরের গভীর।সহানুভূতির ছোঁয়া পেয়েছে, তা'রাই নিশ্চয় এ-কথা স্বীকার করবে যে, সুভাষ কোন-দিনও প্রভুত্ব করতে চায়নি, শাসন করেনি, নিজস্ব মতবাদ জোর ক'রে কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়নি, মানুষের ব্যক্তিত্বকে সে মর্যাদা দিত, প্রত্যেকেরই বিচারশক্তিকে সে স্বাধীনতা দিয়ে এসেছে। হুকুমের হাকিম হবার ম'ত দুর্জয় মনোবৃত্তি তা'র কোনদিন ছিল না— নীতিতে তা'র বিশ্বাস ছিল এত উজ্জ্বল, হৃদয়ের প্রেমাধিকতা ছিল এত প্রবল, মনোজগতে দরদ ছিল এত খাঁটি যে, আর সবাইকে হুকুম তামিল করিয়ে যে বড় হবে এ সে চাইতো প্রকৃতই না। এ-কথারও একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আমার ব্যক্তিগত জীবন থেকেই দিই না কেন :

আগেই বলেছি, তার সঙ্গে আমার মতের গরমিল ছিল—দু'জনে সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির আমরা, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এ পার্থক্য বেড়েই গেছে। শিল্পকলা, কবিতা সঙ্গীতের দিকে আমার অনুরাগ বেড়ে চলেছে যত, সুভাষের দেশপ্রাণতাও তেমনি গভীর হয়ে উঠেছে দিনে দিনে ; ভারতের স্বাধীনতা তার কাছে হয়ে উঠেছে দিব্য সাধনের মতন একটা কিছু। কিন্তু ওদিকে আমার মনে আবার দেশপ্রেম সাড়া জাগায় না, বুঝতে পারি মন ঝুঁকছে আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে, ঈশ্বরাভিমুখী হয়ে উঠেছি আমি। রাজনীতির জটিলতা আমার ভালো লাগে না। আপাতত ওসব কথা থাক, যা বলছিলাম সেই ঘটনাতে ফিরে আসা যাক। ১৯২৩ কিংবা ২৪ সাল, সি. আর. দাশ সবে স্বরাজপার্টি গঠন করেছেন। অল্পদিনের মধ্যে স্বরাজপার্টি বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন ক'রে নিল। সারা বাংলা মেতে উঠল। সুভাষ তখন চিত্তরঞ্জনের উপযুক্ত সাগ্‌রেদ্। আমরা সবাই তাকে বলি চিত্তরঞ্জনের 'দক্ষিণ হস্ত' ; চিত্তরঞ্জন আমায় নির্বাচন যুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য বললেন। প্রতিপক্ষ নদীয়ার মহারাজা। সেজন্য ভাবিনি ততটা, যতটা ভেবেছিলাম এ পথে আমার আসা ঠিক হবে কি না।

চিত্তরঞ্জনের ত্যাগকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাঁর—শুধু তাঁর কেন, বরাবরই রাজনীতিতে আমার অন্তরে সাড়া দেয় না। কারণ যত দিন যায় আমার জীবনে বৈরাগ্য আসে গভীর হ'য়ে। ভেবে-চিন্তে শেষকালে সুভাষের কাছে গিয়ে বললাম আমার অসুবিধার কথা। তারপর বললাম—'কিন্তু সুভাষ, তুমি যদি রাজনীতিতে নামতে বলো আমায়—রাজী আছি। তার জন্যে যদি জেলে যেতে হয় তো যাবো। তোমার কথা রাখতে সব সময়ে আমি তৈরি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, মনেপ্রাণে আমি রাজনীতির পরিপন্থী। সেকালের যুগে রাজনীতির গৌরব ছিল হয়ত, কিন্তু আজ সভ্যতাকে পঙ্গু করে রেখেছে এই রাজনৈতিক দলাদলি।···এখন বলো আমায় কী করতে হবে?'

আমার দেশপ্রীতির অভাবে সুভাষ খুবই ব্যথিত হয়েছিল, তার চোখের পাতা ক্ষণেকের জন্য নত হয়েছিল। সে আয়ত দৃপ্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। শেষে আমার পিঠের ওপর হাত রেখে বললে সে—'দিলীপ, তুমি কি আমায় পাগল মনে কর নাকি? আমি জানি এ পথ তোমার নয়। শুধু শুধু আমার জন্যে তোমার আদর্শ বিসর্জন দিতে বলব কেন? তুমি তোমার স্বধর্ম পথে চলো। দিলীপ, আমি ঠিক অত ছোট রাজনীতিক নই। অন্যের মত আমি বলি না, ভারতের সবাই জীবের আশা-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে দেশের জন্য আত্মনিয়োগ করুক—লড়াই করুক। তার চেয়ে যদি তুমি তোমার স্বভাবের গতিকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে আপনার লক্ষ্যে উপনীত হ'তে পার, তাতেই তোমার সার্থকতা, সেই তো তোমার সব চেয়ে বড় দেশের কাজ করা হ'ল। মনুষ্যত্বকে ফুটিয়ে তোলাই না মানুষের কাজ।'

তা'র এ-কথা যেন আমার চোখে মানুষটিকে নূতন ক'রে তুলে ধরল। সত্যই তা'র নূতন পরিচয় পেলাম সেদিন। সুভাষ তো কই আমায় জোর ক'রে দলে ভিড়িয়ে নিল না। সে যদি সত্যই

প্রভুত্বের পক্ষপাতী হ'ত, সে যদি সবাইকে এক ছাঁচে ঢালতে চাইত, তা'হলে সেদিন আমায় অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারত কি? এ থেকেই বোঝা যায় যে, সুভাষ কাউকে মতের বিরুদ্ধে জুলুম করতে চাইত না। ফ্যাসিস্তবাদী সে ছিল না মোটেই। যারা নিজেদের দলগত স্বার্থ খুঁজে বেড়ায় তারা তো স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে অমন অনেক কথাই বলে,—সে সব অসার কথা যে কতদূর মিথ্যা তা যারা সুভাষকে ভালো ক'রে দেখেছে তারা জানে।...

ওর স্বভাবের সঙ্গে জড়িয়েই ছিল এই সমবেদনা বোধের কোমলতা, দিন দিন বয়সের সঙ্গে এটাও বেড়েই যেতে দেখেছি। কি জানি, এটা হয়ত দুর্বলের প্রতি শক্তিমানের অনুকম্পা। তা'র এই স্বভাবসুলভ কমনীয়তার সুযোগ নিয়ে অনেক আগাছা পরগাছা এসে তা'র জীবনকে বিড়ম্বিত করেছে কতবার। কত যে বর্ণচোরা বহুরূপী আর্তকণ্ঠে আশ্রয় ভিক্ষা করেছে এবং পেয়েছে। আর এইসব বন্ধুদেরই কেউ কেউ গোয়েন্দাগিরি ক'রে পুলিশের কাছে সুভাষকে ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাদের স্বরূপ জানবার পরও সুভাষ তাদের দুঃসময়ে সাহায্য না ক'রে পারেনি। আসলে সুভাষের এই ধরনের অনেকগুলি অপোগণ্ড পোষ্য ছিল, সুভায ছিল এদের অন্নদাতা। তার মানে এ নয় যে, এরা ছাড়া কেউ তার সাহায্য পায়নি। যারা সত্যকার যোগ্য ব্যক্তি তাদের দিকেও সুভাষের নজর ছিল ঠিকই। যেসব রাজবন্দী সত্যকার দেশসেবার কাজে জীবনের সব কিছু বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁরা বড় একটা সুভাষের কাছে সাহায্য চাইতেন না, কারণ তা'র দরকার হ'ত না। সুভাষ নিজে থেকেই তাঁদের দুঃস্থ পরিবারবর্গকে নানাভাবে সাহায্য করত, সেদিকে তা'র খরদৃষ্টি থাকত সর্বদা। আমি নিজেও সুভাষের কথামত কয়েকবার গানের আয়োজন করেছি টাকা তোলবার জন্য। এতে সুভাষ অসম্ভব কৃতজ্ঞ হ'য়ে উঠত—যেন আমি তা'র ব্যক্তিগত কোনো উপকার করতে

লেগে গেছি। তা'র সে কৃতজ্ঞতা দেখে আমার কৌতুক বোধ হ'ত। সত্যি, এতে সুভাষের ব্যক্তিগত স্বার্থ কী থাকতে পারে! একটা কারণ অবশ্য ছিল, সুভাষ জানত যে, আমি মনেপ্রাণে রাজনীতির বেদরদী, তবু যে এসব ব্যাপারে সহায়ক হই সেটাও তা'র কাছে ব্যক্তিগত দরদ বলেই মনে হ'ত। কতদিন তাকে তামাশা ক'রে বলেছি, 'তুমি যে কোনদিন দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা হ'তে পারবে এ আমার বিশ্বাস হয় না, তা সে তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন। হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি একদিক দিয়ে। অসাধুতায় তোমার তেমন হাতযশ নেই, ফলে কোনদিন ওপথে তোমার উন্নতির আশা দেখি না। কারণ, তুমি মিথ্যে কথা যদি একটা বলো তো সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যাবে, সবাই চিনে ফেল্‌বে। এ ধরনের আনাড়ি লোকের কাজ নয় রাজনীতি করা বা ধাপ্পাবাজি করা কিংবা নেশনেতা হওয়া।'

কয়েক বছর পরে আমার এ কথাটা সুভাষ আবার আমাকেই শুনিয়েছিল। জেলে যাবার আগে। সে জানত যে, আবার সে বন্দী হবে। সেদিনটির কথা আমার বেশ মনে আছে। আশ্রম থেকে কলকাতায় এসেছি। আমার কৃতী ছাত্রী উমা বসুকে গান শেখানো নিয়ে আমি ব্যস্ত। মোটর গাড়িতে বসে আমি আর সুভাষ পাশাপাশি, সে আমার হাঁটুর উপরে হাত রেখেছে। আশ্রমে ফেরবার আগে সুভাষের জন্য বারাকপুরে একটি সম্বর্ধনা উৎসবের আয়োজন হয়েছে, গান শোনাবো আমি।

'দিলীপ', বললে সুভাষ, কণ্ঠে তার আকুলতা—'তুমি এত তাড়াতাড়ি তোমার নিরালা আশ্রমে চলে যেয়ো না। তোমাকে আমার বড় দরকার।'

'—কিন্তু তুমি কিছুতেই মন থেকে এ-কথা বলছ না, সুভাষ।' আমি অবাক হ'য়ে বলি, 'তুমি হ'চ্ছ কাজের মানুষ, দেশসেবার কাজে তুমি ডুবে আছ। আর তোমার মতে, আমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখি। আর কলকাতাতে এলেও তোমাতে আমাতে দেখা হয় দৈবাৎ।'

'—নাই হোক গে।' সে আমার পানে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, 'আমার জীবনের কিছুই জানো না তো। দিন-রাত আমায় মেলামেশা করতে হয় যাদের সঙ্গে তারা সবাই ধূর্ত, চতুর, চক্রান্তকারী। তুমি যদি থাকতে কলকাতায় তাহলে এটুকু সান্ত্বনা তো পেতাম যে, এমন একজন রয়েছে যার কাছে আমার মনের কথা কইতে পারি। অন্তত ইচ্ছে করলে একজন ভালো লোকের পাবো দেখা।'

সুভাষের জীবনের দুঃখবেদনার দিনটুকু যাদের অগোচর তারা আমার এ-কথার গভীরতা জানতে পারবে না ঠিকই। সে যে কোনদিনই নিজেকে ঘিরে মহিমা গৌরবের জলসা বসাতে চায়নি, না চেয়েছে ঘটনাপরিস্থিতি উদ্ভূত নিজের পরিণতিকে লালন করতে। সাধারণ রাজনীতি-বিশারদের মত তা'র কাছে আদর্শবাদ কেবল মাত্র ফাঁকা আওয়াজ আর অসার বুদবুদ বলে মনে হয়নি, দুঃখবাদের দীর্ঘশ্বাস দিয়ে জীবনকে দেখেই সে খুশী হয়নি। সুবিধাবাদের দিকে তা'র এতটুকুও নজর ছিল না, বানিয়ে বলার মত কথা ঝাঁকে ঝাঁকে তা'র ঠোঁটের ডগায় যোগাতো না স্তাবকতার শ্লোক।

তাই পরবর্তীকালে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্তাবকতার চেষ্টা করে অপটুতার জন্য ধরা পড়ে বেচারীর সে কী দুরবস্থা। আসলে সুভাষ কখনও মিথ্যাচার করতে পারত না। সে যে ছিল সহজ, দৃপ্ত, দৃঢ়, পৌরুষে ভরা। সে যখন বর্মাতে বলেছিল—'কখনও কোনো অবস্থাতেই আমি পরাজয়কে মানতে পারি না।' তখন তার কথায় বিন্দুমাত্র বড়াই ছিল না। এবং সেই কারণেই, কংগ্রেস থেকে তাকে তিন বছরের জন্য সরিয়ে দেওয়াতে যখন তার বন্ধু অনুচর সবাই হতাশ হয়ে 'সব গেল সব গেল' বলে মুষড়ে পড়েছিল তখন এদের আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব দেখে সুভাষ বুঝতে পেরেছিল তার কেউ নেই আপনার, সে একাকী! হয়ত একটু চেষ্টা করলেই সে মানিয়ে বনিয়ে নিতে পারত, নিজের হারানো প্রতিষ্ঠা ফিরে পেত, তাতে ক'রে সত্যকার কূটনীতিকের পরিচয় দিতেও পারত সে। কিন্তু সে যে

কোনদিনই চাতুরীর ছোঁয়াচটুকু সইতে পারত না, পারত না মিথ্যাকে বরদাস্ত করতে—তাই বড় রকমের তথাকথিত দেশনেতা হবার যোগ্যতা তা'র ছিল না। বড় রকমের নামজাদা দেশত্রাতা নেতা হ'তে গেলে চাই বড়াই, জাঁকজমক—যাকে বলে ঠাট। আর সেই সঙ্গে চাই গণ্ডারের চামড়ার মত শক্ত সহনশীলতা—সুখ-দুঃখ মান-অপমানের স্পর্শকে যেন পরোয়া করলে চলবে না। কিন্তু সেদিক দিয়ে সুভাষ ছিল একটু লাজুক—বরং এলোমেলোই বলা যেতে পারে। হয়ত তার বর্মা অভিযানের উজ্জ্বল ঐতিহাসিক ঘটনার পর আজ এ-কথাটা খাপছাড়া শোনবে। ভারত অভিযান তাকে ঐতিহাসিক মর্যাদার চেয়েও হয়ত বড় কিছু প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে, সমস্ত দেশের কাছে সে বিস্ময়, পৃথিবীর কাছে তা'র অভিযান আরও অদ্ভুত। যেন গল্প-কথা। কিন্তু তবু আমি বলব যে, সুভাষ কখনও ঢাক পিটিয়ে রাজনীতিতে কল্কে পায়নি, সে যে দলাদলির লড়াইতে পাত্তা পেত না তা'র কারণও ওই। আর পাঁচজন দিগ্‌গজ রাজনীতিকের ম'ত সে বেমালুম ধোঁকাদুরস্ত ছিল না। কিন্তু কূটনীতি আর রাজনীতিশাস্ত্রে ধোঁকাবাজির মূল্য অনেকখানি। এ পথে চলতে গেলে জানতে হবে নিছক মিথ্যার সঙ্গে কতটুকু সত্যের ছিটেফোঁটা মিশেল দিয়ে চালাতে হবে, প্রতিপক্ষকে নিখুঁতভাবে ধাপ্পা দিতেও হবে। নিয়মই এই, আর যারা—তারা সব ভুল করেছে, তাদের মধ্যে অনেক গলদ, শুধু আমার দলটি ভালো, আমার দলের ম'ত আত্মত্যাগী পৃথিবীতে আর নেই, আমার কোনো ভুল হয় না, আমি কারুর কোনো ক্ষতি করতে চাইনে তবু আর পাঁচজনে আমার অনিষ্ট করবার জন্য অন্যায় করে বেড়াচ্ছে, ভুল করছে ওরা অজস্র এবং আমি এদের দুষ্কার্যের প্রমাণ পেয়ে মনে মনে যে কতই আঘাত পেয়েছি কী বলব! আমার ভুল? ক্ষেপেছ! এই ভাবটি সদাই দেখাতে পারা চাই, তবেই তো সত্যকার নেতা।

আমার বলতে কষ্ট হয় তব বলব যে, সুভাষ শেষ পর্যন্ত তা'র

সত্যপ্রীতিকে অম্লান রাখতে পারেনি। অবশ্য এর জন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, বর্তমানে প্রত্যক্ষ রাজনীতির কর্মক্ষেত্রে সত্যের একনিষ্ঠতা আঁকড়ে ধরে বেশিদিন থাকার উপায় নেই। কেবল যে আত্মার কল্যাণের খাতিরেই মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে তা নয়, বিপদে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচবার জন্যও অভিযানী হতে হবে।

সত্যি, সুভাষের জীবনের এই আফসোসের দিনটা দেখিয়ে না দিলে আমার ত্রুটি হ'ত বই কি! মানে সে যে বলেছিল, এমন একজন বন্ধু তা'র বড় দরকার যার কাছে সব কিছু বলা যায়, যে নাকি তা'র কাছে সান্ত্বনার ম'ত হয়ে থাকবে ভিড়ের বাইরে,—রাজনীতি যাকে স্পর্শ করেনি।

সে যখন ১৯২৯ সালে য়ুরোপ থেকে ফিরল তখন তো দেখেছি তা'র সে কী আশা, কী স্বপ্ন দেশের জন্যে, সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে সে। তখন তা'র অণুতে রেণুতে এ বিশ্বাসের অনুরণনই ছিল —দেশ আর সত্য আলাদা নয়, একই ব্রহ্মের বিভিন্ন দিক মাত্র। তার সেই কালের আন্তর্জাতিক রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গিই দেশের ধমনীতে সে প্রবাহিত ক'রে উন্নত করে এ দেশকে। কিন্তু তা ক্রমশঃ ঝাপ্‌সা হয়ে যেতে লাগল। অবশ্য এছাড়া অন্য কিছু আশা করাও ভুল। যে আদর্শের অনুপ্রেরণায় সে নিজেকে উৎসর্গ করেছিল, দেশের কাজে সেই আদর্শবাদের মূলে যে বিবেক-বুদ্ধির তাগিদ ছিল, সেটা অধীরতা-প্রসূত বই কি। কেবলই মনে হ'ত সংকল্পে সিদ্ধিলাভ আজই, এই মুহূর্তে করা চাই। কিন্তু এ তো ব্যস্ত হবার কাজ নয়, সময় লাগে।

সেবার অসুখের পর, যে অসুখের জন্য তাকে ভিয়েনা যেতে হয়েছিল, যে প্রায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত—'স্বাধীনতা হাতে হাতেই তো মেলে না!' ভিয়েনাতে তাকে যেতে হয় অস্ত্রোপচারের জন্য। সেখানে গিয়েও সে অমনি বিষণ্ণ হয়েই থাকত, ফিরে এসেও এ-কথা বলেছিল সুভাষ।

অনুবাদ: গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

২৩শে জানুয়ারী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান পুরোহিত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন। স্মরণীয় ২৩শে জানুয়ারী—সারা বাংলা তথা ভারতের আনন্দোৎসবের দিন।

জননেতা সুভাষচন্দ্রের জীবনকাহিনী রূপকথার মতই রোমাঞ্চকর। আজ বলতে দ্বিধা নেই যে, নেতাজীর পূর্বে পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্রনেতা সমস্ত পৃথিবীব্যাপী এতোখানি বিস্ময়ের উদ্রেক করতে পারেন নি, সারা দুনিয়াব্যাপী এতো শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেন নি।

ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক পর্যন্ত এই দীর্ঘ কর্মব্যস্ত জীবনগাথা সারা দুনিয়ার মানুষকে স্তম্ভিত করেছে। বিস্মিত করেছে তাঁর জীবনের অলৌকিক কাহিনীসমূহ। তাঁর নেতৃত্ব দেবার নির্ভুল ক্ষমতা ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জন্য সারা দেশ তাঁকে নেতার আসনে বসাতে কোন দিন দ্বিধা করে নি। ত্যাগ, সংযম, নির্লোভ ও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার ভেতর দিয়ে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করবার কাজে লিপ্ত রেখেছেন। কেবল সময় সময় মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন যে, একটা বৃহৎ কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান, দেশের মঙ্গলের জন্যে একটা মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে।

তাইতো আমরা দেখতে পাই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবন দেশমাতৃকার সাধনায় উৎসর্গীকৃত। ছাত্রজীবনেই প্রেসিডেন্সী কলেজে ওটেন সাহেবের ঔদ্ধত্য ও হীনসত্বার বিরুদ্ধে তাঁর প্রচণ্ড প্রতিবাদ তৎকালীন ইংরেজদের অসভ্য উক্তিগুলিকে যেমন সংযত করতে পেরেছিল, তেমনি যুবসমাজের কাছে নির্ভীক এক নেতার আত্মপ্রকাশের সুনিশ্চিত সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছিল। জাতীয়তার বিরুদ্ধে আচরণের যেমন তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন, তেমনি গণদেবতার পূজারী

সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে, আপসহীন সংগ্রামের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গীকৃত সুভাষচন্দ্রকে তাই আই. সি. এস. পদে চাকুরীর মোহপাশে বেঁধে রাখা যায় নি ; তিনি সে পদ হেলায় প্রত্যাখ্যান করে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে সুভাষচন্দ্রের বহু বীরত্বময় সংগ্রামের কাহিনী সমগ্র ভারত আজও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করে। বিশেষ করে ১৯৩১ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র থাকাকালীন সুভাষচন্দ্রের আইনঅমান্য আন্দোলনে যোগদান ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করে।

১৯৩৯ সাল ভারতে জাতীয় জীবনে এক চরম সন্ধিক্ষণ। সারা দুনিয়াতে তখন যুদ্ধের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। একটা বিরাট মহাযুদ্ধের আভাস নেতাজী বহুপূর্বেই পেয়েছিলেন। তখন তিনি কংগ্রেসের তৎকালীন আপসমুখী নেতৃত্বকে আন্দোলনের পথে আগুয়ান হতে আহ্বান জানান। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবেও তিনি ইংরেজকে ভারত ছেড়ে যাবার জন্য চরম পত্র দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। আবার তিনি কংগ্রেসকে বললেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সময়েই বিপর্যস্ত ব্রিটিশ শক্তিকে ভারত থেকে তাড়াবার সুযোগ নিতে হবে। যুদ্ধকালীন অবস্থাকে আমাদের কাজে লাগাতেই হবে। কিন্তু সেদিনকার আপসমুখী নেতৃত্ব তাঁর সেই চরম প্রস্তাবে সাড়া দিল না। নেতাজীর অতুলনীয় রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় হলো যুদ্ধকালে জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত। ইতিহাস স্বীকার করেছে আজ যে, নেতাজীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টিকে সত্য প্রমাণ করে ১৯৪২ সালে যুদ্ধকালীন সময়ে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হ'লো যে, ক্রিপস প্রস্তাবের ব্যর্থতার পর গান্ধীজীই নেমে এলেন 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবকে রূপ দিতে।

চিরবিদ্রোহী নেতাজী কিন্তু সেদিন অনেক দূরে। ভারতবর্ষ থেকে অনেক অনেক দূরে।

ব্রিটিশ সরকারের সদা জাগ্রত প্রহরী এড়িয়ে সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের কথা আজ আর কারও অবিদিত নয়। কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা কাবুলের পথে তাঁর বার্লিন গমন, জার্মানী ও ইতালীতে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য ইউরোপে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সংগঠন, তাতে সফল হবার সম্ভাবনা কম দেখে জার্মান ইউবোটে ভারত মহাসাগরে আগমন ও মালয়ে পদার্পণ এবং সেখানে এক শক্তিশালী ভারতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন করে মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের জন্য ব্রিটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে তাঁরই নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সংগঠন এবং বীরত্বপূর্ণ কোহিমা সংগ্রাম ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানের সূচনা করেছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের আন্দোলন ও সংগ্রামের খবর দেশের ভেতর প্রতি স্তরের মানুষের মনকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করলো। যুবসমাজ মৃত্যুভয় ভুলে গিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের শেষ আঘাত হানবার জন্য এগিয়ে এলো। সমগ্র ভারতবর্ষের এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো। বোম্বাইয়ে, করাচীতে নৌবিদ্রোহ, কলকাতায় রশিদ আলী দিবসে ছাত্রদের প্রচণ্ড সংগ্রাম সবই আজাদ হিন্দ্ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা দিয়েছিলো তাতে কোন সন্দেহ নেই। ব্রিটিশ পরিচালিত ভারতের সেনাবাহিনীর ভেতর এই প্রথম ভাঙ্গন দেখা দিল, লালকেল্লায় আজাদ হিন্দের বীর সেনানীদের বিচার সমগ্র ভারতে যে বিপুল বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিলো, তাতে ইংরেজ শাসকরা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন—এবং আজাদী সেনানীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন। আজাদ হিন্দের আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ, ১৯৪২ সালের গণ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ইংরেজকে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করেছিলো। তারই ফলে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট কংগ্রেসের নিকট ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করল।

পরাধীনতা থেকে দেশকে মুক্ত করবার পর দেশে শ্রেণীহীন, শোষণহীন এক সমাজ প্রতিষ্ঠাই তাঁর ব্রত ছিল। সমস্ত ক্ষমতা

ভারতীয় জনতার হাতে তুলে ধরবার মহান ব্রত ছিল তাঁর। তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে সমাজতন্ত্রী। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার পরিণতিই যে সমাজতন্ত্র, এটা আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নীতিই সুভাষচন্দ্রকে তৎকালীন আপসমুখী ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করেছিল। যার ফলে তাঁকে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিলো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে তাঁর বক্তৃতায় তিনি দ্বিধাহীনভাবে বলেছিলেন, "আপনাদের জানা প্রয়োজন আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য দুটি। প্রথমটি রাজনৈতিক স্বাধীনতা। এটি জাতীয় বিপ্লব। অপরটি ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নতুন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। এটি সমাজ বিপ্লব।" স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সমস্ত আপসহীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিকে সংহত রূপ দিয়ে তিনি দ্বিতীয় ধাপে শোষণহীন এক সমাজ কায়েম করতে গিয়ে যে কর্মপন্থা ঘোষণা করেছিলেন (বামপন্থার অর্থ, কাবুল ১৮৪১) তা হলো: (১) একটি সম্পূর্ণ আধুনিক এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র; (২) দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য ভারী শিল্পোৎপাদন; (৩) উৎপাদন ও বণ্টনের সামাজিকীকরণ: (৪) ধর্মের বিধায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা; (৫) সকলের সমান অধিকার; (৬) ভারতীয় জনগণের সকল অংশের ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত স্বাধীনতা ও (৭) স্বাধীন ভারতে নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের নীতি প্রতিষ্ঠা।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হতে আজ পর্যন্ত দেশে কি হয়েছে ও কি হতে চলেছে, তার ব্যাপক আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয় বলেই সেদিন থেকে বিরত থেকে শুধু প্রতিটি মানুষকে আজ নেতাজীর আদর্শকে ও পরিকল্পনাকে সার্থক করবার জন্য আহ্বান জানাই। জয় হিন্দ্।

আমার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'চৈতালীঘূর্ণী'।...

বইখানি উৎসর্গ করলাম নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামে। বাঙলার যৌবনশক্তির তিনি প্রতীক। নবযুগের অগ্রদূত। শুধু তাই নয়, এই সময় তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

সে কথাটিই এখানে বলব।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলাম, তারপর সরকারের সঙ্গে আপস কথাবার্তার সূত্রপাত হ'ল। এদিকে বাংলা দেশে লাগল কংগ্রেস নিয়ে বিরোধ। একদিকে সুভাষচন্দ্র অন্যদিকে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। ছু'জনকে কেন্দ্র ক'রে প্রাদেশিক কংগ্রেস নির্বাচনে জটিল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হ'ল। আমি তখন কংগ্রেসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্রব ত্যাগ করলেও কংগ্রেসের সভ্য।...বীরভূমেও এই বিরোধ বাধল। সেখানে সুভাষ-চন্দ্রের পক্ষে নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যতীন্দ্রমোহনের পক্ষে সিউড়ীর গোপিকাবিলাস সেনগুপ্ত, সুরেন সরকার প্রভৃতি। স্বর্গীয় ডাক্তার শরৎ মুখোপাধ্যায় মশায় নিরপেক্ষ থাকতে চেষ্টা করলেন। নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশী। তিনি লাভপুরে ডেটিন্যু হিসেবে কিছুদিন ছিলেন, তারপর আমার বাগানেই খানিকটা জায়গা নিয়ে বাড়ি করেছিলেন একখানি। চতুর ব্যক্তি। তাঁর ধারণা ছিল তিনিই আমাকে মানুষ করেছেন এবং আমি তাঁরই একান্ত অনুগত। এই বিরোধে সবচেয়ে বেশী অনিয়ম এবং অনাচার করেছিলেন তিনি। এবং আমার অজ্ঞাতসারে আমায় বিশ্বস্ত আনুগত্য অনুমান ক'রে সব অনিয়মেই আমাকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। যে-সভা হয়নি সে সভা কাগজে-কলমে খাড়া ক'রে আমাকেই তার সভাপতি হিসেবে জড়িয়েছিলেন। কাজে মহারাষ্ট্র ভবনে আনে মহোদয়ের আদালতে

যখন বিচার শুরু হ'ল, তখন বীরভূমের মূল সাক্ষী হ'লাম আমি। আমি রাজনীতি ছাড়তে চাইলেও রাজনীতির কম্বলরূপী ভালুক আমায় ছাড়লে না।

ওয়েলিংটন লেনে সাবিত্রীপ্রসন্নের [কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টো-পাধ্যায়] প্রেস, কাগজের আপিস এবং বাসা। আমি ওখানেই তখন অতিথি হিসেবে রয়েছি। কিরণ রায়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা জমে উঠেছে। এমনি সময় একদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কোণের বি-পি-সি-সি থেকে স্বর্গীয় কিরণশঙ্কর, সাবিত্রীপ্রসন্নকে অনুরোধ জানালেন যেন তারাশঙ্করকে নিয়ে একবার তিনি আসেন।

আমি বললাম, না। তিনি যা বলবেন সে আমি পারব না। মিথ্যা বলব না।

কয়েকদিন পর আবার অনুরোধ এল। বললাম, না।

বার বার তিনবার।

এর পর একদিন সাবিত্রীপ্রসন্ন বললেন, চল, এক জায়গায় বেড়িয়ে আসি।

—কোথায়?

—চল না। বললে চিনবে না হয়তো।

তিনজনে বের হ'লাম। আমি, সাবিত্রীপ্রসন্ন, কিরণ রায়। ভবানীপুরে এলগিন রোডের মোড়ে নেমে সাবিত্রীপ্রসন্ন আমাকে এনে তুললেন স্বর্গীয় শরৎবাবুর বাড়িতে। সামনের ঘরে আট-দশজন দর্শনার্থী। ভিতরে বোধ হয় দশ-পনরোটা কি তার বেশী টাইপ রাইটার খট্‌খট্ শব্দে অবিরাম চলেছে। ডানদিকের ঘরে সুভাষচন্দ্র আলোচনা করছেন সহকর্মীদের সঙ্গে। একটি অগ্নিশিখার মত দীপ্তিমান কিশোর ব্যস্ত হয়ে ঘুরছেন। সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। কে ঠিক বলতে পারি না। সাবিত্রীপ্রসন্ন সংবাদ পাঠালেন। সুভাষচন্দ্র মিনিট কয়েক পরেই বেরিয়ে এলেন। আলাপ করলেন কয়েকটি কথায় কিন্তু তাতেই পেলাম প্রাণের স্পর্শ।

আপনিই তারাশঙ্করবাবু! আপনার সঙ্গে কথা বলা আমার যে কি প্রয়োজন। আমি আসছি। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন।

ভাইপোকে ডেকে বললেন, চা দাও।

এই সময় একটি ঘটনা ঘটল। একজন কংগ্রেসকর্মী—মাথায় চুল, মুখে দাড়ি গোঁফ, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা—একটু যেন ব্যঙ্গ করেই ব'লে উঠলেন, ওই! হ'ল—। সাহিত্যিক নিয়ে এইবার জল খাওয়ানো মজলিস—।

বাকী কথা মুখেই রইল তাঁর। সুভাষচন্দ্র চলে যাচ্ছিলেন, ঘুরে দাঁড়ালেন বাঘের মত এবং বাঘের মতই গর্জন করে উঠলেন, হোয়াট!

এক বিন্দু অতিরঞ্জন করিনি, বক্তা ভদ্রলোক মুহূর্তে ধপ্ করে বসে গেলেন চেয়ারে।

—আমার অতিথি! ব'লে সুভাষচন্দ্র ভিতরে ঢুকে গেলেন।

আমি ভীত হয়েছিলাম খানিকটা। শক্ত ক'রে মনকে বাঁধলাম। সাবিত্রীকে শুধু বললাম, তুমি অন্যায় করেছ। আমাকে এমনভাবে এখানে আনা তোমার উচিত হয়নি।

বেরিয়ে এলেন সুভাষবাবু।

সঙ্গে সঙ্গে নরেন বন্দ্যোপাধ্যায়। সুভাষবাবু তাঁকে বললেন, না। আপনি যান।—তিনি চলে গেলেন।

সুভাষবাবুই প্রথমে কথা আরম্ভ করলেন, আপনি কেন সাক্ষী দেবেন?

আমি খুব সংযত করলাম নিজেকে। বললাম, আমি তো মিথ্যা বলব না! একটা কথা—। ব'লেই তাঁর মুখের দিকে তাকালাম আমি।

তিনি প্রসন্ন মুখেই বললেন, বলুন।

বললাম, দেখুন, আমরা যারা কংগ্রেসের কর্মী হয়ে কাজ করি, তারা দেশের সেবা করতেই আসে, তারা তো সুভাষচন্দ্র বা জে. এম. সেনগুপ্তের সেবা করতে আসে না। আমি দেশের সেবা করতে চেয়েছি—চাই—তাই সত্য বলতে সাক্ষী দেব আমি।

মুহূর্তে দুই পাশ থেকে দু'টি আঙ্গুলের টিপুনি খেলাম। একদিক থেকে কিরণ, অন্যদিক থেকে সাবিত্রী আমাকে টিপলেন। আমি এর অর্থ ঠিক বুঝলাম না। বুঝতে চাইলামও না। আমি তখন কঠোর সত্য বলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সাবিত্রী, কিরণ আশঙ্কা করেছিলেন, সুভাষচন্দ্র উষ্ণ হয়ে উঠবেন। আবার হয়তো গর্জন করবেন।

আমি সুভাষবাবুর মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। তাঁর সুন্দর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল মুহূর্তেই জন্য, টকটকে রঙ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু পর মুহূর্তেই তিনি হাসলেন, প্রসন্ন হাসি। বললেন, নিশ্চয়। মানুষকে দেবতা হিসাবে সেবা করলে সাধনাই পণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু আমি সত্য কথাটাই জানতে চাই। বলুন আপনি। সত্য কি ঘটেছিল ?

পিছনে ঘরের ভিতরের দিকে তাকালেন তিনি, একান্তে আলাপের স্থান খুঁজলেন। দেখলেন স্থান নাই। বললেন, চলুন, লনে বেড়াতে বেড়াতে কথা বলি।

চারজনেই লনে বেড়াতে বেড়াতে কথা বললাম। আমি বিবরণ ব'লে গেলাম, তিনি মধ্যে মধ্যে দু'একটি প্রশ্ন করলেন। শেষে বললেন, আপনার কথা আমি অকপটে বিশ্বাস করলাম। আপনি সত্য বলেছেন। আমি দুঃখিত, লজ্জিত—নরেনবাবু এই সব করেছেন—আমাকে ছোট করেছেন, কলঙ্কভাগী করেছেন। আপনি বিশ্বাস করুন, এ আমি চাই নি। এ আমি চাই না।

আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। হারিয়ে ফেলেছিলাম নিজেকে।

তিনি আমাকে বলেছিলেন, আপনি শরৎবাবুকে (বীরভূমের) নিয়ে বিরোধ মিটিয়ে দিন।

আমি পারি নি। শরৎবাবুরা রাজী হন নি।

আমি তখন এই মানুষটির কাছে প্রায় আত্মসমর্পণ করেছি মনে-মনে।

'চৈতালীঘূর্ণী' তাঁকেই উৎসর্গ করেছিলাম।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আর একবার আমার দেখা হয়েছিল। কালানুক্রমেও এই ঘটনার খুব অল্পদিন পরে। এবং আমার সাহিত্য-জীবনের উপক্রমণিকা পর্বে এর কিছুদিন পর নেমে এল নাটকের যবনিকার মত একটি সংঘাতময় ছেদ। তিনিই আমাকে পথ নির্বাচনে কিছুটা সাহায্য করলেন—এই সাক্ষাতে।

তার আগে আমার তখনকার জীবন সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব। জেল থেকে বেরিয়ে এসে—জেলখানায় সংকল্প মনে রেখে—বৈষয়িক জীবন থেকে মুক্তি নেবার জন্য ছোটভাইকে সব ভার অর্পণ ক'রে বোলপুরে একটি ছাপাখানা করলাম। মনে মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল একখানা কাগজ বের করব। সাপ্তাহিক কাগজ, নীলাম ইস্তাহার সর্বস্ব নয়, রীতিমত দেশপ্রেম প্রচার পত্রিকা। সাবিত্রীপ্রসন্ন আমাকে প্রেস ও সরঞ্জামপাতি কিনে দিলেন।...

প্রেস কিনে বোলপুরে প্রেস করলাম। বোলপুর কোর্টের পাশেই ছাপাখানা। চেক, রসিদ, আদালতের ফর্ম, ক্যাস-মেমো, প্রীতি-উপহার ছাপি, একসারসাইজ বুকে কপিং পেন্সিলে গল্প লিখি।..

হঠাৎ বিপত্তি উপস্থিত হ'ল ছাপাখানা নিয়ে।

বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তখন স্বনামধন্য গুরুসদয় দত্ত। রায়বেঁশে নিয়ে বীরভূমকে মাতিয়ে তুলেছেন। রায়বেঁশে নৃত্য, ব্রতচারী দল বাংলায় সাংস্কৃতিকে যেটুকু সমৃদ্ধ করেছে—তা স্বীকার ক'রেও বলব যে, সেদিন এই মাতনটি যাঁরা দেশকর্মী তাঁদের চোখে ভাল ঠেকে নি। এই মাতনটি সেদিন দেশের মানুষের দৃষ্টিকে কংগ্রেস আন্দোলন থেকে ফিরিয়ে অন্য দিকে নিবদ্ধ করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে ব'লে মনে হয়েছিল। এবং এই রায়বেঁশে বা ব্রতচারী আন্দোলন প্রচার করতে তিনি যে শাসকের প্রতাপ প্রয়োগ ক'রেছিলেন—তাতেই এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেছে।..দত্ত সাহেব ব'লেই তিনি খ্যাত ছিলেন, তাঁর প্রতাপে—ইস্কুলে ইস্কুলে, গ্রামে গ্রামে তখন রায়বেঁশে নৃত্যের ঢোল বাজতে লেগেছে। উকীল নাচছে, মোক্তার নাচছে, ডেপুটি নাচছে, সাব-ডেপুটি নাচছে,

দারোগা নাচছে, চৌকিদার নাচছে, হাকিম নাচছে, আসামী নাচছে, রায়বাহাদুর নাচছে, রায়সাহেব নাচছে, জমিদার নাচছে, ধনী নাচছে, হেডমাস্টার নাচছে, সেকেণ্ড মাস্টার নাচছে, ছাত্র নাচছে—সে এক অত্যদ্ভুত কাণ্ড। না নেচে পরিত্রাণ নাই। হাত ধরে টেনে এনে বলেন—নাচুন রায়বাহাদুর! তেমনি ছিল তাঁর অসহিষ্ণুতা। আই. সি. এস. সুলভ অসহিষ্ণুতা কি বস্তু যাঁরা জানেন, তাঁরাই বুঝবেন সেকথা।

রায়পুরের কংগ্রেসকর্মী ব্যোমকেশ চক্রবর্তী বা চট্টোপাধ্যায় দত্ত সাহেবের একটি আচরণে খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। দত্ত সাহেব বীরভূমে যেখানে যত প্রাচীন মূর্তি পেয়েছিলেন সব সংগ্রহ করে এনেছিলেন। মূর্তি, পট দারুশিল্প; সে বোধ হয় ওয়াগন.ভর্তি জিনিস। রায়পুরে ছিল প্রাচীন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ একটি মূর্তি, তিনি সেটিও সংগ্রহ ক'রে আনেন। গ্রামের লোকে ক্ষুব্ধ হ'লেও প্রতিবাদ করতে সাহসী হয় নি। ব্যোমকেশ আনন্দবাজারে এই সম্পর্কে একটি নামহীন পত্র লেখে, পত্রখানি প্রকাশিত হয়। তাতে দত্ত সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। প্রথম সন্দেহ করেন—পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্নকে। তাঁকে বোধ হয় কিঞ্চিৎ শাসনও করেছিলেন এবং নিজের প্রতাপে গ্রামের প্রসাদ-ভিক্ষুকদের দিয়ে এই প্রতিবাদের প্রতিবাদপত্র আনন্দবাজারে প্রকাশিত করলেন। ব্যোমকেশ আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং রায়বেঁশে নিয়ে এক ব্যঙ্গ কবিতা লিখে আমাদের প্রেস থেকে ছাপিয়ে নিলে। তখন আমরা অর্থাৎ আমি বা আমার মেজ ভাই—কেউই বোলপুরে ছিলাম না। কম্পোজিটারদের দিয়ে ব্যোমকেশ ছাপিয়ে নিয়ে জেলাময় দিলে ছড়িয়ে। কবিতাটির প্রথম দু'লাইন ছিল আমাদের জিলায় প্রচলিত একটি ছড়া—

আমার বিয়েয় যেমন তেমন,
দাদার বিয়েয় রায়বেঁশে
আয় চকাচক্ মদ খে-সে।

ব্যোমকেশ একটু বুদ্ধিহীনের কাজ করেছিল। আমার অনুপস্থিতিতে ছাপানো তার অন্যায়ও হয়েছিল এবং নির্বুদ্ধিতার কাজও হয়েছিল।

আমি থাকলে ছেপে দিতাম, দাম নিতাম না এবং সঙ্গে সঙ্গে কাগজখানিতে ছাপাখানার নামও দিতাম না। কম্পোজিটর কোন সন্দেহ করেনি; ছেপে প্রেসের নাম দিয়েছিল এবং ফাইলে তার কপিও রেখেছিল। ওদিকে দত্ত সাহেবের হাতে কাগজখানা পড়তে দেরি হ'ল না। দত্ত সাহেব জ্বলে উঠলেন। বিশেষ পুলিশ কর্মচারী এল বোলপুর, প্রেস খানাতল্লাস হ'ল, কাগজখানাও বের হ'ল। কম্পোজিটর সমেত থানায় গেলাম। বললাম, এ কবিতা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। কম্পোজিটর বেচারী বিনা ধমকেই ব'লে দিলে রায়পুরের ব্যোমকেশবাবু ছেপে নিয়ে গিয়েছেন, বিয়ের প্রীতি-উপহার বলে। এখন ওই কাগজ-খানার বলে কিন্তু কোন রাজদ্রোহের অভিযোগে মামলা দায়ের করা যায় না। এবং আমাদেরও গ্রেপ্তার করা যায় না। থানা থেকে ফিরে এলাম। বিশেষ পুলিশ কর্মচারীটি চলে গেলেন—দত্ত সাহেবকে বিবরণ নিবেদন করতে। কয়েকদিন পরেই এল নোটিস। আমাদের উপর নোটিস এল দু'হাজার টাকা জামানত দিতে হবে।

মামলা কিছু হয়নি। তলব হ'ল। তিরস্কৃত হ'লাম। কিন্তু জামিন বা বণ্ড কি দেব স্থির করতে পারলাম না। সময় নিলাম।

ঠিক এই সময় একদিন শুনলাম, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এসেছেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোন প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করতে।

বেলা তিনটেয় তখন বোলপুর স্টেশনে আপ-ডাউন দু'খানি ট্রেনের ক্রসিং হয়। তিনটেয় বোলপুরে চাপলে সাড়ে সাতটা-আটটায় হাওড়া পৌছান যায়। আমাদের বাড়ি লাভপুরে যেতেও আপ ট্রেনখানি সবচেয়ে সুবিধের। আমি বোলপুর থেকে বাড়ি ফিরছি। আপ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ চোখে পড়ল একখানি গাড়ি এসে থামল স্টেশনের বাইরে। সুভাষচন্দ্র—দীপ্তিমান তারুণ্যের জীবন্ত মূর্তি—চারিদিক যেন উদ্ভাসিত ক'রে নেমেই ওভারব্রিজ পার হয়ে ডাউন প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমার ইচ্ছা হ'ল, দেখা করি! কিন্তু সন্দেহ হ'ল, চিনতে পারবেন কি? কি বলব? কি পরিচয় দেব?

হঠাৎ চোখে পড়ল, সুভাষচন্দ্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। চোখ দেখেই বুঝলাম, চিনেছেন—স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করছেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। হাজার হাজার মানুষের ভিড়ের মধ্যে যে মানুষ বিচরণ করেন, সমগ্র দেশ যাঁর চিন্তার ক্ষেত্র, অতীত থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত যাঁর দৃষ্টি প্রসারিত, স্বপ্নে যিনি বিরাট দেশের ভবিষ্যৎ রচনা করেন, তাঁর পক্ষে আমার মত অতি সাধারণ চেহারার একজনকে একবার পনরো-বিশ মিনিট দেখেই কি মনে রাখা—চেনা সম্ভবপর? দেখলাম, সম্ভবপর। প্রতিভা—অতিমানবের শক্তিতে যাঁরা শক্তিমান—তাঁরা তা পারেন। এই শক্তি দেখেছি রবীন্দ্রনাথের। আর আমি বিলম্ব করলাম না। ডাউন প্ল্যাটফর্মে গেলাম, নমস্কার ক'রে দাঁড়ালাম।

তিনি তখন স্মৃতি মন্থন ক'রে আমার নাম ঠিক ধরেছেন। বললেন, তারাশঙ্করবাবু!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এখানে? কি করেন এখানে?

বললাম সংক্ষেপে—প্রেস করেছি এখানে।

তিনি বললেন, ভালো। প্রেস চলছে কেমন?

এবার বললাম, চলছিল কোন রকমে। কিন্তু বুঝতে পারছি না, বন্ধ করব কি চালাব।

—কেন?

বিবরণ বললাম। তাঁর আশ্চর্য শুভ্র চোখ দু'টি দপ্ ক'রে যেন জ্বলে উঠল। সে সত্যিই জ্বলে ওঠা। এমনভাবে চোখ জ্বলে ওঠা আমি আর কারও দেখিনি। তার ছটা আমার চোখে লাগল। উত্তাপ আমি অনুভব করলাম। বললেন, না। বন্ধ করে দিন। বণ্ডও দেবেন না, জামিনও দেবেন না।

স্থির হয়ে গেল পথ।

প্রেস বন্ধ হ'ল। গরুর গাড়ি ক'রে লাভপুরে এনে ফেললাম।

বিস্ময়ে ভরা একটি সৃষ্টি

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়

সহসা চোখের সম্মুখে অন্তহীন-সমুদ্রের নীল জলোচ্ছ্বাস দেখে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণ ঝলমল অবারিত বিস্তার দেখে নিজের অস্তিত্ববোধ-ই হারিয়ে যায়। এরা কি, কোথায় এদের শুরু ও শেষ, কি করে এরা এল—এসব তথ্য জানবার কথা মনেই আসে না। কেবল সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে এদের সামগ্রিক রূপ, রস ও গন্ধ আকণ্ঠ পান করার তাগিদে মানুষ বিমুগ্ধ হয়ে থাকে।

জগতে যুগে-যুগে ঐ অপরূপ সমুদ্রের মত, ঐ নয়ন-ভোলান কাঞ্চনজঙ্ঘার মত বিশাল ও বিপুল রহস্যময় বৈভব নিয়েই দু'চার জন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করে থাকেন। তাঁদের সম্পর্কে মানব-চিত্তে জেগে থাকে ঐ একই বিস্ময়বোধ। তাই একদা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করতে গিয়ে ভারতবর্ষের তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র বলেছিলেন: 'তুমি আমাদের বিস্ময়।'

বাঙলা তথা ভারতবর্ষের উনবিংশ শতাব্দীর জীবনে যেসব মহামানব আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁদের পানে সমগ্র পৃথিবী অবাক নয়নে তাকিয়েছে—তাঁদের মধ্যে দুইটি পুরুষ একই গোত্রের। তাঁরা দু'জনেই জন্ম-যোদ্ধা। বিপুল বাহিনীর দীপ্তিমান মহানায়কের সব লক্ষণ উভয়ের মধ্যেই অতুলনীয়। কিন্তু বিবেকানন্দ হলেন সংগ্রামী সন্ন্যাসী, আর নেতাজী হলেন সশস্ত্র-বাহিনীর সংগ্রামী অধিনায়ক। একজন সুপ্রা-হিউম্যান্ স্তর থেকে অগ্নিজ্বালা-বাণীর কষাঘাতে পশ্চিমের জ্ঞানকৌলীন্যবোধকে বিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন। অপরজন দিব্য-শিখায় উদ্ভাসিত, মহাশৌর্যলালনে আদর্শমুগ্ধ এক সশস্ত্র-বাহিনীর পদভারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে প্রকম্পিত করেছিলেন—ব্রিটিশের দুর্জয় বাহিনীকে পদাঘাত করে পশ্চিমের দম্ভ খান্‌খান্ করে দিয়েছিলেন।

তাই ভারতবর্ষের মানুষও বিবেকানন্দের পানে বিমুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তাই নেতাজীর উদ্দেশেও তারা ভাবঘন কণ্ঠে শুধু বলে : 'তুমি আমাদের বিস্ময়।'

আজ তেইশে জানুয়ারি। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কিছু স্মরণ করতে গিয়ে আজ শুধু এ-কথাই প্রথমে মনে হয় যে, অপূর্ব বিস্ময়ে ভরা এক সৃষ্টি এই সুভাষ!

কিন্তু সে বিস্ময় কাটিয়ে তাঁকে বুঝতে গেলে, কী করে এই পুরুষের আবির্ভাব ঘটা সম্ভব হ'ল, তা বুঝবার চেষ্টা প্রথমেই করা ভাল।

সুভাষচন্দ্র একটি হঠাৎ সৃষ্টি নন। যেমন বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, গান্ধী কেহই নন। তাঁরা কেহই উল্কার মত আকাশ থেকে ছুটে এসে সমগ্র দেশকে আলোকিত করে, অবশেষে শূন্যে মিলিয়ে যান নি। তাঁদের সবার জন্যেই প্রয়োজন ছিল যথাযোগ্য ঐতিহ্য, পরিবেশ ও পটভূমি।

মানুষকে সৃষ্টি করে 'পরিবেশ' ও 'ঐতিহাসিক নানা ঘটনা'। আবার মানুষই সৃষ্টি করে থাকে পরিবেশ ও ইতিহাস। সুভাষচন্দ্র নিজে যেমন ইতিহাসের সৃষ্টি, তিনি নিজেও তেমনি সৃষ্টি করে গেছেন গৌরবময় ইতিহাস।

ভারতবর্ষ পরাধীন না হলে সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম হলেও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্ম হ'তো না। কাজেই তাঁর নেতাজী হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন ছিল পরাধীন ভারতবর্ষের।

পরাধীন-ভারতে বিদ্রোহের প্রথম স্ফুরণ দেখা যায় মহারাজা নন্দকুমারের মধ্যে। পরাধীনতার বিরুদ্ধে প্রথম মুক্তি-যুদ্ধের অগ্নিজ্বালা লক্ষ্য করা যায় সিপাহী-বিদ্রোহে, নানাসাহেব তাতিয়াতোপী, রাণী লক্ষ্মীবাঈ ও অগণিত সিপাহীর চোখে, মঙ্গল পাঁড়ের ফাঁসিমঞ্চে। তারপর বিপ্লবের বাণী প্রথম রূপ ধারণ করে ১৮৯৭ সালে দামোদর চাপেকারের আত্মবলিদানে। এরও পূর্বে বাঙলার জমি উর্বরতর হয়ে

উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্র-দীনবন্ধু মিত্র হেমচন্দ্র প্রমুখ বাণীকণ্ঠদের উদাত্ত বিদ্রোহ সঙ্গীতে। ক্রমে তিলক বিপিন পাল ব্রজেন্দ্রনাথের লেখনী প্রচণ্ড কষাঘাত হয়ে ঘুমন্ত-জাতির সুপ্ত চৈতন্যকে জাগ্রত করে তুলল। এলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, তাঁদের অফুরন্ত লেখায় গানে কাব্যে বিপ্লবের বাণী দিকে দিকে ঝরে পড়তে লাগল। দেশময় কত কবি, কত গায়ক, কত গীতিকার ও সুলেখক এসে তাঁদের দেশাত্ম-বোধক রচনায় ও সঙ্গীতে মানুষের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিল। শুধু কথা দিয়ে দিয়ে কাব্য রচনা নয়—কর্ম দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে 'বিপ্লব' রচনার বাসনায় ঘটল অরবিন্দের আবির্ভাব। এই বিপ্লবগুরুর পাশে এসে দাঁড়ালেন স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা মহা বিদূষী এক নারী। তাঁর নাম ভগ্নী নিবেদিতা—সাক্ষাৎ ভবানী—রবীন্দ্রনাথের 'লোকমাতা' তিনি। আইরিশ বিদ্রোহের কন্যা নিবেদিতা: রুশ-বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারে। তিনি না এলে অরবিন্দের বিপ্লব-কর্ম অমন দানা বেঁধে উঠতো না। বিপ্লবের দল গঠন করলেন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর সহায়ক হলেন বারীন ঘোষ, যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু কমনেতা। বিপ্লবের জয়ধ্বজা উড্ডীন হয়ে গেল যতীন মুখার্জী-রাসবিহারী-সূর্য সেন প্রমুখ অনেকের নেতৃত্বে, অগণিত শহীদ ও নিরলস কর্মীর আত্মদানে ও কর্মদক্ষতায়। মহারাষ্ট্র থেকে বাঙলা, বাঙলা থেকে আবার মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব-উত্তরপ্রদেশ-বিহার-মাদ্রাজ-ব্রহ্ম ও বহির্ভারতে এ-বিপ্লবের ঢেউ উত্তাল ছন্দে ধাবিত হতে থাকল। সংগ্রামের এই যে অবারিত ধারা, তার পাশে এসে ১৯২১ সাল থেকে বয়ে চলল মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-যুদ্ধের আর একটি ধারা। এ দু'টি ধারা উদ্দাম, উচ্ছল বেগে সৃষ্টি করে চলল যে অভূতপূর্ব সংগ্রামী-প্রবাহ, তা' সারা ভারতবর্ষকে নবসৃষ্টির দ্বারে পৌঁছে দিল। যে সৃষ্টি শ্রীচৈতন্যের কাল থেকে শুরু হয়েছে ধর্ম-কৃষ্টি-রাজনীতি-দর্শন-সমাজ-সাহিত্য-বিজ্ঞানের অর্থাৎ জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে। এই মহান সৃষ্টি সূচনার রসশালায়-ই সুভাষচন্দ্রের জন্ম। তাঁর শৈশব-কৈশোর-

যৌবন এর ধারাস্নানেই লালিত। তিনি তাই মহনীয় এ ঐতিহ্যের সন্তান। এ ঐতিহ্য বিহনে সুভাষচন্দ্র "নেতাজী"-হবার সাধনায় কখনো ব্রতী হতে পারতেন না।...

জীবনে রাজনীতিক বন্ধু বা অগ্রজদের কাছ থেকে, কিছু দেশবাসীর কাছ থেকে সুভাষচন্দ্র কর্মপথে বাধা পেয়েছেন প্রচুর। কিন্তু সে-সব বাধা তাঁর কাছে ছিল উপলখণ্ডের রূঢ় অথচ নিষ্ফল বাধার মত। তাতে তিনি বিন্দুমাত্র ব্যাহত হন নি। তাঁর গতিবেগ তাতে উত্তরোত্তর প্রখরতর হয়ে উঠেছে। কারণ মাতৃভূমির ঐতিহ্য-উৎসে তাঁর শক্তি বিধৃত ছিল বলে কোন বাধায় স্তব্ধ হয়ে থাকার অবকাশ তাঁর ঘটে নি। অধিকন্তু কোটি কোটি দেশবাসীর সডাক ও নির্বাক আহ্বান তাঁর কানে নিয়ত ধ্বনিত হ'ত। তা'দের টানেই তাঁর ছুটে-চলা ছিল অব্যাহত, অবন্ধ্য, বিরতিহীন।

সুভাষচন্দ্রের প্রাণগুরু স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর কর্মগুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তাঁর বিপ্লবগুরু শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর সতীর্থ ও বন্ধু ছিলেন দুর্জয় বিপ্লবীদল। তাঁকে 'দশনেতা'-র আসনে বরণ করেছেন আর কেহ নন—সুদূরস্রষ্টা ঋষি কবি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।—তাই বলা চলে আকাশ থেকে আচমকা তাঁর বর্মার উপকূলে আবির্ভাব ঘটেনি।—

আপন আবেগে ও গতিতে বন্ধুর পথে চলেছেন সুভাষচন্দ্র ভারতীয় ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠতম ধারক ও বাহকরূপে, পরাধীন দেশের সশস্ত্র-বিপ্লবের অনন্য প্রতীক হয়ে। দীর্ঘকাল ধরে দীর্ঘ পথের সে যাত্রা—কিন্তু অশ্রান্ত, অপরাজেয় 'ভারত-পথিক'।

এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এল ১৯৪১ সাল। সুভাষচন্দ্র পালিয়ে গেলেন ইউরোপে। তিনি ব্রিটিশের শত্রুর সখ্যতা লাভের জন্য তৎপর। রাজনীতিক-কুশলতায় পারদর্শী হবার সময় এসেছে। বিশ্বের রাজনীতি-ধুরন্ধরদের সঙ্গে দাবার চালে 'স্বাধীনতা' রূপ উপঢৌকন লাভের নীতি থেকে তাঁর রাজনীতি আলাদা। তিনি লড়বেন বীরের মত, অস্ত্রের ঝনঝনায় লড়বেন রাজনীতিজ্ঞের মত, কূটবুদ্ধির সূক্ষ্ম

প্রয়োগ-শক্তিতে। নিজের পথ তিনি স্বহস্তে কেটে কেটে তৈরি করলেন। যুদ্ধের সুযোগ নিলেন তিনি সম্পূর্ণভাবে। এ যুদ্ধ না এলে সুভাষচন্দ্রের যেমন 'নেতাজী' হয়ে-ওঠা হতো না—তেমনি 'সুভাষচন্দ্র' না এলে অপর কোন মানুষের পক্ষে-ই এ-যুদ্ধের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হতো না।...

বীরের মত সংকল্পে-অটুট সংগ্রামীর মত তিনি বেরিয়ে গেলেন ঠিক অপর একটি মহা-তরুণ সন্ন্যাসী, বিবেকানন্দেরই মত। সহায়-সম্বলহীন সে পথিকও বিদেশীর কাছে বলেছিলেন : 'আমার পরিচয়-লিপি আমার ললাটে রয়েছে লেখা'। সুভাষচন্দ্রের ললাটেও লিখিত ছিল অগ্নি-অক্ষরে সেই পরিচয়-লিপি। তা থেকে পাঠোদ্ধার করতে বেগ পেতে হয়নি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনেতাদের।...

অতুলনীয় নেতার দক্ষতায় সুভাষচন্দ্র বন্দী-ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে বার্লিনে গড়ে তুললেন আজাদ-সৈন্য বাহিনী এবং আজাদ-হিন্দ-সঙ্ঘ। চলল হিট্লারের সঙ্গে দর-কষাকষি। এ সম্পর্কে তিনি আফগানিস্থানে অবস্থিত ইতালীর রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে সত্যরঞ্জন বক্সী কর্তৃক কাবুলে প্রেরিত তাঁর প্রতিনিধির কাছে সত্যবাবুদের জন্য যে 'মেসেজ' পাঠিয়েছিলেন তাতে পাই : "অক্ষ-শক্তির সঙ্গে এখনো আমার রাজনৈতিক-বোঝাপড়া হয়নি। কিছু বোঝাপড়া না-করেই তারা আমাকে সকল রকম সাহায্য দিতে রাজী। কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষকে স্বীকার করে স্বাধীন-ভারতের রাষ্ট্রিক-প্রতিনিধিরূপে আমাকে স্বীকৃতি না দেবার পূর্বে আমি তাঁদের কাছ থেকে কোন সাহায্য নেব না।...কাজেই একটু অপেক্ষা করতে হবে।...তবে বার্লিন-রেডিয়ো থেকে হয়তো আমি দেশবাসীকে আমার বক্তব্য গুলি শোনাতে পারি।" ['সবার অলক্ষ্যে' ২য় পর্ব, পৃঃ ২০৫]

শোনালেন-ও তিনি তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক-বাণী বার্লিন-রেডিয়োর মাধ্যমে। সেটা হল ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর। আচম্বিতে

…সমগ্র ভারতবাসী—ভারতে ও পৃথিবীর নানা স্থানে অবস্থিত সকল ভারতবাসী—পরম উত্তেজনায় ও আনন্দে সে বাণী মনপ্রাণ দিয়ে শুনল। শুনে মুগ্ধ হল, আনন্দিত হল, কর্মদ্যোতনায় প্লাবিত হল। ভারত-জননীর প্রিয়তম দুলাল আজ শত্রুর সঙ্গে পাঞ্জা কষবার জন্যে, শত্রুর যে চরম শত্রু, তার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। ১৯১৫ সালে রাসবিহারী-যতীন মুখার্জি বা নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবীরা যে আয়োজন করেছিলেন তারই পুনর্গঠন ঘটালেন মহানায়ক সুভাষচন্দ্র ১৯৪১ সালে।…

এদিকে আর একটি ইতিহাসও রচিত হয়ে যাচ্ছিল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মহা-বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে। ভারতমাতার এই কৃতী সন্তান গড়ে রেখেছিলেন তাঁর চতুষ্পার্শ্বে একটি বিপ্লবী-আবহ। 'প্রথম মহাযুদ্ধে'র অভিজ্ঞতা তাঁর ভুলে যাবার কথা নয়। সে যুদ্ধকালের বিপ্লব-সংগঠনের নায়ক তাই বর্তমান যুদ্ধকালে বিপ্লব-সংগঠনে কোন ফাঁক রাখলেন না। তিনিও সৃষ্টি করলেন 'আজাদ হিন্দ্ সংগঠন' ও 'আজাদ বাহিনী', বন্দী ভারতীয়-সৈন্যদের নিয়ে। কিন্তু তিনি বুঝলেন যে, তাঁর রুগ্ন দেহ ও বার্ধক্য প্রয়োজনীয় নেতৃত্বদানে অশক্ত। কাজেই ডেকে আনলেন পরম আগ্রহে সুভাষ-চন্দ্রকে বার্লিন থেকে। তুলে দিলেন তাঁর হাতে আজীবন সাধনার সবটুকু ফলসম্ভার ও দায়িত্ব। অস্তগামী সূর্য তাঁর দ্যুতি-অর্ঘ্য নিঃশেষে তুলে দিলেন উদীয়মান সূর্যের হাতে। তাতে তিনি ফতুর হলেন না। নেতাজীর কর্মমাধ্যমেই বরং রাসবিহারী রঙে-রসে বৈভবে মৃত্যুহীন হয়ে থাকলেন পৃথিবীর ইতিহাসে।…

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কীর্তি বিশ্ববিদিত। তাঁর 'আজাদ-হিন্দ্-ফৌজ', 'রাণী ঝান্সি বাহিনী', 'বাল সেনা' ও 'আজাদ হিন্দ্ সরকারে'র অপূর্ব অবদানের মূল্যায়ন ভাবীকালের ইতিহাস সগৌরবে করবে। কিন্তু তাঁর যে-আহ্বান ভারতবর্ষের কাছে আজ একান্ত কৃতজ্ঞতায় স্বীকৃত—তা' হল বৃটিশ-শাসিত ভারতের রাজনৈতিক-মুক্তি।…

নেতাজীকে বুঝতে হলে তাঁর পারিপার্শ্বকে বুঝতে হয়, তাঁর দেশকে বুঝতে হয়, দেশের ঐতিহ্য, ইতিহাস ও বিপ্লবের অনাহত প্রবাহ সম্পর্কে অবহিত হতে হয়।...

নেতাজী প্রসঙ্গ সমাপ্ত করার পূর্বে ব্রহ্মের স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রখ্যাত নায়ক ডাঃ বা-ম-র সামান্য উক্তি এখানে উদ্ধৃত করবো ঃ—"সুভাষচন্দ্র একজন অবিস্মরণীয় পুরুষ। যে-লোক মাত্র একবার তাঁকে দেখেছে, সে-ও কখনো তাঁকে ভুলতে পারবে না। এমনি ধূর্ত তাঁর মহত্ত্ব। তিনি বিপ্লববাদী। অন্যান্য বিপ্লববাদীর মতই তাঁরও মহত্ত্ব এইখানে যে—একটিমাত্র কাজ, একটিমাত্র স্বপ্নকে কেন্দ্র করেই তিনি জীবন ধারণ করেছেন। সেই কাজ ও স্বপ্নের উপরেও তাঁর নিজস্বতার স্পষ্ট ছাপ।...যুদ্ধের সময় যে-স্বাধীনতা তিনি অর্জন করেছিলেন, তারই মধ্যে ভারতবর্ষের পরবর্তী স্বাধীনতার সূচনা। কয়েক বছর বাদেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। সচরাচর যা ঘটে থাকে, এক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটল। একজন বীজ বপন করেছেন, অন্যেরা ফসল কেটেছে।"
[ডাঃ বা-ম লিখিত 'ব্রেক-থ্রু ইন্ বার্মা' থেকে 'দেশ' কর্তৃক অনুবাদ, পৃঃ ১৭৯৫, তারিখ ২৬. ১০. ৬৮]

আবারও বলব যে, নেতাজী 'বিপ্লবের' রক্তধারায় ভারতভূমিকে উর্বর করে স্বাধীনতার বীজ বপন করেছেন—অপরে ফসল কেটেছে সত্যি, কিন্তু তা'ও ভাল করে কাটতে পারেনি।...

নেতাজীর পথ তাই ফুরোয়নি, তাঁর পাথেয় তাই অবাস্তর হয়ে ওঠেনি। তাঁর জন্মলগ্নে এই সত্যটুকু বুঝতে পারলেও মন্দের ভাল।...

আমাদের সুভাষচন্দ্র

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

১৯৪০-এর ফেব্রুয়ারী, নেতাজীর অন্তর্ধানের সপ্তাহ কয়েক আগে। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখা শেষ করে বাড়ী ফেরার উদ্যোগ করছি। রাত্রি যেন আটটার কাছাকাছি। ৩৮নং এলগিন রোড থেকে দেখা করবার তলব এল।

একটু বিস্মিত হলাম। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরে মাত্র একবার তাঁর সঙ্গে দেখা। ৩৮নং এলগিন রোড যেন বেসরকারী লাট-ভবন। সাক্ষাৎপ্রার্থীর আর অন্ত নেই। তারই মধ্যে আমিও একদিন গিয়ে সাক্ষাতের প্রার্থনা জানালাম। বলা হল, একটি স্লিপে নাম এবং প্রয়োজন লিখে দিতে। প্রয়োজন কিছুই ছিল না। সুতরাং নামটা লিখে দিলাম।

সেক্রেটারী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, প্রয়োজনটাও লিখতে হবে।

সর্বনাশ! প্রয়োজন?

সবিনয়ে জানালাম, বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। নিছক দেখা করতে এবং গল্প করতে এসেছি।

গল্প করতে! রাষ্ট্রপতির সঙ্গে! নিদারুণ বিস্ময়ে ভদ্রলোকের চোখ কপালে উঠল। আর সেই দিকে চেয়ে আমিও লজ্জায় কি যে বলব ভেবে পেলাম না।

সংসারে একটি মাত্র কাজই আমি পারি, গল্প করতে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির সে সময় কোথায়? বুঝলাম, রাষ্ট্রপতির কাছে আমার যাওয়ার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে।

নমস্কার করে বললাম, আচ্ছা আমি চললাম। আবশ্যক মনে —— [illegible] পারেন।

চট্টোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে বালিগঞ্জে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

পরেশচন্দ্র চা-বাগানের মালিক। তাঁর দেওয়া অতি উত্তম চা সুভাষচন্দ্র পর পর তিন পেয়ালা খেলেন এবং কিছু চা পাঠিয়ে দেবার জন্য ফরমায়েস করলেন। জীবনে তাঁর এই একটি মাত্র নেশাই আমরা দেখেছি।

আলোচনার শেষে সুভাষচন্দ্র কিন্তু আমাকে ছাড়লেন না। বললেন, পরেশ, সরোজ আমাকে পৌঁছে দিতে চলল। গাড়িতে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আর আস না কেন? বললাম, কোন কাজ তো থাকে না। আপনার কত কাজ। শুধু শুধু বিরক্ত করতে গিয়ে লাভ কি?

খোঁচাটা বুঝলেন। মুখে একটা ব্যথার ছায়া খেলে গেল। একটা কথা মনে পড়ে গেল। অনেকদিন পরে পরেশ একদিন অপেক্ষা করে বিরক্ত হয়ে চলে এসেছিলেন। পরে, আর একদিন সেই প্রসঙ্গ উঠতে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, এ জিনিসটাকে তুমি অমনভাবে নিচ্ছ কেন? এমন তো হতে পারে, একটু সুস্থ হয়ে নিরিবিলি তোমার সঙ্গে কথা বলব বলেই তোমাকে বসিয়ে রেখেছিলাম।

এদিকটা পরেশ ভেবে দেখেননি। খুবই লজ্জা পেয়েছিলেন সেদিন তিনি।

সেদিন তাঁর বসবার ঘরে অনেক রাজনৈতিক আলোচনা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন বাধেনি, কিন্তু তার ছায়া দীর্ঘতর হয়েছে। জার্মানীর আক্রমণের পদ্ধতিটা কি রকম হবে সেই নিয়েই তিনি আলোচনা করেন। যুদ্ধ বাধলে দেখি, জার্মান আক্রমণের ছকটা তাঁর কথার সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে।

তার কতদিন পরে এই টেলিফোন। বললাম, কাল সকালে যাব।

সুভাষচন্দ্র তখন শয্যাগত। টেলিফোন অন্য ঘরে। সুতরাং তাঁর সেক্রেটারী সেকথা তাঁকে জানিয়ে ফিরে এসে বললেন, এখন আসতে পারেন না?

আমাদের সুভাষচন্দ্র

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

১৯৪০-এর ফেব্রুয়ারী, নেতাজীর অন্তর্ধানের সপ্তাহ কয়েক আগে। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখা শেষ করে বাড়ী ফেরার উদ্যোগ করছি। রাত্রি যেন আটটার কাছাকাছি। ৩৮নং এলগিন রোড থেকে দেখা করবার তলব এল।

একটু বিস্মিত হলাম। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরে মাত্র একবার তাঁর সঙ্গে দেখা। ৩৮নং এলগিন রোড যেন বেসরকারী লাট-ভবন। সাক্ষাৎপ্রার্থীর আর অন্ত নেই। তারই মধ্যে আমিও একদিন গিয়ে সাক্ষাতের প্রার্থনা জানালাম। বলা হল, একটি স্লিপে নাম এবং প্রয়োজন লিখে দিতে। প্রয়োজন কিছুই ছিল না। সুতরাং নামটা লিখে দিলাম।

সেক্রেটারী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, প্রয়োজনটাও লিখতে হবে।

সর্বনাশ! প্রয়োজন?

সবিনয়ে জানালাম, বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। নিছক দেখা করতে এবং গল্প করতে এসেছি।

গল্প করতে! রাষ্ট্রপতির সঙ্গে! নিদারুণ বিস্ময়ে ভদ্রলোকের চোখ কপালে উঠল। আর সেই দিকে চেয়ে আমিও লজ্জায় কি যে বলব ভেবে পেলাম না।

সংসারে একটি মাত্র কাজই আমি পারি, গল্প করতে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির সে সময় কোথায়? বুঝলাম, রাষ্ট্রপতির কাছে আমার যাওয়ার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে।

নমস্কার করে বললাম, আচ্ছা আমি চললাম। আবশ্যক মনে করলে স্লিপটা রাষ্ট্রপতিকে দেখাতে পারেন।

চট্টোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে বালিগঞ্জে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

পরেশচন্দ্র চা-বাগানের মালিক। তাঁর দেওয়া অতি উত্তম চা সুভাষচন্দ্র পর পর তিন পেয়ালা খেলেন এবং কিছু চা পাঠিয়ে দেবার জন্য ফরমায়েস করলেন। জীবনে তাঁর এই একটি মাত্র নেশাই আমরা দেখেছি।

আলোচনার শেষে সুভাষচন্দ্র কিন্তু আমাকে ছাড়লেন না। বললেন, পরেশ, সরোজ আমাকে পৌঁছে দিতে চলল। গাড়িতে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আর আস না কেন? বললাম, কোন কাজ তো থাকে না। আপনার কত কাজ। শুধু শুধু বিরক্ত করতে গিয়ে লাভ কি?

খোঁচাটা বুঝলেন। মুখে একটা ব্যথার ছায়া খেলে গেল। একটা কথা মনে পড়ে গেল। অনেকদিন পরে পরেশ একদিন অপেক্ষা করে বিরক্ত হয়ে চলে এসেছিলেন। পরে, আর একদিন সেই প্রসঙ্গ উঠতে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, এ জিনিসটাকে তুমি অমনভাবে নিচ্ছ কেন? এমন তো হতে পারে, একটু সুস্থ হয়ে নিরিবিলি তোমার সঙ্গে কথা বলব বলেই তোমাকে বসিয়ে রেখেছিলাম।

এদিকটা পরেশ ভেবে দেখেননি। খুবই লজ্জা পেয়েছিলেন সেদিন তিনি।

সেদিন তাঁর বসবার ঘরে অনেক রাজনৈতিক আলোচনা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন বাধেনি, কিন্তু তার ছায়া দীর্ঘতর হয়েছে। জার্মানীর আক্রমণের পদ্ধতিটা কি রকম হবে সেই নিয়েই তিনি আলোচনা করেন। যুদ্ধ বাধলে দেখি, জার্মান আক্রমণের ছকটা তাঁর কথার সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে।

তার কতদিন পরে এই টেলিফোন। বললাম, কাল সকালে যাব।

সুভাষচন্দ্র তখন শয্যাগত। টেলিফোন অন্য ঘরে। সুতরাং তাঁর সেক্রেটারী সেকথা তাঁকে জানিয়ে ফিরে এসে বললেন, এখন আসতে পারেন না?

এ সময়ে তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা ভয়াবহ। দেশের ব্যাপারে তাঁর কাছে দিন এবং রাত্রের কোন প্রভেদ ছিল না। আমরা যারা রথী নই পদাতিক, রাত্রি বারোটায় তাদের সঙ্গে আলোচনা করলে তাদের বাড়ী ফেরার কি গতি হবে এ প্রশ্ন তাঁর মনেই জাগত না। তাঁর নিজের যখন মোটর ছিল না, তিনি নিজেও তখন রাত্রি বারোটার সময় কংগ্রেস অফিস থেকে পায়দলে বাড়ী ফিরতেন। কিন্তু সবাই যে সুভাষচন্দ্র নয় সেকথা তাঁকে বোঝায় কে,—বোঝাবার চেষ্টাও বোধ করি কেউ করেননি।

সুতরাং রাত্রিতে তাঁর কাছে যেতে ভয় হল। প্রাণের দায়ে মিথ্যা বললাম, এখন তো অফিসের কাজে ব্যস্ত। বলুন কাল ভোরেই আমি যাব।

সেক্রেটারী তাঁকে কথাটা জানিয়ে ফিরে এসে বললেন, তাই আসবেন।

আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

আমি জানতাম সুভাষচন্দ্র উঠতেন খুব ভোরে। রাত্রে ঘুমও তাঁর প্রায়ই হোত না। আজাদ হিন্দ ফৌজ তাঁকে দিন-রাত্রি কাজ করতে দেখে অবাক হয়ে যান। তাঁরা জানেন না, এ অভ্যাস তাঁর দীর্ঘকালের। আহার সম্বন্ধেও এই একই কথা। অনিশ্চিত সফরের সময় যখন কিছু পেতেন প্রচুর খেয়ে নিতেন, তারপর হুটো দিন হয়ত খাওয়াই জুটলো না। অভুক্ত অবস্থাতেও বাইরে থেকে দেখলে মনেও হোত না, তিনি শ্রান্ত। গান্ধীজীর জীবনযাত্রাও খুব কঠোর ছিল। কিন্তু তার পিছনে ছিল সাধনা। সাধনা ও প্রয়াস। সুভাষচন্দ্রের এই কঠোরতার পিছনে কোনও সাধনা ছিল কি না জানি না। কিন্তু মনে হোত দেশের সেবার জন্যে ভগবান যেন তাঁকে এই অসামান্য শক্তি জন্মের সঙ্গেই দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। কৃচ্ছ্রসাধন ছিল নিতান্ত সহজ এবং স্বাভাবিক। এত স্বাভাবিক যে সহজে চোখে পড়তে চায় না।

ভোরেই তাঁর এলগিন রোডের বাড়ীতে রওনা হলাম। খবর দিতে

সেক্রেটারী একেবারে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। কোণের লম্বা ঘরখানি। মধ্যে ফাঁক ফাঁক দুখানা খাট পাতা। শেষের দিকের খাটখানি তাঁর। তার কাছেই দু'খানা চেয়ার। তিনি খাটের উপর বসে। মুখে একমুখ দাড়ি। বেশ রোগা চেহারা।

জিজ্ঞাসা করলাম, দাড়ি কামাননি কেন?

হেসে বললেন, কী আর হবে কামিয়ে? আবার তো সেই জেলে।

কুশল প্রশ্ন এবং গোটাকয়েক আজে-বাজে কথার পর বললেন, শোনো, তোমাকে একটা বিশেষ দরকারে ডেকেছি।

—বলুন।

—কিরণবাবুর সঙ্গে আমার আপস করিয়ে দিতে হবে।

সর্বনাশ! আমার তো বিশ্বাস করতেই কিছুক্ষণ গেল। তারপর বললাম, এ তো মস্তবড় রাজনীতির ব্যাপার। এ আমার কাজ নয়।

উনি বললেন, দু'জনার মধ্যে আপসের চেষ্টা মাঝে মাঝে যে হয়নি তা নয়। কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে যিনি চেষ্টা করেছেন, তাঁর উপর হয়ত আমার আস্থা ছিল না, নয়তো আমার পক্ষ থেকে যিনি চেষ্টা করেছেন, তাঁর উপর তাঁর আস্থা ছিল না। তাই সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তোমার উপর আমাদের দু'জনারই সমান স্নেহ। তুমি চেষ্টা করলে হবে, এই কথা মনে হতেই তোমাকে ডেকেছি।

বাংলায় রাজনীতির ক্ষেত্রে যে দু'জনের প্রতি আমার অবিচল ভক্তি তাঁরাই এই দু'জন। এক জাহাজে একসঙ্গে দু'জনে ভারতে ফিরে উচ্চ সরকারী চাকুরী ত্যাগ করে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে অবতীর্ণ হন। দু'জনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। রাজনীতির কুটিল চক্রান্তে সেই বন্ধুত্বেও ফাটল ধরল। আমরা যারা রাজনীতির আবর্তের বাইরে থেকে দু'জনকেই সমান ভালবাসতাম তাদের পক্ষে এই বিরোধ কতখানি মর্মান্তিক তা ভাষায় জানাবার নয়। এই বেদনা আমরা নিঃশব্দেই বহন করতাম। তাঁদেরও জানাতে পারতাম না।

আমার আরো দুর্ভাগ্য সুভাষচন্দ্র কিরণশঙ্করকে ইউরোপ থেকে যতগুলি পত্র লিখেছিলেন,—কোনোটা সরাসরি, কোনোটা অন্যের মারফৎ,—তার প্রত্যেকখানিই আমি দেখেছি। শুধু উপরের ধুলো-বালি নয়, অন্তরের অন্তস্তলেও এই বিরোধ কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে, তা আমি জানতাম। তাই যে খবর শুনে আমার মন আনন্দে লাফিয়ে ওঠার কথা, সে খবরেও তা নিস্তেজ হয়ে রইল।

মুখে বললাম, আপনাকে সত্য বলি, ভরসা আমার নেই। তবু আপনি বললেন, সুতরাং আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র এতেই খুশী হয়ে উঠলেন, বললেন, তা হলেই হবে। তুমি এখনই ফিরে এসে আমাকে খবর দেবে। ভয়ানক তাড়া।

—আচ্ছা। বলে বেরিয়ে এলাম।

বেরিয়ে তো এলাম। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ভয়ানক তাড়া। ট্রাম এবং পায়দলে সে তাড়ার চাহিদা মেটানো অসম্ভব। সুতরাং পুনরায় পরেশচন্দ্র।

পরেশ তো কথাটা শুনেই চমকিয়ে উঠল। তখনই তার গাড়িখানা আমাকে সমর্পণ করে বলল, আর এক মিনিটও দেরি নয়। তুমি কিরণবাবুর কাছে চলে যাও, সেখান থেকে সুভাষবাবুর কাছ হয়ে আমাকে জানিয়ে যেও। কাল সকালে আমরা দু'জনেই সুভাষবাবুর কাছে যাচ্ছি।

গেলাম কিরণবাবুর কাছে। খবর পেলাম তিনি রাতে শয্যাশায়ী। আমার বিশেষ দরকার শুনে উপরেই আমাকে ডেকে পাঠালেন।

দেখলাম, অসুখটা বেশিই। বৈদ্যুতিক চিকিৎসা চলেছে। একটু আগেই সে পর্ব শেষ করে ডাক্তার বিদায় হয়েছেন। অবসন্নের মত কিরণবাবু পড়ে আছেন। যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে মুখ রেখাঙ্কিত হচ্ছে। কিন্তু সে রেখা এত সূক্ষ্ম যে সহজে চোখে পড়ে না।

এত বড় ধৈর্য সচরাচর চোখে পড়ে না।

জিজ্ঞাসা করলেন, কি খবর বলতো ?

তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে বলব কি না ভাবছি, বললেন, বল এখন একটু সুস্থ বোধ করছি।

বললাম, সুভাষবাবুর কাছে গিয়েছিলাম।

নিস্পৃহভাবে (আমি জানি এ কৃত্রিম) জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছেন ?

—ভালো নয়।

—তারপরে ?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। সেই দৃষ্টি,—যা মনের অন্তস্তলে তীব্র রশ্মি ফেলে সব দেখে নেয়। যে দৃষ্টির সামনে কিছুই লুকানো চলে না।

বললাম, তিনি আপনার সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে নিতে চান। তাই আমাকে পাঠালেন।

তাঁর বড় বড় চোখ দুটো যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল। বললেন, তাই তোমাকে পাঠালেন। আর তুমি এলে ? তুমি কি জানো না…

হাত জোড় করে বললাম, জানি। কিন্তু কার অপরাধ কতখানি তার মীমাংসা আজকে আর সম্ভব নয়, করে লাভও নেই। আপনি শুধু বিবেচনা করে দেখুন, যারা আপনাদের উভয়কেই ভালবাসে তাদের কাছে এই বিরোধ কতখানি মর্মান্তিক।

কিরণবাবু চুপ করে রইলেন।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন, কি শর্তে আপস হবে ? সুভাষবাবু কোন শর্ত দিয়েছেন ?

—সে তো আপনাদের দু'জনের দেখা হলে তবে ঠিক হবে।

কিরণবাবু বললেন, না সরোজ। আমার শরীর খুব অসুস্থ। বেশী ঝামেলা পোয়াবার সামর্থ্য নেই। আমার নিজের শুধু একটি মাত্র শর্ত আছে ঃ যে শর্তেই আপস হোক, তার তিনটি কপি হবে, একটি তাঁর কাছে থাকবে, একটি তোমার কাছে, একটি আমার কাছে।

শর্ত শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। একটু পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, তাহলে আর হল না।

—কেন?

—আপনাদের দু'জনকে এক জায়গায় এনে দেওয়া পর্যন্ত আমার কাজ। সেই শর্তের একটা কপি আমার কাছে থাকবে, এত বড় অপমান আপনাদের করবার স্পর্ধা আমার নেই।

বাতের যন্ত্রণাটা বোধ হয় আবার বাড়ল। চোখ বন্ধ করে অবসন্নের মত কিরণবাবু বললেন, তাহলে যা ভালো বোঝ কর। সুভাষবাবুর কাছে যেতে হলে কয়েকদিন পরে না হলে তো পারছি না।

খুশী হয়ে বললাম, বেশ তো। তাই হবে। তাহলে সেই কথাই সুভাষবাবুকে বলিগে?

তিনি সম্মতি দিলে উঠে এলাম এবং সুভাষবাবুকে খবরটা দিয়েও এলাম।

পরের দিন সকালে পরেশ আর আমি গেলাম।

সেদিন সুভাষবাবুকে অনেককাল পরে আবার সেই স্নেহশীলরূপে দেখলাম। পরেশ চা খাবে না, এইমাত্র খেয়ে এসেছেন।

—তা হোক। তবু আমার সামনে আর একটু খাও।

এই যে সামান্য একটি কথা "আমার সামনে", এই একটি কথায় তাঁর স্নেহার্ত হৃদয়কে যেন পরিপূর্ণরূপে দেখা গেল। হয়ত অনির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃভূমিকে ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালে যাঁদের তিনি ভালবাসতেন, তাঁদের সঙ্গে বিদায়পর্ব পরোক্ষভাবে শেষ করে নিচ্ছেন।

বললেন, পরেশ, কিছু টাকা দাও দিকি।

পরেশ এক-বগ্‌গা লোক। গম্ভীরভাবে বললেন, যদি আপনার জন্যে হয় দোব, পার্টির দরকার হলে দোব না।

সুভাষচন্দ্র হাসলেন। তাঁর সেই অনবদ্য হাসি। পরেশের পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন, তোমার confidence এ-জীবনে আর পেলাম না।

কিছু রাজনৈতিক আলোচনার পর সেদিন আমরা এলাম। এর পরে প্রত্যহ সকালে আমার কাজ হল সুভাষবাবু আর কিরণবাবুর মধ্যে তাঁদের মাকুর মত ছোটাছুটি করা।

এর মধ্যে একদিন একটা ফাইল আমার সামনে দিয়ে বললেন, এগুলো পড়ে রাখ।

মহাত্মাজী সুভাষচন্দ্রকে যে-সকল চিঠি লিখেছিলেন ত্রিপুরা কংগ্রেসের আগে এবং পরে, সেই সমস্ত চিঠি। প্রত্যেকখানি পত্র স্নেহপূর্ণ ভাষায় লেখা, কিন্তু প্রত্যেকখানি এই বলে শেষ করা হয়েছে যে, তাঁদের উভয়ের পথ ভিন্ন, এক নৌকায় একসঙ্গে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়।

এর একখানি চিঠি সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের অত্যল্প পরেই সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়। কাজটা ঠিক হয়েছিল বলে আমার মনে হয় না। কেন তাও বলছি।

চিঠিগুলো পড়তে পড়তে মহাত্মাজীর ওপর রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলে উঠেছিল। একখানি চিঠিতে এমনও তিনি লিখেছিলেন যে, সুভাষচন্দ্রকে তিনি পুত্রের মত স্নেহ করেন। অথচ উভয়ের মধ্যে এমন কি 'fundamental difference' (মূলগত মতভেদ) যে কিছুতেই একসঙ্গে কাজ করা যায় না, সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়ালে তাঁর বিরোধিতা করতে হবে এবং জিতলে তাঁকে সেই আসন থেকে, এমন কি কংগ্রেস থেকেও সরাতে হবে, তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য।

নিজেকে সামলাতে না পেরে বলেছিলাম, কী ভণ্ডামী!

সুভাষচন্দ্র ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলেন এই মন্তব্যে। কঠোরভাবে বলেছিলেন, ভণ্ডামী নয়। মন্তব্য করো না। পড়ে যাও।

পরে দেখা গেছে, নেতাজী সুভাষও পুনঃ পুনঃ ভারতের বাইরে থেকে মহাত্মাজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। সেই জন্যে মনে হয়, সেই সময় ওই চিঠিখানি প্রকাশ করা কখনই তাঁর অভিপ্রেত ছিল না।

সে যাই হোক, সুভাষচন্দ্র আর কিরণবাবুর আপসের সম্ভাবনা ক্রমেই প্রবলতর হচ্ছিল। এত শীঘ্র এমনটি যে হবে আমি আশা করিনি। অথচ মুশকিল হয়েছিল এক জায়গায়, কিরণবাবুর অসুস্থতা। এদিকে সুভাষবাবুর আগ্রহ এত বেশি যে, বিলম্ব সইছিল না। এর সমস্তটাই কিন্তু রাজনৈতিক নয়, অনেকখানি ব্যক্তিগত। সম্ভবতঃ চলে যাওয়ার আগে তিনি তাঁর প্রথম রাজনৈতিক জীবনের বন্ধুকে কাছে পেতে চেয়েছিলেন। বস্তুতঃ এ ছাড়া আপসের অতখানি কোনও অর্থই হতে পারে না। নইলে ছু'দিন পরে যিনি চলে যাবেন তাঁর কাছে আর আপসের মূল্য কি?

এই দিন, কিম্বা এর পরের একদিন ঠিক মনে নেই, হঠাৎ গভীর খেদের সঙ্গে বললেন, দেখ, বন্ধু আমার টেঁকে না। কেন বল তো?

কথাটা সত্য। তাঁর সকল বন্ধুর কথা জানিনে। কিন্তু ছু'জন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাঁর জীবনে স্থায়ী হননি।

বললাম, তার কারণ আপনি একজন 'ব্যক্তি' নন।

সুভাষবাবু হেসে ফেললেন, খুব আগ্রহান্বিতও হলেন, বললেন, তার মানে?

—তার মানে বন্ধুত্ব হয় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে। আপনার গৃহ নেই, পরিজন নেই, সমাজ নেই, সামাজিক মানুষের সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিছুই নেই। বন্ধুত্ব হবে কার সঙ্গে?

—তুমি কি বলতে চাও আমার হৃদয় নেই? আমি ভালবাসতে পারি না?

তাড়াতাড়ি বললাম, সমুদ্রের মত বিশাল আপনার হৃদয়। কিন্তু তাতে ব্যক্তির কোনো স্থান নেই। অথবা সেই প্রশান্ত মহাসাগরে কোন্ জেলের ডিঙ্গি কোথায় হারিয়ে গেল, খবর রাখার সময়ই নেই। আপনাকে যারা ভালবেসেছে সংসারে তাদের চেয়ে হতভাগ্য জীব আর নেই।

সুভাষবাবু হাসতে লাগলেন, কি মনে করে জানি না।

বলেছিলাম, এই সাম্প্রদায়িকতার আগুন নেভাবে কে?

বললেন, ইংরেজ থাকতে নিভবে না।

—ইংরেজ চলে গেলে?

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন সুভাষচন্দ্র। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, দেখ, ইউরোপ ঘুরে এসে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, স্বাধীনতার পরে অন্ততঃ কুড়ি বছরের জন্যে benevolent dictatorship (সদাশয় স্বৈরতন্ত্র) না হলে এই দেশকে সর্বদিকের এই বিশৃঙ্খলার হাত থেকে বাঁচানো যাবে বলে আমি মনে করি না। রাজনৈতিক আদর্শের কথা ছেড়ে দিয়ে রাশিয়া, ইটালী কিম্বা জার্মানীর দিকে চেয়ে দেখ, কত অল্পদিনে জাতটাকে কি রকম গ'ড়ে তুললে।

হঠাৎ বললেন, ব্যস্ত হোয়ো না হে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কথাটা এমন প্রত্যয়ের সঙ্গে এমন জোর দিয়ে বললেন যে, এরপর আর কোনো প্রশ্নেরই আবশ্যক হল না।

আমি উঠে বললাম, আচ্ছা তাহলে আমি আসি।

গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ হল, বোসো।

তারপর সেক্রেটারীকে বললেন, বলুন আজ আমার শরীর খুব খারাপ। আর একদিন যেন টেলিফোন করে আসেন।

আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম। বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র দেখাই করলেন না। বরং মনে হল তাঁর আসাতে একটু বিরক্তই হয়েছেন।

শেষের দিকে যাঁদের সঙ্গে তিনি কাজ করেছিলেন, তাঁদের অনেকের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত আলোচনা এর মধ্যে হয়েছে। কিন্তু তিনি আজ অনুপস্থিত। সুতরাং সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা উচিত নয়। এইটুকু বলতে পারি তাঁদের কারো কারো 'পরে তিনি অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। একজনের সম্বন্ধে তিনি এমনও বলেছিলেন যে, ভদ্রলোক hundred and twenty per cent মিথ্যে কথা

বললেন। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার তাঁর 'সুভাষের সঙ্গে বারো বছর' গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন, 'সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগের আগে খুব তিক্ততা নিয়েই গিয়েছিলেন।' কথাটা সে সত্য আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। তাঁর অন্তর্ধানের আগের দুই সপ্তাহ আমি প্রত্যহ সকাল ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছি। এই মূল্যবান ঘণ্টাগুলিতে তাঁর সঙ্গে বহু বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তার অনেক কিছু আজও বলার সময় আসেনি। তিনি ফিরে না এলে বলবার সময় হবেও না।

কিন্তু সেকথা যাক।

কিরণবাবুর সঙ্গে আপসের কোন বিঘ্নই দেখা দিল না। উভয়েরই কোন শর্ত ছিল না। উভয়েই তাঁদের পুরাতন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ঝালাই করবার জন্য ব্যাকুল। বিঘ্ন দাঁড়ালো উভয়ের স্বাস্থ্য। উভয়েই শয্যাগত, একের অন্যের কাছে গিয়ে সাক্ষাৎ করার সামর্থ্য নেই। অথচ সাক্ষাতের জন্য ব্যস্ত।

অবশেষে কিরণবাবু একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং উভয়ের মধ্যে সাক্ষাতের দিন এবং সময়ও স্থির হল। ব্যবস্থা হল সেই সময় আমি কিরণবাবুকে নিয়ে সুভাষবাবুর কাছে আসব।

কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস, নির্দিষ্ট দিনের আগের দিন কিরণবাবু আবার সায়টিকায় আক্রান্ত হলেন। ফোন এল, তারিখটা পিছিয়ে দেবার জন্যে। খবরটা সুভাষবাবুকে দিতে তিনি যেন দমে গেলেন। অথচ উপায় কি? কয়েকবারই তিনি বললেন, কোন রকমে তাঁকে আনা যায় না?

তখন কি জানি, তিনি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তাই এত তাড়া? তাহলে কিরণবাবু যে-কোন উপায়েও দেখা করতেন। কিন্তু কে জানে তখন সেকথা!

অবশেষে সুভাষবাবু বললেন, বেশ, তাই হবে। তবে আসবার আগে একটা ফোন করে এস।

এর দু'দিন পরেই কিরণবাবুর টেলিফোন পেলাম, তিনি প্রস্তুত। পরের দিন সকালেই সুভাষবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান।

উল্লসিত হয়ে তখনই টেলিফোন করলাম সুভাষবাবুর কাছে। খবর পেলাম, তিনি দরজা বন্ধ করে সাধনায় বসেছেন। তাঁকে খবর দেবার কোন উপায় নেই। সুতরাং পরে দেখা হবে।

সে আর এমন কি ব্যাপার! না হয় ক'দিন পরেই দেখা হবে। কিন্তু বলা বাহুল্য, আর দেখা হয়নি। সেই সাধনার আসন থেকেই তিনি অন্তর্হিত হন। সেকথা সকলেই জানেন।

অনেকে বলেন সুভাষচন্দ্রের এই অসুস্থতা একটা ছল মাত্র। আমার নিজের কিন্তু তা মনে হয়নি। বরং সত্য সত্যই তাঁকে খুব দুর্বলই দেখেছিলাম। এবং সে দুর্বল অবস্থাতে কি করে তাঁর পক্ষে কাবুল যাত্রা করা সম্ভব, তা ভেবেও কোনোদিন বিস্ময় অনুভব করিনি। আমি যে সুভাষচন্দ্রকে জানি, দুর্জয় তাঁর ইচ্ছাশক্তি এবং তাঁর দেহ সকল অবস্থাতেই সেই ইচ্ছাশক্তির অধীন। শারীরিক দুর্বলতা কোনদিনই তাঁর দেশপ্রেমের প্রতিবন্ধক হতে সাহস করেনি। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এ শক্তি সম্ভবতঃ একমাত্র তাঁরই ছিল।

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পরে যে প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি আমার মনকে আলোড়িত করেছে, সে হচ্ছে গান্ধীজীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন নিয়ে তাঁর সংঘর্ষ। এর আগে আর কোন কংগ্রেস-নেতা দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হবার জন্য এমন জেদ করেননি। অথচ তিনি করেন। কেন? গান্ধীজীরও তিনি পুত্র-তুল্য, প্রতিদ্বন্দ্বী কখনই নন। অথচ গান্ধীজী তাঁর নির্বাচন প্রস্তাবের প্রকাশ্য এবং অশোভন বিরোধিতা করেন। এমন কি, সুভাষচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়ার পরাজয়কে তিনি নিজের পরাজয় বলে ঘোষণা করতেও দ্বিধা করেননি; এই বা কেন?

অনেকে মনে করেন সুভাষচন্দ্র সন্দেহ করেছিলেন, গত মহাযুদ্ধে গান্ধীজী কিছুতেই ইংরেজকে বিব্রত করবেন না। (যদিও

কার্যত ১৯৪২-এর আগস্ট বিপ্লবে তিনি তা করেছিলেন) তাই অসহিষ্ণু তরুণ সম্প্রদায়ের মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় দেবার জন্যে তিনি পুনরায় নির্বাচন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর 'Indian Struggle' পুস্তকে স্পষ্টতঃ তিনি লিখেছিলেনও: Mahatma Gandhi had rendered and will continue to render phenomenal service to his country. But India's salvation will not be achieved under his leadership (৪১৪ পৃঃ), অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী তাঁর স্বদেশের প্রভূত সেবা করেছেন এবং করবেনও। কিন্তু ভারতের মুক্তি তাঁর নেতৃত্বে আসবে না।

কিন্তু এই বইখানি ১৯৩৪ সালের রচনা। তারপর গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুবই মধুর এবং হৃদ্য হয়েছিল। সুতরাং শেষ পর্যন্ত এ মত তাঁর ছিল কি না সন্দেহ। প্রথমতঃ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কংগ্রেসে অবারিত নয়। তাঁকে ওয়ার্কিং কমিটির মতানুযায়ীই চলতে হবে। সুতরাং সেই পদের জন্য লোভার্ত হবার পাত্র আর যেই হোন, সুভাষচন্দ্র নন। দ্বিতীয়তঃ গান্ধীজীর মত ব্যক্তি তাঁর অভ্রভেদী মর্যাদা বিস্মৃত হয়ে তাঁর পুত্র-তুল্য এক তরুণের বিরুদ্ধে স্বহস্তে অস্ত্রধারণ করবেন কেন, এও কি একটা প্রশ্ন নয় ?

আগেই বলেছি, সুভাষচন্দ্রকে লেখা মহাত্মাজীর অনেকগুলি চিঠি আমি নিজে দেখেছি। এই সমস্ত পত্রের স্নেহপূর্ণ ভাষাকে ভাওতামী বলে অভিহিত করার জন্য তিরস্কৃতও হয়েছি। এর অন্তর্নিহিত অর্থ কি হতে পারে, তাও তো ভেবে দেখবার।

এই প্রসঙ্গে একটি সন্দেহ আমার মনে ওঠে। আমার মনে হয়: তাঁর হিটলার-মুসোলিনীর সঙ্গে মৈত্রী এবং তাঁদের সাহায্যে বাইরে থেকে ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহ করে ভারতের বৈদেশিক শাসন থেকে মুক্ত করার পরিকল্পনা সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে জানিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতিভাবে ভারত ত্যাগ করতে পারলে সুভাষচন্দ্রের প্রয়াসে

যথেষ্ট সুবিধা হবে বলেই তিনি দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হবার জন্য অতখানি জেদ দেখিয়েছিলেন এবং তাতে সাফল্য লাভ করেছিলেন। পক্ষান্তরে মহাত্মাজী সম্ভবতই এই পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন। পত্রে পুনঃ পুনঃ যে fundamental difference-এর তিনি উল্লেখ করেছিলেন, সে কি এই নয়! এরই জন্যে সুভাষচন্দ্রের নির্বাচনে অশোভন বিরোধিতা করাই কি গান্ধীজীর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না?

অবশ্য এ আমার অনুমান মাত্র। সত্য হতে পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে সেদিন বাংলায় তথা সমগ্র ভারতে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে বিষয়টা পরিষ্কার হওয়ার আবশ্যকতা আছে। কিন্তু কে সে সম্বন্ধে আলোকসম্পাত করবে?

সুভাষচন্দ্র আজ এখানে অনুপস্থিত। যাঁরা বলেন তিনি জীবিত নেই, তথ্যসহ কোনো প্রমাণ তাঁদের হাতে নেই। যাঁরা বলেন জীবিত, নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ তাঁদের হাতেও নেই। কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ভারতবর্ষ তাঁকে ফিরে পাবার জন্য ব্যাকুল। এই ব্যাকুলতা শুধু নিরুদ্দিষ্ট প্রিয়জনকে ফিরে পাবার হৃদয়গত ব্যাকুলতাই নয়। তার সঙ্গে আছে প্রয়োজনের তাগিদ। ভারত আজ স্বাধীনতা পেয়েছে, কিন্তু তৃপ্তি পায়নি, পায়নি সুখ-সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। এই অন্ধকারে চতুর্দিকে অভাব ও দুর্দশার আঘাতে বারে বারে তার হৃদয় উন্মুক্ত করে সকাতর আহ্বান উঠেছে: সুভাষ, তুমি কোথায়? ফিরে এস, ফিরে এস। কে জানে সে আহ্বান তাঁর কানে পৌঁচুচ্ছে কি না।

সুভাষচন্দ্রকে ইংরেজরা কী চোখে দেখেছিলেন তার সব কথাটা আমরা জানি না। বরং বলা উচিত অল্প কথাই জানি। প্রীতির চোখে যে দেখেনি সেটা বোঝা যায়—ভীতির চোখেই দেখেছে,—এবং সুভাষচন্দ্র নিশ্চয় ইংরেজের প্রীতি-ভিখারী ছিলেন না। ইংরেজের ভীতির পরিমাণের উপরই সুভাষচন্দ্রের বিরাটত্বের পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে, কারণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে তিনি জীবনের লক্ষ্য করেছিলেন এবং ভারতবর্ষের পরাধীনতার উপরে ইংরেজের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করেছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক শক্তিকে তাই ইংরেজ সর্বাধিক বিদ্বেষের চোখে দেখবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কক্ষে কক্ষে অনেক অস্ত্রই জমা ছিল।

ভারতস্থ ইংরেজের কালো খাতায় সুভাষচন্দ্রের নাম তাঁর কৈশোরেই লেখা হয়ে গিয়েছিল যখন ওটেন সাহেবকে প্রহারকাণ্ডে নেতৃত্ব করেছিলেন। গুরুমারা ছেলেটির ঔদ্ধত্য অতঃপর ভারত ছেড়ে ইংলণ্ডে গিয়ে হাজির হ'ল—সুভাষচন্দ্র আই. সি. এস. পরীক্ষা-ফল ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপরে ভারতে ফিরে এসে চিত্তরঞ্জন দাশ নামক অতি বুদ্ধিমান অথচ গতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে থেকে সুভাষচন্দ্র যে সব কাজ করলেন, তাও আশঙ্কার সৃষ্টি না করে পারেনি। ত্যাগ মানে বুদ্ধি ত্যাগ নয়, সুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রে ইংরেজ দেখল অসামান্য সংগঠনশক্তি এবং অনমনীয় চরিত্রশক্তি—সেই সঙ্গে ব্যাপক জনপ্রিয়তা। যুবরাজের আগমন উপলক্ষে হরতাল সংগঠনে, কর্পোরেশনে প্রধান কর্মকর্তারূপে কার্যনির্বাহে, উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণে সুভাষচন্দ্র শাসকশক্তির পক্ষে ভীতিজনক নানা পরিচয় প্রকাশ করতে লাগলেন।

অথচ সুভাষচন্দ্র যে মূলে বিপ্লবী তা বুঝতে কারো অসুবিধা হয়নি। বিপ্লবের ছায়া তাঁর চতুর্দিকে জ্যোতির্বলয়ের মত ঘিরে থেকে রহস্যময় আকর্ষণ সৃষ্টি করছে, ওদিকে প্রকাশ্যে তিনি তাঁর সংগঠনশক্তির দ্বারা দলবৃদ্ধি করে চলেছেন, দলীয়তার জন্য বহু নিন্দা লাভ করছেন, কিন্তু ভ্রুক্ষেপ করছেন না, দল-উর্ধ্বে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের বায়ুভুতো মহিমার জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন না, অর্থাৎ স্পষ্ট প্রখর একটি সংগঠন তৈরী করে তুলছেন যা ভবিষ্যতে বাহিনী হয়ে উঠতে পারবে—সুতরাং যতই তিনি বলুন যে, "না, না, সরকার যেমন ভাবে, আমি মোটেই তেমন মারাত্মক মানুষ নই"—সরকার কিন্তু তাঁকে মারাত্মক মনে না করে পারেনি।

ভারতের ইংরেজদের কাছে উদ্‌ঘাটিত সুভাষচন্দ্রের এই পরিচয় বিস্তারিত আকারে হাজির হ'ল ইংলণ্ডের ইংরেজের কাছে যখন তিনি 'ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল' লিখলেন, এবং সে গ্রন্থ ভারতে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হ'ল। যিনি ছিলেন মাথা গরম বাঙালী ছোকরা, নির্বোধ, কেননা আই সি এস. ত্যাগ করেছেন, পাষণ্ড, কারণ ইংরেজের মহত্ত্ব দেখতে অপারগ, তিনি আবার লেখক হয়ে দাঁড়াবেন—যে-লেখায় গান্ধীর কঠোর নিন্দা থাকা সত্ত্বেও গান্ধীভক্ত রোমা রোঁলা প্রশংসা করবেন, (লোকটা আসলে বলশেভিক!) এবং হিংসায় উস্কানি যে-বই তাকে ভারতে নিষিদ্ধ করার মত উপযুক্ত কাজ করলেও এইচ জি. ওয়েলস (উঃ, ঐ বাচাল লেখকটা!) বা জর্জ বার্ণাড শ-ও (চিরশত্রু আইরিশ!) প্রতিবাদে এগিয়ে আসতে মনস্থ করবেন।

"লোকটি জিনিয়াস", ভারতসচিব হাউস অব লর্ডসে দাঁড়িয়ে বললেন, "দল বাঁধবার, কাজ চালাবার অদ্ভুত ক্ষমতা।" ভারত-সচিবের মতে, এমন সম্পদকে কারাগারের বাইরে ফেলে রাখা যায় না।

যখন শোনা গেল, এহেন মানুষ হরিপুরা কংগ্রেসের (১৯৩৮) সভাপতি হতে পারেন, তখন তাঁর সম্বন্ধে মত না বদলালেও ইংরেজকে

ব্যবহারের কিছুটা বদল করতে হ'লই। লিবার‍্যাল ইংরেজ এবার এগিয়ে এসে তাঁর করমর্দন করল।

কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্র কিছুটা আন্তর্জাতিক চরিত্র হয়ে উঠলেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর মধ্যে সচেতনতা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান, পণ্ডিত জহরলাল ছাড়া এ-ব্যাপারে তাঁর সমতুল কেউ নেই কংগ্রেসে। অধিকন্তু, বলা যায়, ভারতের জাতীয় প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে নির্দিষ্ট-ভাবে অনুধাবনের ও ব্যবহারের সামর্থ্য অপর যে-কোনো কংগ্রেসীর তুলনায় তাঁর বেশী। কিন্তু তা হলেও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ঠিক ঠিক পেলেন কংগ্রেস-সভাপতি হবার পরেই।

১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্র ইংলণ্ডে যে-সংবর্ধনা পেয়েছিলেন তা তাঁর পক্ষে আশাতীত।

শত্রুপক্ষও আগে কোনো ভালবাসা তাঁর প্রতি দেখায়নি। কারাগারে জীবনের বড় অংশ কাটাতে হয়েছে, তথাকথিত মুক্ত জীবনেও গুপ্তচরের সদাজাগ্রত চোখ অলক্ষ্যে পাহারা দিয়েছে। এর আগে ১৯৩৩ সালে যখন ইংলণ্ডে যেতে চেয়েছেন, যেতে দেওয়া হয়নি। এবার অকস্মাৎ দ্বার খুলে গেল—মনে হ'ল কিছু কিছু ইংরেজের হৃদয়ের দ্বার পর্যন্ত যেন খুলে গেছে।

চিকিৎসা সমাপ্ত করবার জন্য সুভাষচন্দ্র ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসের শেষভাগে আবার ইউরোপ যাত্রা করেন। অস্ট্রিয়ায় প্রিয় স্বাস্থ্যনিবাস বাডগাস্টিনে পৌঁছলেন।

চিকিৎসা সম্পূর্ণ হয়েছিল, গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়নি। তার আগেই দেশের আহ্বানও এসে গেল। দেশে ফেরার আগে ইংলণ্ডে ঘুরে যাবার আমন্ত্রণ তাঁকে স্বীকার করতে হ'ল। গ্রেট বৃটেনের বিশিষ্ট ভারতীয়রা ইংলণ্ডে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ইংলণ্ডে প্রবেশের বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল পরিবর্তিত অবস্থায় তা শিথিল করে দেওয়া হ'ল। সহানুভূতিশীল লর্ড কিনোউলের জিজ্ঞাসার উত্তরে

মার্কু'ইস অব জেটল্যাণ্ড জানিয়েছিলেন, "সুভাষ বসু যদি ইংলণ্ডে আসতে চান, তাহলে কোনো বাধা সৃষ্টি করা হবে না।" সুতরাং "সেই বিশেষ দিনটি এল—গ্রেট বৃটেনের ভারতীয় সম্প্রদায় যার জন্য এত প্রতীক্ষা করেছে"—১০ই জানুয়ারী রবিবার বিকালে সুভাষচন্দ্র ভিক্টোরিয়া স্টেশনে এসে নামলেন। আবহাওয়া খারাপ ছিল, ট্রেন এক ঘণ্টা লেট, তবু সুভাষচন্দ্রের অনুরাগী ভারতীয় ও ইংরেজরা ভিড় করে অপেক্ষা করছিল স্টেশনে। সর্বমতের ভারতীয়রাই উপস্থিত, অনেকেই এসেছেন জাতীয় পোশাকে। কয়েকজনের সযত্ন তত্ত্বাবধানে রয়েছে বিরাট একটি ত্রিবর্ণ পতাকা, বাইরের লোকজনকে যা ভারতীয় নেতার আগমনের কথা বুঝিয়ে দিচ্ছে। ইঞ্জিন স্টেশনে ঢোকামাত্র জয়ধ্বনি উঠল—"সুভাষবাবু কি জয়! মহাত্মা গান্ধী কি জয়! ইনক্লাব জিন্দাবাদ!"

সুভাষচন্দ্র অবতরণ করা মাত্র ভারতীয় রীতিতে সজ্জিত বাঙালী মহিলা শ্রীমতী ভট্টাচার্য ভারতীয় রীতিতে তাঁকে প্রথম মাল্যদান করে বাংলায় কুশল প্রশ্ন করলেন। "তারপরেই অভিনন্দন জানালেন মিস ইন্দিরা নেহরু।"

সুভাষচন্দ্রকে সংবর্ধনা জানাতে "যে জনতার সমাবেশ হয়েছিল, তার তুল্য জনতা মাত্র দেখা গেছে গান্ধী ও নেহরুর সংবর্ধনায়।" প্রচুর মালা, প্রচুর ছবি, প্রচুর অনুরাগবাক্য তার মধ্যে দিয়ে স্টেশন-কর্মীদের সহায়তায় দ্রুত বেরিয়ে সুভাষচন্দ্র গাড়িতে উঠলেন। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ডরচেস্টার হোটেলে আন্তর্জাতিক সংবাদ-প্রতিনিধিদের সম্মুখীন তিনি হবেন। হোটেলের দিকে যে-গাড়িতে ছুটলেন, তার সামনে লাগানো ছিল কংগ্রেসের পতাকা, চালাচ্ছিলেন ভারতের ট্যাক্সি-মালিক মিঃ চাপেকার।

ডরচেস্টার হোটেলে সুভাষচন্দ্র শ্রীযুক্ত পি. বি. শীলের আতিথ্য নিলেন। ঘর ঠাসা সাংবাদিক; 'কার্যতঃ লণ্ডনের এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য স্থানের প্রায় সকল সংবাদপত্রের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক

সংবাদদাতারা উপস্থিত: কন্টিনেন্ট ও আমেরিকান সংবাদপত্রের প্রতিনিধিও যথোপযুক্ত সংখ্যায়: ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের একজন প্রতিনিধিও উপস্থিত নয়?" লর্ড কিনোউলের নেতৃত্বে সাংবাদিকরা সমবেত। বহু-আলোচিত ও সমালোচিত ব্যক্তিটিকে দেখবার ও তাঁর কথা শুনবার জন্য তাঁরা অধীর। "দীর্ঘাকার, সুদর্শন, মর্যাদা-গভীর মানুষটির উপরে তাঁরা প্রশ্ন বর্ষণ করে চললেন অজস্রধারে। তিনি শান্তভাবে, দক্ষতার সঙ্গে, প্রসন্ন হাসির মেজাজে উত্তর দিতে লাগলেন।" ভারতে সদ্য-প্রবর্তিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা সম্বন্ধেই বেশী প্রশ্ন করা হ'ল। কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ঔচিত্য সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত মনোভাব যাই হোক না কেন, 'বেসরকারী রাষ্ট্রদূত' হিসাবে বাইরের মানুষের কাছে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির কৃতিত্বের কথাই বললেন। একটা কথা নিতান্ত পরিষ্কার করে তুললেন—প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে অংশ নেওয়া মানে প্রস্তাবিত ফেডারেশন পরিকল্পনাকে মেনে নেওয়া নয়। কংগ্রেস ফেডারেশন পরিকল্পনার সঙ্গে দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়বে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র যেখানে বিপন্ন সেখানে কংগ্রেসের মনোভাব কী, স্পষ্ট ভাষায় সুভাষচন্দ্র খুলে বললেন। সুভাষচন্দ্র জানালেন—"সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য যারা সংগ্রাম করছে, আমাদের সর্বাঙ্গীণ সহানুভূতি তাদের জন্য, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে।" উপক্রুত চীন ও স্পেনের জন্য কংগ্রেসের মমত্বের কথা জানিয়ে বললেন, জাপানের নিন্দা কংগ্রেস করেছে। চীন ও স্পেনের জন্য ইংলণ্ড-প্রবাসী ভারতীয়রা যা করেছে, তাতে গভীর সন্তোষ জানালেন।

* * *

১১ই জানুয়ারী অপরাহ্নে প্যাংক্রাশ টাউন হল্-এ ভারতীয়দের পক্ষ থেকে সুভাষচন্দ্রকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হ'ল। বৃটিশ কমিউনিষ্ট নেতা রজনী পাম দত্ত সভাপতিত্ব করেন।

বিপুল সংবর্ধনায় সুভাষচন্দ্র অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। বহুভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবার পরে বললেন :

"এই যে এত ভালবাসা আপনারা আমাকে জানালেন, অবশ্যই তা জনজীবনে আমার ভূমিকার জন্য। হ্যাঁ, আমার সে জীবন ঝঞ্ঝাময়, কিন্তু তার মধ্যে প্রচুর রোমান্সও রয়েছে। এখানে আমার চেয়ে অল্পবয়সী যারা উপস্থিত রয়েছে, তোমাদের আমি আশ্বাস দিয়ে বলতে পারি, বিদেশী শাসনের অন্ধকার দিক আছে সত্য, কিন্তু যে-সব তরুণ-তরুণী দুঃসাহসের জীবন চায় তারা অ্যাডভেঞ্চারের রোমান্স এই শাসনে যথেষ্টই পাবে। আরও আশ্বাস দিতে পারি, শুধু প্রভূত রোমান্সই পাবে না, সেইসঙ্গে প্রচুর স্নেহ-ভালবাসাও পাবে—বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা যত পীড়ন করবে, তোমার দেশবাসী তত ভালবাসাই তোমাকে ফিরিয়ে দেবে।"

"সকল দিক দেখে মনে হয়, ভারতকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আর একটি ভয়ঙ্কর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। কংগ্রেস তার জন্য প্রস্তুত।"

কংগ্রেস নিশ্চয় প্রস্তুত। তবু—

"যদি পরবর্তী আন্দোলন ব্যর্থ হয়, ভারতের জনগণের ভিতর থেকে নবীন ও উত্তম নেতৃত্ব আসবে।"

* * *

সুভাষচন্দ্র বসু কিছুই গোপন করতে ভালবাসেন না। মেরুদণ্ড খাড়া রেখেই তিনি চলতেন, সেই তাঁর ভবিতব্য। সুতরাং পরদিন ১১ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে ক্যাক্সটন হাউসে ইণ্ডিয়া লীগের পার্লামেণ্টারী কমিটির সদস্যদের সম্মুখীন হয়ে সরাসরি বললেন :

"যে মুহূর্তে ভারতে ফেডারেশন পরিকল্পনা চালু করা হবে, তখনি চরম সঙ্কট ঘনাবে। কংগ্রেস ফেডারেশনের প্রতিরোধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

সভায় উপস্থিত ছিলেন বহু বিখ্যাত ভারত-বন্ধু ইংরেজ ; যথা,

স্যার জন মেনার্ড, লর্ড ক্যারিংডন, মিঃ রেজিনাল্ড সোরেনসেন, এম. পি, মিঃ হেনরি পোলক, মিঃ বেন ব্রাডলি, মিঃ রোনাল্ড কিড, মিঃ রেজিনাল্ড ব্রিজম্যান ইত্যাদি।

এইদিন সকালেই "মেজর এটলি, লর্ড স্নেল এবং আর্ল অব কিনোউলের সঙ্গে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর দীর্ঘ একান্ত আলোচনা হয়েছে।"

সকালের ঐ আলোচনা সত্ত্বেও (কিংবা ঐ আলোচনার জন্যই) অপরাহ্ণের আলোচ্য সভায় সুভষচন্দ্রের বলতে বাধল না :

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসে কোনো ব্রিটিশ রাজনৈতিক দলের সাহায্য পাওয়া যাবে, এহেন চিন্তার দিন একেবারেই গেছে। সংগ্রাম আমাদেরই—সে সংগ্রামের সম্মুখীন আমরাই হব। ইংরেজ শ্রমিক দলের কার্যকলাপ দেখে ভারতীয় জনগণের সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ হয়েছে। ব্রিটেনে যাঁরা সমাজতন্ত্রের কথা বিশ্বাস করেন, তাঁদের মনে রাখতে হবে, ভারত স্বাধীন না হলে ব্রিটেন কদাপি সমাজতন্ত্রী দেশ হবে না।"

* * *

প্রত্যাশিত সংবাদটি এসে গেল ১৪ই জানুয়ারী—সুভাষচন্দ্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ঐদিন কনওয়ে হল্-এ ইণ্ডিয়া লীগ আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় সংবাদটি ঘোষিত হলে সভাগৃহ হর্ষে উদ্দীপনায় ফেটে পড়ল। সভাগৃহ পরিপূর্ণ; এ সভা ইংল্যাণ্ডে সুভাষচন্দ্রের এতাবৎ সর্ববৃহৎ জনসভা। সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রবীণ শ্রমিক নেতা মিঃ জর্জ লনসবেরী। শ্রমিক দল ও উদারনৈতিক দলের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অভিনন্দন জানিয়ে যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মিঃ আর্থার গ্রীনউড, এম. পি., লর্ড লিস্টোয়েল, মিঃ লরেন্স হলম্যান, মিঃ বেসিল ম্যাথুস, মিঃ আর্নেস্ট থর্টল প্রভৃতি।

সভাপতি জর্জ লনসবেরী তাঁর ভাষণে কিছু স্পষ্টোক্তি করেন :

"যাঁরা মনে করেন মিঃ বসু ভারতীয় জনগণের আস্থাভাজন নন,

কিংবা তাঁকে অতীব ভয়ঙ্কর মানুষ মনে করেন, কংগ্রেস সভাপতি পদে তাঁর এই নির্বাচন তাঁদের প্রতি যোগ্য উত্তর। আশা করা যায় মিঃ বসুর সভাপতিত্বকালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পথে দৃঢ়তর পদক্ষেপ করবে।"

নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ বক্তৃতা। ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে এহেন জোরালো ধারালো সমর্থন ইংলণ্ডের দায়িত্বশীল মহলে অল্পই দেখা গেছে। নিঃসন্দেহে সুভাষচন্দ্রের সংবর্ধনা সভায় উপযুক্ত ভাষণ। ভারতবর্ষকে যে লড়ে স্বাধীনতা নিতে হবে, ব্রিটিশ শ্রমিক দলের কাছ থেকে প্রকাশ্য সভায় সুভাষচন্দ্র তা শুনলেন। দীর্ঘ, সুদীর্ঘ হবে সংগ্রাম—তাও জানালেন। এঁর কাছ থেকে সুভাষচন্দ্র যে প্রকাশ্য প্রশংসা লাভ করলেন, বিশিষ্ট কোনো ইংরেজ রাজনীতিক ঐ ভাষায় তাঁর প্রশংসা করেছেন কি না সন্দেহ। মনে রাখতে হবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী অথচ ভারতের পরাধীনতায় বস্তুগতভাবে লাভবান ইংরেজ শ্রমিক দলের কঠোর সমালোচক ছিলেন সুভাষচন্দ্র। ক্যাক্সটন হাউসের সমাবেশের ঠিক দু'দিন আগে তিনি সেকথা বলেছেন।

উত্তর দিতে উঠে সুভাষচন্দ্র তাঁর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত প্রশংসা-বাক্যাদির জন্য ধন্যবাদ জানান। সেই সঙ্গে নির্দয় সরলতার সঙ্গে বলেন,—শ্রমিক দল ভারতকে বাস্তবিক কোনো সাহায্য করবে, এ সম্বন্ধে ভারতীয় জনগণের সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ হয়েছে। তবে তিনি বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় বিশ্বাসী। ভারত বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতে পারবে না।

১৫ই জানুয়ারী শুক্রবার রাত্রে ভারতীয় স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, সিলোন স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, লণ্ডন মজলিশ, ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান স্টুডেন্টস সোসাইটিজ ইন গ্রেট ব্রিটেন অ্যাণ্ড আয়ারল্যাণ্ড—এই সকল সমিতি মিলিত হয়ে সুভাষচন্দ্রকে ১১২, গাওয়ার ষ্ট্রীট, লণ্ডনে অভ্যর্থনা জনায়।

ছাত্রদের সভা বলে সুভাষচন্দ্র অনেকখানি অন্তরঙ্গ সুরে, ব্যক্তিগত ভঙ্গিতে কথা বলেছিলেন। ভাবী লেখকদের জেলে যেতে উৎসাহ

দিয়ে বলেছিলেন : তোমাদের মধ্যে যারা লেখক, গ্রন্থকার বা কবি হতে চাও, তারা কারাজীবনকে শিল্পের উপাদান বিবেচনা করে আমার মত জেলে যাবার চেষ্টা করো।

স্বাধীনতার রূপ কী, সেই স্বাধীনতার শত্রু কে, কিভাবে তাদের সঙ্গে লড়াই চালাতে হবে সে সম্পর্কে এই আপসহীন যোদ্ধা বললেন :

"এ-দেশে তোমরা যারা রয়েছ, তোমাদের ভাবতে হবে দেশের মানুষকে কিভাবে মুক্তি দিতে পারো। সর্ববিষয়ে তাদের মুক্তি দিতে হবে—রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গে দিতে হবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তার অর্থ যদি হয় জমিদার, পুঁজিপতি, অভিজাত শ্রেণী বা তথাকথিত উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তার জন্য তৈরী থেকো।

ভারতীয় জমিদার ও পুঁজিপতিদের সঙ্গে বোঝাপড়ার ফলেই ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্রই সাম্রাজ্যবাদ তার বন্ধু পায় জমিদার ও পুঁজিপতিদের মধ্যে থেকে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের ঐসব স্থানীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে জোটবদ্ধ করা।"

নিছক স্বাধীনতা-সংগ্রামীরূপে যাঁরা সুভাষচন্দ্রকে দেখতে বা দেখাতে চান, তাঁদের কাছে সুভাষচন্দ্রের ঐ রূপ অপরিচিত ও অনাবশ্যক সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানেই আমরা আসল সুভাষচন্দ্রকে পাব।

শুধু ভারতীয় ছাত্ররাই নয়, ইংরেজ ছাত্ররাও তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। ১৪ই জানুয়ারী সংবর্ধিত হয়েছিলেন লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকসের পক্ষ থেকে। সভাপতিত্ব করেছিলেন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক টনী। তারপরে ইউনিভার্সিটি লেবার ফেডারেশনের ভবনে অন্য অনেক শিক্ষাবিদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

"রবিবার সারাদিন তিনি কেম্‌ব্রিজে কাটালেন। তাঁর সেই পুরাতন শিক্ষা-নিকেতনের ছাত্ররা তাঁর জন্য অনেক কিছু কাজকর্মের বরাদ্দ করে রেখেছে। অকস্‌ফোর্ডও সম্ভবতঃ একই ধরনের সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানাবে।"

প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের সঙ্গেও সুভাষচন্দ্র মিলিত হলেন। "সোসিয়ালিস্ট লীগের অগ্রজ সদস্য মিঃ হোরাবিন মিঃ বসুর সম্মানে এক বিশেষ অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় মিঃ বসু বিখ্যাত বামপন্থী লেখক ও মনস্বী ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হন। উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন স্ট্র্যাচী, গোলানৎস রিকওয়ার্ড, মরিস, ব্রাউন এবং মিসেস নাওমিচিশন। আমি আরও শুনেছি যে, মেজর এটলী সুভাষচন্দ্র বসুর কথাবার্তায় এমনই আকৃষ্ট হয়েছেন যে, তিনি আরও সাক্ষাৎকার কামনা করেছেন।"—সাংবাদিক লিখলেন।

সে সাক্ষাৎকারের সুযোগ মেজর এটলী পেয়েছিলেন। শ্রমিক দলের সম্পাদক মিঃ মিডলটনের আমন্ত্রণে মধ্যাহ্নভোজে সুভাষচন্দ্র শ্রমিক দলের রাজনৈতিক ও শিল্প-সংশ্লিষ্ট যেসব নেতার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ অলুইন, মেজর এটলী, মিঃ গ্রীনউড, মিঃ আর্নেস্ট বেভিন, মিসেস গুলড সুশাল লরেন্স।

এই ঘরোয়া সভায় সুভাষচন্দ্র সরাসরি প্রশ্ন করে বসেন, শ্রমিক দলের কার্যসূচীর মধ্যে ভারত-প্রসঙ্গ নেই কেন? তাঁর এই ধরনের খোলা কথাকে তখনকার মত খোলা মনেই শ্রমিক নেতারা গ্রহণ করেন।

এই ঘরোয়া সভায় সুভাষচন্দ্র নাকি শ্রমিক নেতাদের মনে উত্তম ধারণা সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছিলেন। আসলে মনে হয় শ্রমিক নেতারা বুঝেছিলেন, সুভাষচন্দ্র কী পদার্থ।

* * *

বারট্রাণ্ড রাসেলের লেখার বিশেষ ভক্ত সুভাষচন্দ্র রাসেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে পারেননি। "লণ্ডনের সংবাদ-সূত্রে প্রকাশ মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু আর একটি শেষ রাত্রির আলোচনায় বসেছিলেন, সে আলোচনা মিঃ রাসেলের সঙ্গে। মিঃ বসু কেমব্রিজ থেকে শেষ রাত্রির আগে ফেরেননি।"

হ্যারল্ড ল্যাস্কি ও স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গের কথালাপ বাদ যেতে

পারে না। কৃষ্ণ মেননকে সঙ্গে নিয়ে ওঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন। অধ্যাপক হলডেন এবং ডাঃ আইভবের সঙ্গেও কথাবার্তা হ'ল ১৮ই জানুয়ারী রাত্রে।

* * *

সুভাষচন্দ্র লণ্ডনে পৌঁছেছিলেন ১০ই জানুয়ারী অপরাহ্নে; লণ্ডনের ক্রয়ডন বিমানবন্দর থেকে বিমানে ভারতযাত্রা করেন ১৯শে জানুয়ারী সকাল সাড়ে আটটায়।

সাংবাদিক লিখেছেন: "ভারতের এই অতিথি সারাক্ষণই ব্যস্ত। জনসভায় বক্তৃতা, সাক্ষাৎকার, একান্ত আলোচনা, ছাত্রদের নির্দেশদান —সব কিছু তার মধ্যে আছে। ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র বহুসংখ্যক ইংরেজ রাজনীতিক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, বামপন্থী লেখক ও বুদ্ধিজীবী, এবং কমিউনিস্ট দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। দিনে গড়ে তিনটি করে সভায় বক্তৃতা করেছেন।

"তিনি যে খাটো কোনো মানুষ নন তা স্পষ্টই বোঝা গেল যখন দেখা গেল, মিঃ এটলীর স্তরের ব্রিটিশ রাজনীতিক, মিঃ আর্নেস্ট বেভিনের স্তরের ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের স্তরের ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক, এবং মিঃ হ্যারি পলিটের স্তরের ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা তাঁর সঙ্গে ভারতীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন ও তা থেকে ব্রিটিশ জনগণের পক্ষে দরকারী তথ্য সংগ্রহ করেছেন।"

এই তালিকায় দু'জনের নাম নেই, পরবর্তীকালে স্বয়ং সুভাষচন্দ্র যাঁদের নাম করেছেন। তাঁরা হলেন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার লর্ড হ্যালিফ্যাকস ও লর্ড জেটল্যাণ্ড। সেই সঙ্গে লর্ড অ্যালেন। হয়ত এঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ খুবই গোপনে হয়েছিল, তাই সংবাদপত্রে ওঠেনি।

সুভাষচন্দ্র এই দিনগুলিতে কর্মব্যস্ত ছিলেন।

* * *

ভারতীয় রাজনীতিকরা যখন শত্রুপক্ষের সহৃদয়তায় ও সহায়তায়

অভিভূত হন, তখনই আমরা আতঙ্ক বোধ করি। ভয় হয়, এই বুঝি তাঁরা নিজের প্রাপ্তি ও দেশের প্রাপ্তিকে এক করে ফেললেন। ব্যক্তি-গতভাবে তাঁরা যতখানি পান, সমষ্টি স্বার্থ থেকে দিয়ে আসেন অনেক বেশী। শান্তিবাদী ইংরেজ ও গুপ্তচর ইংরেজের দ্বারা পরিবৃত থেকে গোল-টেবিল বৈঠকের সময়ে গান্ধীজী যে রাজনৈতিক বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের সমালোচনার কথা এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে। বিপরীত দৃষ্টান্ত হিসাবে সুভাষচন্দ্র অনুরূপ ক্ষেত্রে আইরিশদের আচরণের উল্লেখ করেছিলেন। ইংরেজ উদারনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিকেরা জহরলালকে কিভাবে গ্রাস করে ফেলেছিলেন, সেকথাও সুভাষচন্দ্রের রচনা মারফৎ আগে দেখেছি। সেই সকল উদারচরিত, কিন্তু জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন ইংরেজরাই তো লণ্ডনে সুভাষচন্দ্রকে ঘিরে ধরেছিলেন, প্রশংসাও করেছিলেন, এবং লণ্ডনের সুমধুর স্মৃতির কথাও সুভাষচন্দ্র বলেছেন। সাফল্যের হাসি তাঁর মুখে ও মনে। সুভাষচন্দ্র কিন্তু নমনীয় হননি, যিনি উচ্চাঙ্গের গর্ব করে বলেছেন মেরুদণ্ড তাঁর সোজা আছে, থাকবে।

লণ্ডনে বহু আতিথ্যে ও সংবর্ধনায় রসায়িত সুভাষচন্দ্র ইংরেজদের জাতশত্রু ডি ভ্যালোরার সঙ্গে গোপন আলোচনা করেছিলেন এরই মধ্যে এক মধ্যরাত্রে। কী আলোচনা হয়েছিল, তা জানতে ইংরেজ সাংবাদিকদের মনে কৌতূহলের অবধি ছিল না ; এত আলো ও ম লার মধ্যেও লোকটি তাঁর সঙ্গে কথা বলে এল, ইংরেজকে ইংরেজের অস্ত্র যে ফিরিয়ে দিয়েছে—অনেকের কাঁটার মত বিঁধেছিল ব্যাপারটা। মনে হয়েছিল, সহাস্য সুন্দর মর্যাদাধারী লোকটি আসলে সত্যই ভয়ঙ্কর।

* * *

সুভাষচন্দ্র যখন লণ্ডন থেকে ভারতগামী বিমানে উঠলেন, তখন পিছনে কয়েক সহস্র করতালি, সামনে বহু কোটি বাহুর আহ্বান। সুভাষচন্দ্র কী করবেন, কী করতে পারেন, ভারতবর্ষের পরবর্তী ইতিহাস সেই বার্তাকে ধারণ করবার জন্য অপেক্ষা করে রইল।

"যাও বীর, যুদ্ধ কর।"

নেতাজীকে বলেছিলেন দেশবন্ধু।

তখন তিনি নেতাজী নন,—তখনও তিনি সুভাষচন্দ্র।

যুবক সুভাষ—যৌবনের প্রাণশক্তিতে ভরপুর।

সেদিন থেকে শুরু হ'ল যুদ্ধ—অক্লান্ত নিরলস যুদ্ধ—। শৃঙ্খলিতা বন্দিনী দেশ-জননীর মুক্তির জন্য মরণপণ যুদ্ধ। শোষক এবং শাসক ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামলেন সুভাষচন্দ্র। দেশের মুক্তিযুদ্ধের পুরোধা হলেন সুভাষচন্দ্র। দেশবাসী সাদরে তাঁর নতুন নামকরণ করল—"দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র।"

দেশের মধ্যে থেকে দেশজননীর মুক্তির জন্য অনলস যুদ্ধ করে চললেন দেশবন্ধুর মন্ত্রশিষ্য দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র।

তারপর এল সেই শুভদিন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়—। গৃহে অন্তরীণ সুভাষচন্দ্র ইংরাজের সতর্ক প্রহরাকে ফাঁকি দিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। দেশবাসীর কাছ থেকে যতটা সহযোগিতা আশা করেছিলেন তিনি— ততটা পেলেন না,—উপরন্তু তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁর দেশমুক্তির পরিকল্পনায় বার বার বাধা দিতে লাগল।

পূর্ব আর পশ্চিম গোলার্ধে তখন দ্বিতীয় মহাসমরের ঘনঘটা। ইংরাজ এখন ঘর সামলাতে ব্যস্ত,—এই উপযুক্ত মুহূর্ত ইংরাজের উপর আঘাত হানার। তাই ১৯৪১ সালের ১৩ই জানুয়ারী শুরু হ'ল তাঁর দেশ-মুক্তি ব্রতের দুরূহ দুর্গম পথের অভিযান। কলকাতা ছাড়লেন তিনি সবার অলক্ষ্যে। প্রথমে পেশোয়ারে, সেখান থেকে হাঁটা পথে কাবুল। কাবুল পৌঁছে সাহায্যের আশায় তিনি যোগাযোগ করেন রুশ-সরকারের সঙ্গে। কিন্তু রুশ-জার্মান চুক্তি তখন ভাঙ্গনের

মুখে,—তাই রাশিয়া সাহস পেল না সুভাষচন্দ্রকে সাহায্য করে ইংরাজদের চটাতে। অবশেষে তিনি বহু কষ্টে এলেন বার্লিনে। সেখানে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর উইরোপীয় কমাণ্ড তৈরী করেন। অবশেষে স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম চির অশান্ত নায়ক জাপান-প্রবাসী রাসবিহারী বসুর চেষ্টায় এলেন সিঙ্গাপুরে। সেখানে গড়ে তুললেন স্বাধীন ভারতের জাতীয় বাহিনী —এবং সে বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হলেন সুভাষচন্দ্র, দেশ-গৌরব সুভাষচন্দ্র নতুন নামে অভিহিত হলেন 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র।'

"যাও বীর, যুদ্ধ কর"—

গুরুর আদেশ এবার অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালনের সুযোগ পেলেন নেতাজী।

আজাদী বাহিনীকে ডেকে তিনি বললেন—

"তোমরা আমায় রক্ত দাও—আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।"

উদ্বেল হয়ে উঠল আজাদী বাহিনীর সেনারা,—আকুল হয়ে উঠল প্রবাসী ভারতবাসীর দল—। আমরা রক্ত দেব নেতাজী,—পরিবর্তে তুমি আমাদের দীনা ভারত-জননীর শৃঙ্খল মুক্ত করে দাও। হাজার হাজার প্রাণ জেগে উঠল নেতাজীর সে আহ্বানে।

"পড়ি গেল কাড়াকাড়ি—
আগে কেবা প্রাণ
করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি—।"

সমুদ্রের ওপারে ১৯৪৩-এর ২রা জুন তিনি তাঁর আজাদী বাহিনীকে ডেকে বলেছেন :

"বন্ধুগণ, সৈনিকগণ, যাত্রিগণ, আজ একমাত্র সময় নিনাদ গগন বিকম্পিত করে ধ্বনিত হোক—দিল্লী চলো,—দিল্লীর লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা ওড়াও আর সেখানে সাম্রাজ্যবাদের সমাধিক্ষেত্র রচনা কর।"

এই আমাদের মৃত্যুপণ। আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। Battle for freedom! It does not matter who among us will live to see India free. It is enough that India shall be free and that we shall give our all to make her free. 'ভারতকে স্বাধীন কবার জন্য আমরা সর্বস্ব উৎসর্গ করব।"

*

সাগরের ওপার থেকে বেতারে ভেসে আসে নেতাজীর সেই উন্মাদনা ভরা কণ্ঠ। ইংরাজের অপপ্রচারে সমর্থন জানিয়ে তবু আমাদের দেশেরই একদল বলে চলে—"নেতাজী বিশ্বাসঘাতক, নেতাজী স্বার্থান্বেষী", সেই অপপ্রচারের ঢেউ গিয়ে বুঝি আঘাত করে সাগরের অপর তটে। বেতারে ভেসে ওঠে নেতাজীর কণ্ঠ। মহাত্মা গান্ধীকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন:

"আমি জানি এবং আমার কানেও আসে যে আমার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা ও কুৎসিত প্রচারকার্য চালানো হচ্ছে আমারই দেশে আমাকে বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন করার জন্য। কিন্তু এও আমি জানি, আমার দেশবাসী,—যাঁরা আমাকে বেশ ভাল করেই চেনেন,—তাঁদের মনকে কেউই আমার বিরুদ্ধে বিষিয়ে দিতে পারবে না।"

১৯৪৩ সালের ৫ই জুলাই নেতাজীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় তার জবাব। মুক্তি-বাহিনীকে সেদিন বললেন তিনি:

"জাপান ভারতের স্বাধীনতা আনিতে পারে এ বিশ্বাস আমার নাই। ভারতীয় বাহিনীই ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা আনয়ন করিবে। জাপানীদের সেখানে স্থান নাই সেখানে তাহাদিগকে আমরা ঘেঁষিতেই দিব না। যদি তাহারা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের জন্মভূমিতে প্রবেশ করে—আমরা জানিব—তাহারা আমাদের শত্রু, আর শত্রুর ন্যায়ই তাহাদের সহিত ব্যবহার করিব।"

নেতাজীর বিরুদ্ধবাদীদের কণ্ঠ কিছুটা দমে যায় বটে—তবু

একেবারে শান্ত হয় না। তারা বলে—"দেশে থেকে কি ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা চলতো না? বিদেশী শক্তির সাহায্যে দেশ স্বাধীন করার কি প্রয়োজন ছিল?"

১৯৪৩ সালের ৯ই জুলাই বেতারে আবার শোনা যায় নেতাজীর কণ্ঠ—

"একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে—বাহিরের সাহায্য গ্রহণ করা সঙ্গত কি না? যদি শক্তিশালী বৃটেনই আমেরিকা ও অন্যান্য শক্তিশালী জাতির সাহায্য গ্রহণে বিরত বা কুণ্ঠিত না হয়, তবে দেশের স্বাধীনতার জন্য আমাদেরই বা অপরাপর জাতির সাহায্য গ্রহণে কি বাধা বা দোষ থাকিতে পারে? আমাদের জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থার সুযোগ গ্রহণে আমরা কেন বিরত থাকিব?"

অকাট্য যুক্তি,—কাজেই আমাদের দেশের বিরুদ্ধবাদীরা এবার সুর পাল্টালেন। তাঁরা বললেন—"আজাদী বাহিনীর ঐ কয়েক হাজার লোক দিয়ে ইংরাজের বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করা কি কখনও সম্ভব?"

আবার শুনি নেতাজীর প্রাণমাতানো কণ্ঠস্বর—

বেতারে বলেন তিনি:

"ভারতের বহিঃস্থ আমাদের এই ত্রিশ লক্ষ সৈন্যই কি স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ হইবে—এ কথাও কেহ কেহ ভাবিয়া থাকেন। আমার জবাব—হ্যাঁ—হইবে। আরব স্বাধীনতা অর্জন করে মাত্র পাঁচ হাজার সিন ফিন স্বেচ্ছাসেবকের আপ্রাণ চেষ্টায়। প্রতাপ সিংহ স্বাধীনতা অর্জন করেন অত্যল্প সংখ্যক ভীল সৈন্য লইয়া। শিবাজীও স্বরাজ্য লাভ করেন অত্যল্প মাওয়লী সৈন্য লইয়া। আর আমাদের ত্রিশ লক্ষ দৃঢ়সঙ্কল্প সৈন্যদল পারিবে না হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে?"

অবশেষে বিরুদ্ধবাদীরা প্রচার করতে লাগল—

"দেশকে স্বাধীন করে নিজে তার ডিক্টেটর হয়ে বসার মতলবেই সব কিছু করছে সুভাষচন্দ্র,—নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না সে—।"

১৯৪৪ সালের ৬ই জুলাই পূর্ব এশিয়া থেকে ভেসে আসে আবার নেতাজীর কণ্ঠ—

"ভারত স্বাধীন হবার সাথে সাথেই আজাদ হিন্দ সরকারের কাজ শেষ হয়ে যাবে। It will be then for the Indian people themselves to determine the form of Government that they choose and also to decide as to who should take charge of the Government. I can assure you, Mahatmaji, that I and all those who are working with me regard themselves as the servants of the Indian people".

তবু সেদিন দেশের মধ্যে আমাদেরই একদল তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যায়। এর মধ্যেই দেশে দেখা দেয় ইংরাজ-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। দলে দলে মানুষ দেশের মাটিতে প্রাণ দিতে বাধ্য হয় অনাহারে। আর তাদের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে চড়া দামে বিক্রী করে কালোবাজার থেকে মুঠো মুঠো টাকা লুটতে থাকে আমাদেরই একদল বিবেকহীন ব্যবসায়ী।

দেশের অভ্যন্তরে যখন চলেছে এই মরণ আর মারণ যজ্ঞ—ঠিক সেই সময়ে পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতবাসীদের কাছে নেতাজী তুলে ধরেছেন তাঁর ভিক্ষার ঝুলি—"সোনা চাই—টাকা চাই,—ভারতের মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনে চাই সকলের অকৃপণ সাহায্য—।"

কি হবে এ সাহায্য দিয়ে ?

জাপানীদের কুক্ষিগত থাকবেন না নেতাজী। তাদের কাছে সাহায্যের বিনিময়ে দাসখৎ লিখে দিতে রাজী নন তিনি। যুদ্ধ করতে চাই অস্ত্র। সে অস্ত্র দান হিসাবে জাপানের কাছ থেকে নিতে রাজী নন নেতাজী। টাকা দিয়ে অস্ত্র কিনে নেবেন তিনি জাপানীদের কাছ থেকে। তাই রেঙ্গুনে প্রতিষ্ঠিত হ'ল "জাতীয় ব্যাঙ্ক"।

টাকা চাই—টাকা চাই, অনেক অনেক টাকা। এগিয়ে এলেন আবদুল গনি সাহেব,—৬৩ লক্ষ টাকা দিলেন তিনি একাই। এগিয়ে এলো আরও অনেকে—সাধ্যাতীত দানে ভরিয়ে তুলল তারা নেতাজীর ঝুলি।

"আমার কাছ থেকে কিছু নেবে না বাবা?" এক বৃদ্ধা ভিখারিনী এলো এগিয়ে।

নেতাজী সাগ্রহে হাত পাতলেন তার সামনে। সারা জীবনের সঞ্চয় ভিখারিনী তুলে দিল নেতাজীর হাতে—দু'টাকা বারো আনা।

নেতাজীর চোখে জল।

ভিক্ষা করতে না পারলে কাল খাওয়া জুটবে না ভিখারিনীর,—তবু শেষ সম্বলটুকু নেতাজীকে দিতে পেরে বৃদ্ধা যেন আজ সার্থক হয়ে উঠেছে।

এত ভালবাসে এরা দেশকে—অথচ নিজের দেশে এরা পরাধীন!

নেতাজীর চোখে জল।

কিন্তু যোদ্ধার চোখে জল আসতে নেই যে!

তিনি যে ভুলতে পারেন না গুরুর নির্দেশ—"যাও বীর, যুদ্ধ কর।"

ভুলতে পারেন না—১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবরের সেই দীপ্ত ঘোষণার কথা—

'ভগবানের নামে আমি সুভাষচন্দ্র বসু এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করিতেছি যে,—ভারতবর্ষকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে ও ৩৮ কোটী নর-নারীর দাসত্ব মোচন করিতে, দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত, একেবারে প্রাণবায়ু বহির্গত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত—আমি স্বাধীনতার সংগ্রাম হইতে বিরত হইব না।"

তাই মুছে ফেলেন তিনি চোখের জল।

অশ্রুবিলাস যোদ্ধার জন্য নয়—।

"মৃত্যু দোরে দিবে হানা—
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা—

এই তোর নব বৎসরের আশীর্বাদ।
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।"

১৯৪৩ সালের ২৫শে আগস্ট তাই নেতাজী কম্বুকণ্ঠে তাঁর বাহিনীকে ডেকে বললেন—

"Hark, India is calling···Blood is calling to Blood. Rise, we have no time to loose. Take up your arms ···we shall make our way through the enemy's rank or if God wills, we shall die martyr's death. And in our last step we shall kiss the road that will bring our Army to Delhi. The road to Delhi, the road to Freedom. আর দেরি নয়,—অস্ত্র নিয়ে শত্রু-সৈন্যের মধ্য দিয়ে পথ করে এগিয়ে চলো দিল্লীর পথে! মৃত্যু যদি বরণ করতেই হয় তাহলে মরব আমরা দেশের মাটিকে চুম্বন করে। চলো দিল্লী—"

তারপর শুরু হ'ল অভিযান,—দিল্লীর পথে অভিযান, -স্বাধীনতার পথে অভিযান। শুরু হ'ল যুদ্ধ।

১৯৪৪ সালের ১৮ই মার্চ নেতাজীর বাহিনী ব্রহ্ম সীমান্ত পার হয়ে পবিত্র ভারতভূমিতে প্রবেশ করল। টামু পার হয়ে মণিপুরের অধিত্যকায় এসে পৌঁছল তারা।

কণ্ঠে তাদের তূর্য নিনাদ—

'চলো-চলো,—দিল্লী চলো"—

"দেশ হামারা হিন্দুস্থান"—

"বন্দে মাতরম্—"

"জয় হিন্দ্"।

আজাদ বাহিনী আক্রমণ করল কোহিমা,—ইম্ফল।

ইংরাজ বাহিনী বাধ্য হ'ল পিছু হট্‌তে।

আর "কদম কদম বাঢ়ায়ে যা" গেয়ে দিল্লীর পথে এগিয়ে চলে কদমে কদমে নেতাজীর বাহিনী।

কিন্তু, তবু শেষ রক্ষা হ'ল না।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আর উপযুক্ত অস্ত্রের অভাবে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'ল এত উন্মাদনা,—এত প্রচেষ্টা।

তাই হোক—

তবু যুদ্ধ করে গেছেন নেতাজী। জড় ভারতবাসীকে সোনার কাঠির স্পর্শে নব-চেতনা দিয়ে গেছেন তিনি। তাঁর পরিকল্পনা মত যদি ভারত স্বাধীন হ'ত তাহলে কি হ'ত সে ভারতবর্ষের রূপ ?

নেতাজী বলেছেন :

To fight and win India's liberty, and then build up in India, with full freedom to determine her own future—with no interference!

Free India will have a social order based on the eternal principles of Justice, Equality and Fraternity.

—স্বাধীন ভারতের সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠবে স্থায়, সাম্য আর সখ্যতার ভিত্তিতে।

ভারত আজ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু সামাজিক বৈষম্য কি দূর করতে পেরেছে ? গড়ে উঠেছে কি আমাদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সখ্য আর সাম্যের ভিত্তিতে ?—না। নেতাজী যে আদর্শ ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠার জন্য অনলস যুদ্ধ করে গেলেন—সেই আদর্শই আজ দেশবাসীকে ডাক দিয়ে বলছে—

'যাও বীর, যুদ্ধ কর।"

মহাযুদ্ধের মধ্যলগ্ন। বাসুকীর নিশ্বাস লেগেছে প্রত্যেকের গায়ে। হিংসা, অবিশ্বাস, ঘৃণা ও দ্বেষ মানবিকতাকে হত্যা করতে উদ্যত। পৃথিবী জুড়ে সেই হাহাশ্বাসের মধ্যেই অনেকে শুনতে পেলেন মুক্তির আহ্বান, নির্যাতিতরা দেখতে পেলেন নতুন আলো।···

জার্মানী ঝাঁপিয়ে পড়েছে রাশিয়ার উপর। রূপসী সাইবেরিয়ার হাতছানিতে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছেন ফুরার এদ্লভ হিটলার। ইউরোপের মানচিত্রটাকে খামচে ধরে পৈশাচিক দাপাদাপি শুরু হয়েছে তাঁর, বোনাপার্টের সদম্ভ উক্তিই যেন বেরিয়ে এলো তাঁর মুখ থেকে : Moscow, a half-way mile from India.

মস্কো আর ভারত থেকে কতদূর ?

আর ঠিক সেই সময়ই একদিন বিশ্বকে সচকিত ক'রে বার্লিন বেতারে ধ্বনিত হলো এক ভারতীয় নেতার দৃপ্ত কণ্ঠস্বর : আমি সুভাষ, বার্লিন থেকে বলছি। ভারতবর্ষকে মুক্ত করবাব জন্য চলেছে আমার প্রস্তুতি।···বিগত ছু-শ' বৎসরের বৈদেশিক ইতিহাস আমি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছি,—বিশেষ করে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস আমাকে বেশী আকর্ষণ করেছে। কিন্তু কোথাও বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া কোন দেশের মুক্তি অর্জনের ইতিহাস আমি দেখিনি। আর ব্রিটেন শুধু যে স্বাধীন জাতির সাহায্যে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে তা নয়, ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশের উপরও রয়েছে তার একান্ত নির্ভরতা। যদি ব্রিটেনের সাহায্য-ভিক্ষায় কোন দোষ না থাকে, তবে অন্য কোন শক্তির সাহায্য গ্রহণে আমাদেরও কোন দোষ থাকতে পারে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের

বিরুদ্ধে যে কোন বৈদেশিক শক্তির সাহায্যই আমরা সাদরে বরণ করে নেব।*

বার্লিন-বেতারে যাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, সত্যই কি তিনি সেই বাংলার দুলাল সুভাষ? সুভাষ বলছেন বার্লিন থেকে! কী আশ্চর্য! ভাবতে গেলে দেহের প্রতিটি ইন্দ্রিয় চনমন করে ওঠে।

নানা জনের নানা ব্যাখ্যা ও ভাষ্য রচিত হয়। জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। সাম্যবাদীরা কাদা ছুঁড়লেন নেতাজীর গায়ে। কয়েদ-খানায় আটক কংগ্রেসী নেতাদের কিছুই করবার নেই।

কেউ বললেন: সুভাষ সাহসী বটেন, কিন্তু বড্ড মায়াবাদী। তিনি সঠিক বিপ্লবী হলে কখনোই এখন জার্মানীতে পাড়ি জমাতেন না।

অথচ, বিপ্লববাদ সম্পর্কে যাদের প্রত্যয় আছে, তারা স্বীকার করবেন, একজন যথার্থ বিপ্লবী মায়াবাদের পূজারী না হয়ে পারেন না। একটা সুদূরপ্রসারী কল্পনাই তাঁকে টেনে নিয়ে যাবে। শত বাধা, অপমান, সমালোচনা সত্ত্বেও তিনি এগিয়ে যাবেন সেই কল্প-রাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার উদগ্র বাসনায়।

এমনই এক কল্পশক্তি নেতাজীকে সেদিন টেনে নিয়ে গিয়েছিল বার্লিনে, আর বার্লিন-বেতারে ধ্বনিত হয়েছিল তাঁর অকম্পিত কণ্ঠস্বর: আমি সুভাষ, বার্লিন থেকে বলছি। ভারতবর্ষকে মুক্ত করবার জন্য চলেছে আমার প্রস্তুতি।...

নাৎসী-নায়ক, অক্ষশক্তির অন্যতম কর্ণধার বলদর্পী ফুরার হিটলারের সাক্ষাৎপ্রার্থী মুক্তিকামী ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ তেজদৃপ্ত গণনেতা সুভাষচন্দ্র বসু। মনে তাঁর একদিকে যেমন আশা, অপরদিকে তেমনি

---

*In 1942, he (Netaji Subhash Chandra Bose) was reported broadcasting from Berlin.…'If there is nothing wrong in Britain begging for help, there can be nothing wrong in India accepting an offer of assistance which she needs, and we shall welcome any help in India in our struggle against Imperialism'—Associated Press, Bombay.

বেদনা। পিছনের ফেলে আসা তিক্ত স্মৃতি তাঁকে অনবরত ছোবল মারছে। ছোটবেলা থেকেই তিনি আপসহীন, একটু অধীর প্রকৃতির। আবেগের তোড়ে ভেসে যেতেই তিনি অভ্যস্ত। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হাইকমাণ্ডের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ সুভাষ কংগ্রেস ত্যাগ করে গঠন করলেন ফরোয়ার্ড ব্লক। ফরোয়ার্ড ব্লকের কার্যপদ্ধতিতে আতঙ্কিত সরকার কয়েদ করলেন তাঁকে। অসহনীয় সেই বন্দিত্ব! —যেন এক বিরাট শূন্যতার মাঝে একক অবস্থান,—সুস্থ মানুষও পাগল হয়ে যেতে পারে। ১৯৪০এ তাই কিছুদিনের জন্য অনশনও করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু দৃষ্টি তাঁর স্থির হয়ে আছে ইংরেজী ক্যালেণ্ডারের পাতায়: ১৯৪১ আসছে ঝড়ের মত্ততা নিয়ে; এই ঝড়ের মুখেই সব কিছু পাল্টে ফেলবেন তিনি।

ভাগ্যের সাথে পাঞ্জা লড়লেন সুভাষচন্দ্র। এক দুঃসাহসিক মন্ত্রে তিনি সঞ্জীবিত হয়ে উঠলেন,—দেশ ত্যাগ করতে হবে!

যে উত্তমচাঁদ তাঁকে কাবুলে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁর উক্তি থেকেই আমরা সুভাষের সে সময়ের মানসিকতা বুঝতে পারি। উত্তমচাঁদের বর্ণনায় পাই, নেতাজী প্রথমে র'শিয়াতে যেতেই মনস্থ করলেন। অক্ষ-শক্তির কাছে হাত পাততে হবে,—এমন কথা তিনি তখন ভাবতেই পারতেন না। নেতাজী জানতেন, ফ্যাসিবাদের চেয়ে সাম্যবাদ সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।

ভাগ্যের সাথে পাঞ্জা লড়াইয়ে হেরে গেলেন সুভাষ।

কাবুলে পৌঁছে গভীর হতাশায় তিনি দেখলেন সামগ্রিকভাবে মহাযুদ্ধের পট পরিবর্তিত হয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধা সুভাষকে প্রীতির উষ্ণতায় গ্রহণ করতে এগিয়ে এলেন না যোশেফ স্তালিন। রুশ বন্ধুরা ভুল বুঝলেন নেতাজীকে। তাই মাত্র একটি রাত মস্কোতে অবস্থান করে বার্লিনের উদ্দেশে রওনা দিতে বাধ্য হলেন তিনি [২৭শে মার্চ, ১৯৪১]।

সুভাষ হিটলারের চরিত্র জানতেন। নাৎসীবাদ আর ফ্যাসিবাদের বীভৎসতা তাঁর অজানা ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে তিনি

যতটা ঘৃণা করতেন, তাদেরও তেমনি ঘৃণা করতেন। অক্ষ-শক্তির প্রশংসায় তিনি কোনদিন পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেননি।

নেতাজী চেয়েছিলেন রাশিয়ার সাহায্য। পেলেন না। বার বার চেষ্টা করেছিলেন স্তালিনের সাথে একটিবার যোগাযোগ স্থাপন করতে। ব্যর্থ হলেন প্রতিবারই।

এমনকি বার্লিনে পৌঁছে হিটলারের সাথে বৈঠকে বসবার আগেই সুভাষ ছুটে গেলেন সেখানকার সোভিয়েত দূতাবাসে। কিন্তু দূতাবাসে প্রবেশের মুখেই থমকে দাঁড়াতে হলো তাঁকে। দূতাবাসে কেমন যেন চাপ চাপ সন্দেহ ও আশঙ্কা জমাট বেঁধে আছে। ভারী বাত'সে দম নিতে কষ্ট হয়, সর্বত্র যেন বারুদের গন্ধ। নেতাজীর কথা শুনবার মতো মানসিকতা সেখানে আর কারুর নেই! রুশ-জার্মান সম্পর্কে চূড়ান্ত ফাটল ধরেছে। যে কোন মুহূর্তে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

সেই বিস্ফোরণ ঘটলো ২২শে জুন, ১৯৪১।

আর সুভাষ বার্লিনে উপস্থিত হন ২৮শে মার্চ, ১৯৪১।

কাজেই রুশ-সাহায্য লাভের শেষ সম্ভাবনাটুকুও তাঁর চোখের সামনে নিঃশেষে মুছে গেল! এক বিরাট অনিশ্চিত আবর্তে, আদর্শ-পরিপন্থী অক্ষ-শক্তির হাতে গিয়ে পড়তে হলো তাঁকে!

ফুরারের সাথে দেখা না করে আর উপায় নেই।

সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয়পত্র আছে তাঁর। কাবুলে অক্ষ-শক্তির অন্যতম শরিক ইতালীর রাজদূত সীনর ক্যারণী তাঁর জন্য অনেক পরিশ্রম স্বীকার করেছিলেন। সুভাষের জন্য একদিকে তিনি যোগাযোগ করেন ফ্যাসি-নেতা বেনিতো মুসেলিনীর সাথে, আর একদিকে নাৎসীনেতা হের হিটলারের সাথে।

আর একজন জার্মান তীক্ষ্ণধী কূটনীতিক বর্মের মতো আগলে রেখেছিলেন নেতাজীকে। তিনি হলেন ডঃ ওয়েলার। ওয়েলারের সাথেই কাবুল থেকে বার্লিনে উপস্থিত হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র।

পাসপোর্ট অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রের তখন পরিচয় একজন জার্মান ভদ্রলোক হিসেবেই, নাম ক্যারাটাইন।

হিটলার তখন উল্লাসে ডগমগ। অনবরত রকেট-আক্রমণে লণ্ডন বিধ্বস্ত; আর রাশিয়ার পাঁজর ভেঙে মস্কো-দখল সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত। ক্রমশই পূর্বের দিকে এগিয়ে যাবে নাৎসী-বাহিনী। পূবের অক্ষ-শক্তি জাপানের সাথে করমর্দন করবে হিমালয়ের সাধের 'স্ট্রং আর্ম'। হয়তো মেজর ফুজিয়ারা আমন্ত্রিত হবেন মহামান্য ফুরারের সাথে এক টেবিলে বসে খানাপিনা করবার জন্য।

এমন এক মহালগ্নে সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব।

চাপা উল্লাসে হিটলার হুকুম দিলেন: ভারতীয় নেতার যেন বার্লিন-অবস্থানে এতটুকু অসুবিধে না হয়।

হিটলার ভাবলেন, সুভাষ হবেন তাঁর হাতে খাসা রঙের তাস। এঁকে সামনে রেখে অনায়াসে মুক্তিকামী ভারতবাসীদের সমর্থন পাওয়া যাবে। তথাকথিত সুভাষ-নেতৃত্বে একটি বাহিনীও গঠিত হতে পারে বার্লিনে। অর্থবল, লোকবল, অস্ত্রবল—সবই যোগাবেন হিটলার। তারপর এই বাহিনীর মুখোশ পরে দিল্লীর কেল্লায় স্বস্তিকা-লাঞ্ছিত পতাকা উড়িয়ে দিয়ে আসবে জার্মানীর অজেয় সেনারা।...

সুভাষ যেন বুঝতে পেরেছিলেন, নাৎসী নায়ক আসলে কী চাইবেন। তাই প্রথম থেকেই বেশ কঠিন মনোভাব নিয়ে তিনি দেখা করলেন হিটলারের সাথে।..

রয়টারের খবরে প্রকাশ, হিটলার-সুভাষ সাক্ষাৎকার ঘটেছিল হৃদ্যতা-সূচক পরিবেশে। হিটলার সহাস্যে করমর্দন করতে করতে সুভাষচন্দ্রকে সম্ভাষণ করেছিলেন 'ফুরার অব ইণ্ডিয়া' বলে। কিন্তু আলোচনা বেশীদূর এগিয়ে যেতে পারেনি। নেতাজী জার্মানীর সাহায্য চেয়েছিলেন সত্য, কিন্তু নিজের স্বাধীনতার মূল্যে নয়। সুভাষ চেয়েছিলেন সম্পূর্ণ নিজের কর্তৃত্বে একটি বাহিনী ও

সরকার গড়ে তুলতে। কিন্তু ফুরার অতখানি স্বাধীনতা দিতে রাজী নন।

সুভা'ষ আরো বুঝলেন, হিটলার বা মুসোলিনী ভারতবর্ষ থেকে অনেক দূরে। এঁরা লড়ছেন য়ুরোপে ও মরু-আফ্রিকায়। কি এশিয়ায় বৃটিশ সিংহকে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে তুলছে সূর্যোদয়ের দেশ জাপান।

তাই 'নিপ্পনে' যেতে হবে।

জাপান থেকেও ডাক পাঠিয়েছেন ক্যাপ্টেন মোহন সিং এবং রাসবিহারী বসু ;—'আজাদ হিন্দ্ বাহিনী'কে নেতৃত্ব দিতে হবে।

জাপানে যাবার উপায়? দূরত্ব প্রায় কল্পনাতীত। ছ'হাজার মাইল সমুদ্রপথ পাড়ি দিতে হবে। সমস্ত পথটাই অতিমাত্রায় বিপদসঙ্কুল। শত শত যুদ্ধজাহাজ ও সাবমেরিনের সলিল-সমাধি ঘটছে আক্রমণ প্রতি-আক্রমণে।

তবু যেতেই হবে। ..

১৯৪৩-এর জুন মাসে আটলান্টিকের বুক চিরে অতল জলের গহ্বরে ডুব দিলো একটি জার্মান সাবমেরিন। সুভাষকে নিয়ে সেই জলযান সাঁই সাঁই এদিকে চলে জাপানের দিকে। সুভাষের সঙ্গী মাত্র একজন ভারতীয়,—মিঃ হাসান্।...

২০শে জুন, ১৯৪৩ জাপানে এলেন নেতাজী।

তারপর জাপান থেকে সিঙ্গাপুরে।

আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর হাজার হাজার সৈনিক এতদিনে তাদের যথার্থ নেতার সন্ধান পেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনে মুখর হয়ে উঠল।

আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ ক'রে ধ্বনিত হয়ঃ

জয়, নেতাজী কি জয়!

জয় হিন্দুস্থান!

জয় হিন্দ্!

আজাদ হিন্দ্ সরকার

রণজিৎ বসু

২১শে অক্টোবর ১৯৪৩ সাল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব তখন চলেছে দুনিয়াভর। ঠিক এমনি দিনেই বিশ্ববাসী সচকিত হয়ে উঠলো একটি ঘোষণায়ঃ 'ভারতের বাইরে আজাদ হিন্দ্ সরকার গঠিত হয়েছে।"

"স্বাধীন ভারত সরকার"—পরাধীন ভারতের মুক্তিকামী কোটি কোটি মানুষ শুনতে পেলো, তাদেরই প্রিয় নেতা আপসহীন সংগ্রামী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কীর্তি-কথা।

আরও পরে—অনেক পরে সব জানা গেলো।

দেশকে স্বাধীন করবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় বৃটিশের শত বাধা অতিক্রম করে সুভাষচন্দ্র জাপানে গিয়ে পেঁৗছেছিলেন ১৯৪৩ সালের ১৬ই মে। আজাদ হিন্দ্ সরকার গঠিত হয় সেই বছরেরই ২১শে অক্টোবর। আর আজাদ হিন্দ্ বাহিনী মালয় থেকে ইম্ফল সীমান্তের দিকে প্রারম্ভিক যাত্র শুরু করে ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে।

একেবারে অপরিচিত পরিবেশে কপর্দকশূন্য একটি মানুষ মাত্র সাত মাসের ভেতরে কি করে এতো বিরাট এক সংগঠন গড়ে তুললেন তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়।

আজন্ম আশাবাদী মহাবিপ্লবী সুভাষচন্দ্র মাত্র ৫৫ হাজার সৈন্য নিয়ে ভারতের মুক্তির জন্য যাত্রা শুরু করেছিলেন।

সেদিন ছিল না কোন সহায় সম্বল। সামনে ছিল অনিশ্চিত ভয়ঙ্করতা।

কিন্তু এতো করেও দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের দুর্নিবার প্রতিজ্ঞা থেকে কাউকেই টলানো যায়নি। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে সেদিনও ছিল বজ্রধ্বনি। সৈন্যদের কাছে তিনি বলেছিলেন, "বীরের

মতো এগিয়ে যাও, মৃত্যুবরণ করো। তোমরা মুক্তিফৌজের অগ্রদূত. —তোমাদের ত্যাগে মৃত্যুবরণে জাতীয় মর্যাদা রক্ষার শপথে যে অপূর্ব ঐতিহ্য রচিত হবে, তাই অন্য প্রান্তে লড়াইয়ে প্রেরণা যোগাবে। প্রভাতের আগে দেখা দেয় অন্ধকার—ভারত স্বাধীন হবেই এবং হবে অনতিবিলম্বে।"

আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর মৃত্যুভয়হীন সেনানীরা ভারতের মাটিতে পৌঁছবার, তাকে মুক্ত করার উদগ্র বাসনা আর প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে চললো। বৃটিশের লক্ষ লক্ষ সৈন্য আর প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে মাত্র কয়েক হাজার আজাদী সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়লো ইম্ফল সীমান্তে, আরাকান সীমান্তে।

নেতাজী চেয়েছিলেন দ্রুত ইম্ফল জয় করে নেবার। তিনি বিশ্বাস করতেন যেদিন জাপানী সাংবাদিকদের কাছে নেতাজী ঘোষণা করেছিলেন, "আমি এই মুহূর্তে এখানে গঠন করবো অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গভর্নমেণ্ট। নতুন করে গঠন করবো ভারত-নারীদের নিয়ে একটি সম্পূর্ণ নারীবাহিনী স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের নির্দেশে আজাদ হিন্দ্ বাহিনী যুদ্ধযাত্রায় বেরুবে···দিল্লীর লালকেল্লায় স্বাধীন ভারতের পতাকাকে উড্ডীন করে ক্ষান্ত হবে"—সেদিন বাঘা বাঘা সাংবাদিকরাও কপর্দকশূন্য একজন পলাতক বিপ্লবীর কথায় বিস্মিত হয়েছিলেন।

কিন্তু ইতিহাসের প্রমাণ অস্বীকারের উপায় নেই। নেতাজী যখন জাপানে এলেন তখন ভারতীয় ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট লীগ অন্তর্কলহে দুর্বল, বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে ক্রমাগত মতবিরোধের ফলে ক্যাপ্টেন মোহন সিং প্রথম আজাদ হিন্দ্ বাহিনী ভেঙে দিয়েছেন। ইউরোপের রণাঙ্গনে তখন জার্মানীর পরাজয় প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। নেতাজী বুঝতে পেরেছিলেন যে, জার্মানীর পরাজয়ের পর জাপানের পরাজয় কেউই রুখতে পারবে না। তাই তিনি চেয়েছিলেন যুদ্ধ শেষ হবার আগেই আজাদ হিন্দ্ বাহিনীকে ভারতের মাটিতে প্রবেশ করতে হবে। আর, একবার ভারতের মাটিতে পা দিতে

পারলেই স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর সঙ্গে এক হয়ে লালকেল্লা দখল করে নেওয়া যাবে। ইম্ফল অধিকার করতে পারলেই বৃটিশ সৈন্ত পিছু হঠতে হঠতে একেবারে বিহারের রাজমহল পর্যন্ত 'সেকেণ্ড লাইন অফ ডিফেন্স' তৈরী করবে। এর পর সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের কথা প্রচারিত হবে এবং জনগণ সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। ভারতে অবস্থিত বৃটিশ ফৌজে বিদ্রোহ শুরু হবে। দেশে এক ব্যাপক বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে –'লালকেল্লা' পৌঁছতে দেরি হবে না।

'দিল্লী চলো' মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ দেশপ্রেমিক আজাদী সৈন্তরা অসংখ্য বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে পাহাড়-পর্বত সীমান্তের দিকে এগিয়ে এলো। কোহিমা রণাঙ্গনে বীর সেনানীরা বৃটিশ ফৌজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হলো। কিন্তু ক্রমে রসদ এলো ফুরিয়ে, গোলা-বারুদের অভাব—খাদ্যের অভাব, পোশাক-পরিচ্ছদের অভাব নিদারুণভাবে বাধার সৃষ্টি করলো। তবু ইম্ফল প্রায় পতনের মুখে এসে গিয়েছিল। কিন্তু এমন সময়, অসময়ে বর্ষা এসে বিপর্যয় ঘটালো। যোগাযোগ ব্যবস্থা হলো বিপর্যস্ত। যানবাহন চলাচল হয়ে উঠলো অসম্ভব। অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে রসদ পাঠানো হলো বন্ধ।

কিন্তু তবু ঘাসসিদ্ধ খেয়ে আধপেটা খেয়েও আজাদী সৈন্তরা মরণপণ যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। কোহিমা আর আরাকানের প্রান্তরে সম্ভাবনাপূর্ণ যুদ্ধ-প্রচেষ্টা বহু প্রতিকূলতার ঝাপটায় তছনছ হয়ে গেলো। সুযোগ বুঝে বৃটিশ সরকার ভারতে অপপ্রচার শুরু করলো আজাদ হিন্দ্‌ বাহিনী ও নেতাজীর বিরুদ্ধে—দেশের ভেতরের জন-যুদ্ধ-ওয়ালারাও কম ক্ষতি করলো না।

আজাদী সৈন্তরা পিছু হঠে যেতে বাধ্য হলো। পিছু হঠে গেলো বাহিনী—কিন্তু কোহিমা আর আরকানের রক্ত-ভেজা মাঠে রেখে গেলো অনেক, অনেক সুসন্তান শহীদকে। শহীদের রক্তে রাঙা কোহিমা আর আরাকানের মাটি পবিত্র হয়ে রইল চিরদিনের জন্তে।

ঝান্সীরাণীর বাহিনীর ভারত-কন্যারা, বাল-সেনাদলের কিশোর দেশপ্রেমিকরা সে-দিনের আজাদী লড়াইয়ে ময়দানে দেশপ্রেমের যে রক্তক্ষরা দৃষ্টান্ত রেখে গেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজীর মেলা ভার। অভুক্ত সৈনিক, মুখে তার একমাত্র মন্ত্র "চলো দিল্লী"। একটার পর একটা বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে ভারতের মাটি স্পর্শ করতে। অনেক অনেক ঢলে পড়েছে মাটিতে, শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। কিন্তু ইম্ফলের মাটিতে স্বাধীন ভারতের তেরঙ্গা পতাকা উড্ডীন করা সম্ভব হয়েছিল।

ভারত-সীমান্তের ওপর পর্যন্ত পৌঁছে ফিরে যেতে বাধ্য হলেও আজাদ হিন্দ্ আন্দোলন কি ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল? ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, সে আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি। একের পর এক আজাদ হিন্দ্ বাহিনী গৌরবোজ্জ্বল আত্মত্যাগের কাহিনী দেশের ভেতরের মুক্তিকামী মানুষের মন থেকে মৃত্যু-ভয়কে মুছে দিয়েছিল। সারা দেশের প্রতিটি প্রান্তে তখন এসেছিল নবজাগরণের জোয়ার। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মনকেও চরমভাবে আলোড়িত করে দেখা দিয়েছিল নৌ বিদ্রোহ। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নায়কত্রয় শাহ্‌নওয়াজ, ধীলন, সাহিগল প্রভৃতি মুসলিম, শিখ, হিন্দু তরুণ সেনানীর লালকেল্লার বিচারকে কেন্দ্র করে সমগ্র ভারতবর্ষের ছাত্র, যুবক ও শ্রমিকের গণমানসে বিপুল প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল। এমন এক অবস্থায় ভারতে বৃটিশ সরকার বুঝতে পেরেছিল যে, আর বেশীদিন এখানে থাকলে বিপ্লবের জোয়ারে ভেসে যেতে হবে। তাই আপসপন্থী তৎকালীন নেতাদের সঙ্গে আপসরফায় বসতে বাধ্য হলো।

দীর্ঘদিনের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন দেশে যে বিপ্লবের জোয়ার আনতে পারেনি, আজাদ হিন্দ্ আন্দোলন মাত্র কিছুদিনের ভেতরেই তা আনতে সক্ষম হয়েছিল।

নেতাজীকে যেমন দেখেছি

শাহ্‌নওয়াজ খান

আমার অনেক বন্ধুই আমাকে অনুরোধ করেছেন—নেতাজীকে আমি যেমনটি দেখেছি—তার একটা সত্যিকার বর্ণনা যেন আমি দিই। সে চেষ্টা আমি আজ করবো, কিন্তু আমার ভয় হয় অক্ষম আমার লেখনী বুঝি আমার নেতাজীর মহিমা ম্লান করে ফেলে! পাঠকগণ যেন আমার এই অক্ষমতাকে ক্ষমা করেন। যাঁর কথা বলতে যাচ্ছি, তিনি এতো মহান যে আমাব মতো একজন সাধাবণ সৈনিকের পক্ষে তাঁব যথাযথ বর্ণনা করা সত্যিই সম্ভব নয়।

একথা আমার স্বীকার করতে বাধা নেই যে, যে মুহূর্তে আমি তাঁর সান্নিধ্য লাভ কবেছি সেই মুহূর্ত থেকে তাঁর চরিত্র আমার মনেব উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। নেতাজীকে আমি মানুষ, সৈনিক ও রাজনীতিজ্ঞ—এই তিন রূপে দেখেছি কিন্তু এখনও আমি ঠিক করে বলতে পারি না—এই তিনের কোন্ রূপে তিনি সবচেয়ে বড়, আর কোন্‌টাতে ছোট। ঘবে থাকবার সময় মনে হতো—মানুষ হিসেবেই তিনি সবচেয়ে বড়, যুদ্ধক্ষেত্রে ও সৈন্যদলের মাঝে তাঁকে দেখে মনে হতো- এমনটি আব হয না। আবার যখন তিনি সভা-সমিতি, বৈঠকে অথবা অফিসে সাময়িক আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টেব সর্বাধিনায়করূপে কাজ করতেন তখন তাঁর কার্য-পবিচালনা দেখে আমরা মুগ্ধ হতাম।

বাল্যকাল থেকে সামরিক আবহাওয়া এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আনুগত্যের ভিতরই মানুষ হয়ে উঠেছি আমি। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন থেকেই তার বিরুদ্ধাচরণ করে আসছিলাম, কারণ আমার বরাবরের ধারণা জাপানীরা ভারতীয়দের দিয়ে নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধিই করে নিচ্ছে। এবং ব্রিটিশদের উপর আমার আন্তরিক

আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিলো। সুতরাং নেতাজীকে প্রথম আমি যখন দেখলাম তখন তাঁকে বেশ ভালভাবে যাচাই করে নিতে কসুর করিনি। তাঁর গভীর স্বদেশপ্রেমই আমাকে মুগ্ধ করেছিলো বেশি। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি জীবনের সবকিছু বিসর্জন দিতে রাজী ছিলেন, কারণ, তাঁর কাছে এর চেয়ে বড় জিনিস কিছু ছিলো না।

কোনো লোকের কাজকর্ম, আদর্শ ঠিকমতো বুঝতে হলে বহুদিন তাঁর সঙ্গ করা দরকার। নেতাজীর সাহচর্যের সুযোগ আমি যথেষ্ট পেয়েছি। যতদিন তিনি পূর্ব-এশিয়ায় ছিলেন তাঁর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। তিনি যতদিন সিঙ্গাপুরে ছিলেন আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম, তারপর তিনি ব্রহ্মদেশে যান আমিও তাঁর সঙ্গে যাই। সেখানে প্রায় দেড় বৎসর আমি তাঁর সঙ্গে একত্রে বাস করেছি। প্রতিদিন নানা কাজে তাঁর যে অসাধারণ ক্ষমতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় আমি পেয়েছি তা অবর্ণনীয়। পূর্ব-এশিয়াবাসী ভারতীয়দের কাছ থেকে যে গভীর শ্রদ্ধা, প্রীতি তিনি লাভ করেছেন তাই তাঁর গুণাবলীর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁর সংস্পর্শে যে এসেছে সে-ই মুগ্ধ হয়েছে। এমন কি, অনেক বিদেশী লোকও তাঁর সান্নিধ্যে এসে তাঁর অনুরাগী ভক্ত হয়ে উঠেছেন। পূর্ব-এশিয়াবাসী ভারতীয়দের মধ্যেও একটা নিবিড় বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার ভাব গড়ে তুলেছেন। লোকে তাঁকে হৃদয়ের পূজা দিয়েছে, প্রীতি দিয়েছে দেবতাজ্ঞানে নয়—তারা তাঁর মাঝে সত্যিকার মানুষ, বীর, বন্ধু, সাথীর দেখা পেয়েছেন বলে। তাঁর মাঝে এমন কি ছিলো যার বলে তিনি মানুষের হৃদয় এমনি করে জয় করে নিলেন, এমনি করে তাদের গভীর শ্রদ্ধা, অপরিমেয় ভালবাসা লাভ করলেন? কি গুণেই বা তিনি পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের অবিসম্বাদী নেতা বলে গণ্য হলেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলতে হবে—এসব পেয়েছেন তিনি তাঁর মহান চরিত্র, অতুলনীয় সাহস ও অনন্যসাধারণ উদারতার গুণে।

মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন আমাদের বন্ধুর মতো, সাথীর মতো।

পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের তিনি নেতা—কিন্তু হাবভাবে কোনোদিন তিনি তাঁর প্রভুত্ব জাহির করেননি। তিনি নিত্য কঠোর জীবন যাপন ও অমানুষিক পরিশ্রম করতেন; আবার সবার দুঃখ-কষ্টের ভাগও গ্রহণ করতেন। তিনি আজাদ হিন্দ্‌ দলের প্রত্যেক লোকের খোঁজ-খবর নিতেন, প্রত্যেকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতেন। ছোট বড়, খুঁটিনাটি সব কিছুর হিসাব তিনি নিজে করতেন, যার যা প্রয়োজন তাও মেটাতেন। কোন জাঁক-জমক তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন।

জাপানীদের সঙ্গে নেতাজীর সম্বন্ধ কি দাঁড়ায়—এ নিয়ে প্রথম-প্রথম আমরা খুবই মাথা ঘামিয়েছি। মালয় ও ব্রহ্মদেশের লোকের সঙ্গে জাপানীরা যা ব্যবহার করেছে, জেনারেল মোহন সিং-এর সঙ্গে যেমন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে—তা দেখে ওদের ওপরে আর বিন্দুমাত্র আস্থা আমাদের ছিলো না। এখন নেতাজীর সঙ্গে ওরা কিরূপ ব্যবহার করে এবং নেতাজীই বা তার প্রতিদানে কি করেন—দেখবার জন্য আমরা প্রতীক্ষা করেছিলাম। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আমরা বুঝতে পারলাম নেতাজী কারো কাছে নতি স্বীকার করার লোক নন, দেশের সম্মান তিনি কোনো কিছুরই পরিবর্তে খোয়াতে রাজী নন।

নেতাজীর আর একটা গুণ ছিলো তাঁর অকপট ব্যবহার, এই গুণেই তিনি তাঁর অধীনস্থ অফিসার ও অন্যান্য লোকের চিত্ত জয় করেছিলেন। একদিন কয়েকজন অফিসার নেতাজীকে জিজ্ঞাসা করেন—জাপানীদের সঙ্গে আমাদের সত্যিকার সম্বন্ধটা কি? তিনি বললেন,—জাপানীরা ভালোভাবে জানে, ব্রিটিশেরা যতদিন ভারতবর্ষে থাকবে, ততদিন তারা সেখান থেকেই সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধ চালাবে জাপানীদের সঙ্গে,—জাপানীরা নিরাপদে নিজেদের সাম্রাজ্য ভোগ করতে পারবে না; সুতরাং তারা নিজের স্বার্থেই ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ বিতাড়নের চেষ্টা করবে, নইলে তাদের নিজেদেরই পূর্ব-এশিয়া থেকে বিতাড়িত হতে হবে। নেতাজী বললেন,—যুদ্ধে আমাদের সাহায্য ক'রে আমাদের কোনো অনুগ্রহ করছে না ওরা। আসল

কথা—ওরাও যেমন আমাদের সাহায্য করছে, আমরাও তেমন তাদের করছি। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক—ভারত থেকে ব্রিটিশ বিতাড়ন, ওরা করতে চায় এটা নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে—আমরা চাই নিজেদের স্বাধীনতার জন্যে। তিনি বললেন—'সত্যি কথা বলতে কি, বিশ্বাস আমি ব্রিটিশদেরও করি না, জাপানীদেরও না। দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে বিশ্বাস কাউকেই করা যায় না, আমরা যতদিন দুর্বল থাকবো শক্তিশালী যে কোনো জাতিই সুযোগ পেলে আমাদের শোষণ করতে ছাড়বে না।'

নেতাজী বললেন—জাপানীদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে—আমাদের নিজেদের শক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ওঠা। জাপানীরা এসে আমাদের রক্ষা করবে এ প্রত্যাশা যেন আমরা কখনো না করি, আমাদের নিজ শক্তিবলেই নিজেদের রক্ষা করতে হবে। এমন কি, ভারতবর্ষে গিয়ে যদি আমরা দেখি জাপানীরা ব্রিটিশের আসনে বসতে চাইছে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ করতে হবে আমাদের।

শুধু সেইদিন নয়, অনেক জনসভাতেও নেতাজী আমাদের এই কথাই বলেছেন। যে সব সৈনিক আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগ দিয়েছে তাদের তিনি আগে থেকেই বলে রেখেছেন—তারা যেন প্রথমে ব্রিটিশদের সঙ্গে, পরে দরকার হলে জাপানীদের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে থাকে।

জাপানীদের সঙ্গে একসাথে মিলেমিশে কাজ করলেও যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের পৃথক স্থান (sector) ছিলো, সেখানে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যুদ্ধ করতো। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ওপর জাপানী কেন্দ্রীয় নির্দেশ বলে কিছু ছিলো না। যুদ্ধের সময় 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'-তে অনেকে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সম্বন্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—এই ফৌজ যখন জাপানী সৈন্যদলের সঙ্গে একযোগে লড়াই করছে, তখন এরা জাপানীদের হাতে ক্রীড়াপুত্তলি

না হয়ে যায় না। নেতাজী এর উত্তরে বলেছিলেন—ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্যদল তো ফ্রান্সে জেনারেল আইসেনহাওয়ারের নেতৃত্বে ঠিক এই-ভাবেই লড়াই করছে। ব্রিটিশেরা যখন নিজেরাই আমেরিকানদের নির্দেশ মেনে যুদ্ধ করছে তখন তারা আবার আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কার্যাবলীর সমালোচনা করতে আসে কেন?

নেতাজীর মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার নাম-গন্ধ ছিলো না। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যায় বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়ার একটি বৈঠকে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো তাঁর বক্তৃতার এক অংশে বলেন—স্বাধীন ভারতে নেতাজীই হবেন সর্বেসর্বা।

কথাটি শুনবামাত্র নেতাজী উঠে দাঁড়িয়ে এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন —এরূপ কথা বলবার কোনো অধিকার জেনারেল তোজোর নেই। স্বাধীন ভারতে কে কী হবেন তার সিদ্ধান্ত করবে ভারতের অধিবাসীরা। তিনি নিজে ভারতের একজন দীন সেবক মাত্র,—সেখানকার সর্বেসর্বা হবার মতো যোগ্যতা রয়েছে কেবল মহাত্মা গান্ধী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর।

ধর্ম সম্বন্ধীয় বা প্রাদেশিক ভেদাভেদ তাঁর কাছে কিছুমাত্র ছিলো না। এসব তিনি আমলই দিতেন না। হিন্দু, মুসলমান, শিখ সবাইকে তিনি সমচোখে দেখতেন এবং তাঁর এই ভাবই সমগ্র আজাদ হিন্দ ফৌজকে অনুপ্রাণিত করেছিলো। আজাদ হিন্দ্ দলে ধর্মগত বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের নামগন্ধ ছিলো না। অথচ প্রত্যেক লোকেরই নিজ নিজ ধর্মমত অনুসারে উপাসনা করবার অধিকার ছিলো। তিনি তাঁর সৈন্যদের বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তারা সবাই একই ভারতমাতার সন্তান; সুতরাং তাদের কারো সাথে কারো কোনো পার্থক্য থাকতে পারে না। নেতাজীর অনুপ্রেরণায় আমরা সবাই এক হয়ে গিয়েছিলাম এবং আমরা বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলাম ভারতের ধর্মগত বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ শুধু বিদেশীদেরই সৃষ্টি। এই বিদ্বেষের ভাব যে আমাদের মন থেকে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত

হয়েছিলো তার স্পষ্ট প্রমাণ - নেতাজীর শ্রেষ্ঠ অনুরাগী ভক্তদের কয়েকজন হচ্ছেন মুসলমান। মানুষ হিসেবে কে কেমন—নেতাজী তাই দেখে লোককে সম্মান দিতেন, তার ধর্ম বা প্রদেশ দেখে নয়।

জার্মানী থেকে টোকিও আসবার বিপদসঙ্কুল পথে তিনি যখন সাবমেরিনে যাত্রা করেন, তখন তাঁর সঙ্গী নির্বাচন করেন যাঁকে—তিনি এক মুসলিম তরুণ। নাম তাঁর আবিদ হোসেন।

আবার তাঁর সৈন্যদল যখন যুদ্ধে শত্রুর সম্মুখীন—তখন তাঁর দু'জন ডিভিশনাল কমাণ্ডারই ছিলেন মুসলমান—মেজর জেনারেল এম. জেড কিয়ানি এবং আমি। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে তিনি যখন শেষবার টোকিও যাত্রা করেন তখনও তাঁর সঙ্গী নির্বাচন করলেন একজন মুসলমানকে। নাম তাঁর কর্নেল হবিবর রহমান। এইরূপ মনোভাব শুধু সৈন্যদলেই নিবদ্ধ ছিলো না, অসামরিক লোকসমাজেও এ ভাব প্রসারিত হয়ে পড়েছিলো। সেখানেও নেতাজীর শ্রেষ্ঠ অনুরাগীদের কয়েকজন হচ্ছেন মুসলিম। মিঃ হাবির নামে রেঙ্গুনের এক ধনী বণিক নেতাজীর গলার মালার মূল্য স্বরূপ তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করেছিলেন—এ সম্পত্তির মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা। এই জন্যই আমরা—আজাদ হিন্দ্ ফৌজের লোকেরা—এ কথায় বিশ্বাস করি না যে, ভারতীয়েরা সব ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপন ভাই-বোনের মতো মিলেমিশে এক স্বাধীন মহান্ অখণ্ড ভারতবর্ষ গড়ে তুলবার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে না।

তিনি আমাদের বেশ করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—অনাহারক্লিষ্ট দেশের সৈন্য আমরা, জীবন আমাদের এক মহৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। তাঁর কাছ থেকে এই প্রেরণা পেয়েই আজাদ হিন্দের সৈন্যেরা অত কষ্ট করে বাধাবিপত্তি অভাব তুচ্ছ করে যুদ্ধ করতে পেরেছিলো।

নিজের কাজ, ব্যক্তিগত জীবন বলে তাঁর কিছু ছিলো না। খুব ভোরে উঠে রাত্রি দুটো পর্যন্ত তিনি সব সময়েই দেশের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। বাড়িতে তাঁর ব্যবহার ছিলো অতি চমৎকার।

অভ্যাগতেরা তাঁর কাছে সমাদর পেতেন পরমাত্মীয়ের মতো। অফিসারদের প্রায়ই তিনি ব্যাড্‌মিণ্টন খেলায় নিমন্ত্রণ করতেন। খেলার শেষে তিনি তাঁদের নিজের ঘরে নিয়ে যেতেন, তাঁদের জামা-কাপড় বদল করবার দরকার হলে তিনি নিজের জামা-কাপড়ই তাঁদের দিতেন। তাঁদের কেউ হাত-মুখ ধুতে গেলে তিনি তাঁর জন্য সাবান, তোয়ালে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

ঝাঁসীর-রাণী-বাহিনীর মেয়েদের তিনি নিজের সন্তানের মতো দেখতেন। তাদের কিসে মঙ্গল হয়, সম্মান কিসে তাদের বজায় থাকে সে বিষয়ে তাঁর সদা-সতর্ক দৃষ্টি ছিলো। একবার ঝাঁসীর-রাণী-বাহিনীর একটি মেয়ে তার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারিয়েছে শুনে বিষপান করে। ব্যাপারটা যথা সময়ে জানতে পারায় মেয়েটি অবশ্য রক্ষা পেলো। নেতাজী দু'জন বর্ষিয়সী মহিলার উপর ভার দিলেন—এর সঙ্গে সঙ্গে থেকে সর্বদা এর গতিবিধি লক্ষ্য করতে। মাঝে মাঝে তিনি নিজেও তাকে ডেকে পাঠাতেন। সে এলে বাপের মতো তিনি তার সঙ্গে নানা কথা বলে সান্ত্বনা দিতেন।

নেতাজী তাঁর সৈন্যদের খুবই ভালবাসতেন এবং তারা যাতে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে সেদিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখতেন। অনেক সময় তিনি তাদের রান্নাঘর পরিদর্শন করতেন, কখনও বা তাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খেতেন। তাঁর কড়া হুকুম ছিলো—তাঁর নিজের খাদ্য যেন ঠিক সৈন্যদের খাদ্যের মতো হয়। তিনি প্রায়ই হাসপাতাল পরিদর্শনে যেতেন এবং নিজের বাড়িতে মিঠাই তৈরী করিয়ে সেখানকার সৈন্যদের জন্য নিয়ে যেতেন।

তাঁর এইসব গুণ থাকায়, জাপানীদের কাছে নতি স্বীকারে অস্বীকার করায় এবং তাঁর অকপট ব্যবহার, দেশপ্রীতি, নিঃস্বার্থপরতা এবং সৈন্যদের প্রতি ভালবাসার জন্য তিনি সবার প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তারা প্রত্যেকেই মনে করতো—নেতাজী তার বিশিষ্ট বন্ধু এবং এমন একজন নেতার জন্যে প্রাণ দেওয়াও মহা-সৌভাগ্যের কথা।

প্রত্যেকদিন বেতারে ভারতবর্ষের খবর তিনি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন। দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে শুনে তিনি একেবারে মুষড়ে পড়েন। এই সময় দিন রাত তিনি ভাবতেন—কি করে দেশবাসীকে—বিশেষ করে তাঁর অতি প্রিয় বাংলাদেশের অধিবাসীকে অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবেন। অনেক চেষ্টা করে শ্যাম ও ব্রহ্মদেশের সরকারের কাছ থেকে তিনি এক লক্ষ টন চাল ক্রয় করেন। অতঃপর তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কাছে প্রস্তাব করে পাঠান যে, এক লক্ষ টন চাল তিনি কলকাতায় পাঠাবেন—পাঠানোর সকল প্রকার বন্দোবস্ত তিনি নিজেই করবেন, ব্রিটিশেরা শুধু এই প্রতিশ্রুতি দেবেন যে, মালবাহী জাহাজ ও নৌকাগুলি তাঁরা নিরাপদে ফিরে যেতে দেবেন।

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এর কোন জবাবই দিলেন না, নেতাজী আগেই অনুমান করেছিলেন—তাঁরা এইরকমই করবেন। নেতাজী শুধু একবার নয়—কয়েকবার এই প্রস্তাব করেন; একবারও জবাব মিললো না। হবেই তো—লক্ষ লক্ষ বাঙালী মরে তো ব্রিটিশের কি ?

একবার জাপানী জেনারেল স্টাফের অধ্যক্ষ নেতাজীর কাছে এসে বলেন—তাঁরা ঠিক করেছেন কলকাতায় বোমা ফেলবেন, এ বিষয়ে নেতাজীর মত কি ?

নেতাজী তার উত্তরে বলেন—সুন্দর মহানগরী ভীষণ বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে যাবে এ তিনি একেবারেই চান না। তিনি বলেন—'দেশবাসীকে দিতে চাই আমি আশা ভরসা—ধ্বংস ও যন্ত্রণা নয়।—ইম্ফলের পতনের পর আমরা অনেক বোমারু বিমান কলকাতায় পাঠাতে চাই, তারা গিয়ে উপর থেকে বোমা ফেলবে না, ফেলবে হাজার হাজার ত্রিবর্ণ-পতাকা। বোমার চেয়ে এতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের কাজ করবে বেশি।'

যাই হোক, কলকাতায় বোমা ফেলার চেষ্টা থেকে জাপানীদের নেতাজীই বিরত করেন।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নেতাজীর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিলো। যখন যে চাল দরকার, সে চাল দিতে তাঁর কখনও ভুল হতো না, ফলে রাজনীতির খেলায় তাঁর বিপক্ষ দলেরই হতো পরাজয়। মাঝে মাঝে আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে এমন কথা তিনি বলতেন যে আমরা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যেতাম। অনেক ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হতো। বস্তুতঃ তিনি নেতা ছিলেন শুধু পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের নয়, ওখানকার যাবতীয় লোকের। বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়ার বৈঠকে ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। এই জন্যই জাপানী গভর্নমেণ্ট টোকিওর হাবিয়া পার্কে (Habiya Park) জাপানীদের কাছে বক্তৃতা দিতে তাঁকে আমন্ত্রণ করেন। এটা কম সম্মানের কথা নয়, জাপানীরা এ সম্মান বিদেশী কাউকে বড় একটা দেয়নি—বিশেষ করে এমন সময়ে, যখন যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয় করে তারা সৌভাগ্য ও গৌরবের চরম শিখরে গিয়ে পৌঁচেছিলো। জাপানে কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আমায় বলেছেন—নেতাজী বিপুল প্রতিভাশালী ব্যক্তি। পূর্ব-এশিয়ায় এমন রাজনীতিজ্ঞ আর নেই। নেতাজীর সঙ্গে বহু সভা এবং বৈঠকে গিয়ে আমি দেখেছি রাজনীতিজ্ঞানে অন্য কেউ তাঁর কাছে দাঁড়াতেই পারে না।

ভারতীয় রাজনীতি ছিল তাঁর একেবারে নখ-দর্পণে। ভারতের অধিবাসীদের তিনি চিনতেন—নেতারা সব তাঁর জানা—সুতরাং এখানকার কার্য-পদ্ধতি ও তার ফলাফল যেন তাঁর চোখের সামনে ভাসতো। জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করা বেশ একটু কঠিন ব্যাপার ছিলো, বিশেষ করে এই সময়ে যখন তাঁদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, যাতে হাত দিচ্ছে তাতেই সোনা ফলছে। নেতাজী কিন্তু এই কঠিন ব্যাপারও কেমন করে যেন অতি সহজ করে ফেলতেন, জাপানীদের দুরভিসন্ধি তাঁর সুনিপুণ রাজনৈতিক চালে সব ভেস্তে যেতো,—তাই তাদের সঙ্গে মনোমালিন্য আমাদের একবারও ঘটেনি।

নিম্নপদস্থ ভারতীয় ও জাপানী অফিসারেরা কিন্তু পরস্পরের প্রতি রাগে গস্‌গস্‌ করতেন। মোট কথা, আমাদের রাজনৈতিক তরণী ভীষণ তুফানের মাঝেই চলেছিলো, কিন্তু সুদক্ষ কর্ণধার নেতাজীব পরিচালনাগুণে আপদ-বিপদ তার কিছু ঘটেনি। আমি বরাবর তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কর্মপদ্ধতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি, দেখে দেখে বুঝেছি রাজনৈতিক বুদ্ধি তাঁর অতি তীক্ষ্ণ। জাপানের সামরিক কর্তৃপক্ষ বরাবর আমাদের সাহায্য করবার অছিলায় আমাদের দ্বারা নিজেদের কাজ করিয়ে নিতে চেয়েছে, এতে আমরা অতিশয় বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। নেতাজী আসার পর তাঁর প্রভাবে ওদের মতিগতি একেবারে পালটে গেলো। যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে নতুন কিছু করতে হলে জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ নেতাজীর সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ করার পর তবে কাজে হাত দিতেন। চীনের উপর জাপানের প্রভুত্ব করার স্পৃহা যে শেষে বন্ধুত্ব-কামনায় পরিণত হলো এরও মূলে রয়েছেন নেতাজী। ব্রহ্ম, চীন ও জাপানের অনেক বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ প্রায়ই নেতাজীর কাছে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে পরামর্শ নিতে আসতেন। পূর্ব-এশিয়ার পরাধীন জাতিদের কাছে নেতাজী ছিলেন বিশেষ গর্বের বস্তু। মহত্ত্ব কেউ অর্জন করতে পারে না— এ মানুষের জন্মগত সহজাত গুণ; কিন্তু মহত্ত্বের পথে যাত্রা করে কোনো বড় কিছু করতে গেলে এর আনুষঙ্গিক অনেক কিছু মানুষেব অনুশীলন করে নিতে হয়—এই অনুশীলনকেই বলা হয় মহত্ত্বের সাধনা। এ সাধনা নেতাজী যথাযথভাবে করেছিলেন। তাঁব অকপটতাই তাঁর মহত্ত্বের সাধনায় সিদ্ধি এনে দিয়েছিলো। সুদূর প্রাচ্যের নেতারা তাঁর কাছে যুক্তি-পরামর্শ চাইতে এলে তিনি তাঁদের অতি সহজে ব্রিটিশ প্রচার বিভাগের দুরভিসন্ধি ব্যাখ্যা করে বুঝাতেন।

নেতাজীর সবচেয়ে বড় কীর্তি হচ্ছে সাময়িক আজাদ হিন্দ্‌ গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা। আন্তর্জাতিক রাজনীতির খেলায় এ একটি মস্ত বড় চাল।

পূর্বেকার ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার অধিকার ছিলো না, তা ছাড়া পূর্ব-এশিয়ার জাতিসঙ্ঘের (League of East-Asiatic Nations) সঙ্গে সমপর্যায়ে সহযোগিতার সম্ভাবনাও তাঁর ছিলো না। এইরূপ সমান মর্যাদা ও অধিকারের প্রশ্ন যে একদিন আসবে—একথা নেতাজী পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তিনি সাময়িক আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্ট স্থাপনে এতো আগ্রহশীল হয়ে উঠেছিলেন। অফিসার ও কর্মীবৃন্দ সব একই রয়ে গেলেন—অথচ রাতারাতি আমরা স্বাধীন রাজ্যের মর্যাদা লাভ করলাম এবং ন'টি রাজ্য আমাদের স্বাধীনতা মেনে নিলো। আমাদের গভর্ণমেণ্ট অপরের আশ্রিত হলেও মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা আমরা ঐ নয়টি রাজ্যের যে কোনোটির চেয়ে একটুও কম পেলাম না।

জাপানীরা একবার প্রস্তাব করেছিলো—সমপদস্থ আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানের সামরিক কর্মচারীদের প্রথম সাক্ষাতে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের লোকই প্রথম অভিবাদন জানাবে—কারণ, জাপানী ফৌজ অনেক আগে গড়া হয়েছে। নেতাজী একথা শুনে রীতিমতো চটে যান। তিনি বলেন—এরূপ করলে মর্যাদায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে অনেক হীন করা হয়, সুতরাং এ প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করতে রাজী নন। তিনি প্রস্তাব দেন, এরূপ সমপদস্থ দুই অফিসারের দেখা হলে তাঁরা দু'জনেই একসঙ্গে পরস্পরকে নমস্কার করবেন। জাপানীরা শেষে নেতাজীর মতই মেনে নেয়।

এ ছাড়া পূর্ব-এশিয়ায় একমাত্র আজাদ হিন্দ্ ফৌজই জাপানী সামরিক আইনের আমলে আসতো না। জাপানীরা কয়েকবার নেতাজীর কাছে প্রস্তাব নিয়ে এসেছে—আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে জাপানের সামরিক আইনের অধীন করা হোক। নেতাজী কঠোর-ভাবে তাদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন,—আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নিজেদের স্বতন্ত্র আইন-কানুন আছে, তারা অপরের আইনের অধীনে থাকবে কেন? ব্যাপারটা শেষে টোকিও-র

জাপানী কর্তৃপক্ষের কানে পর্যন্ত তোলা হয়। সেখানে অবশ্য তাঁরা নেতাজীর কথাই মেনে নেন। সুযোগ পেলেই নেতাজী স্পষ্ট করে শুনিয়ে দিতেন—আজাদ হিন্দ্ ফৌজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শুধু ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্য, একে দিয়ে জাপানীদেরা কোনো কাজ করিয়ে নিতে তিনি দেবেন না। দু'-দু'বার জাপানীরা নিজেদের কাজে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছে। একবার ছামপং (chum-pong) এলাকায়—শ্যামদেশীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। একটা ছোটো জাপানী দলকে শ্যামবাসীরা এখানে অবরুদ্ধ করে। এ ব্যাপার ঘটে ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসে। আর একবার ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে ব্রহ্মের জাতীয় বাহিনী যখন জাপানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তখনও জাপানীরা আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে তাদের হয়ে লড়তে আহ্বান করেছিলো। এই উভয় ক্ষেত্রেই নেতাজীর আদেশক্রমে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ জাপানের প্রস্তাবে অস্বীকৃত হয়।

নেতাজীর আদর্শই ছিলো জাপানীদের কাছ থেকে পারতপক্ষে সাহায্য না নেওয়া। সুদূর প্রাচ্যের ভারতীয়দের কাছ থেকে যতক্ষণ সাহায্য পাওয়া যেতো ততক্ষণ সেই ধরনের সাহায্য জাপানীদের কাছ থেকে কিছুতেই গ্রহণ করা হতো না। জাপানীরা বার বার নেতাজীকে অনুরোধ করেছে তাদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া হোক। নেতাজী এক সামরিক উপকরণ ছাড়া অন্য কোনো প্রকার সাহায্য নিতে কিছুতেই রাজী হননি। তিনি ভারতীয়দের বলতেন—যতদিন তাঁরা নিজেদের দেশের কাজ নিজেরা চালিয়ে নিতে পারেন ততদিন তিনি অপরের মুখাপেক্ষী হবেন না। তাঁর এই অকপট ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে সেখানকার ভারতীয়েরা অজস্র টাকা, লোকবল ও নানা জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন। পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যে যথাসর্বস্ব দানের আয়োজনও চলছিলো। স্বাধীনতার একটি অনিশ্চিত সম্ভাবনার জন্য এমন যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করার কথা জগতে আর কোনো জাতি কোনোদিন ভেবেছে কি না সন্দেহ,—কিন্তু ওখানকার

ভারতীয়েরা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবাই নেতাজী যা চান তাই দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

পূর্ব-এশিয়ার সর্বত্র ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করে ওখানকার ধনী দরিদ্র সর্বশ্রেণীর ভারতীয়দের মধ্যে দেশপ্রীতি জাগিয়ে তুলেছিলেন নেতাজী, ফলে তাদের কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য আসতে লাগলো। সম্প্রদায় নির্বিশেষে বহু ভারতীয় তাঁদের যথা-সর্বস্ব দেশের কাজে আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে দিয়ে নিজেরা ফকির সাজলেন। কোনো কোনো পরিবারের সবাই আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগ দিয়েছেন। বাবা এসেছেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজে, মা ঝাঁসীর রাণী বাহিনীতে; ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা বালসেনা দলে যোগ দিয়েছে। করো সব নিছোয়ার বনো সব ফকির'—এই ছিলো তাঁদের নেতাজীর দেওয়া বাণী। হাবিব, বেতাই, খান্না এবং আরও অনেকে আজাদ হিন্দ্ গভর্নমেণ্টকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে নিজেরা একেবারে ফকির হয়েছেন। এমনি করে রেঙ্গুনে আজাদ হিন্দ্ ব্যাঙ্কে মোট ২০ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়।

আজাদ হিন্দ্ সরকারী তহবিলে যে শুধু বড়লোকেরাই টাকা দিয়েছেন তা নয়—বস্তুতঃ এর অধিকাংশ টাকা এসেছে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকদের কাছ থেকে। দীনমজুর, গয়লা এবং তাদেরই সমশ্রেণীর লোক তাদের যথাসর্বস্ব দান করে এ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

সিঙ্গাপুরের একটি জনসভায় নেতাজীর বক্তৃতা দেবার পর আমি যে দৃশ্য দেখেছি তা জীবনে ভুলবো না।

বক্তৃতা শেষ করে নেতাজী যখন আজাদ হিন্দ্ সরকারী তহবিলের জন্য টাকা চাইলেন, তখন হাজার হাজার লোক টাকা দিতে আসতে লাগলেন। তাঁরা সব নেতাজীর সামনে কিউ (Queue) করে দাঁড়িয়ে একে একে এসে টাকা দিয়ে চলে যেতে লাগলেন। কিউ-এ যাঁরা এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা সবাই অবশ্য বেশ মোটা টাকাই দান করেছিলেন। হঠাৎ দেখি —একটি নিঃস্ব স্ত্রীলোক বক্তৃতামঞ্চে নেতাজীর

দিকে এগিয়ে আসছে। পরনে তার শতচ্ছিন্ন বস্ত্র, মাথায় কাপড় জোটেনি। এ আবার কি করে, দেখবার জন্য আমরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। নেতাজীর কাছে এসে সে তিন টাকার নোট বের করে নেতাজীর হাতে দিতে গেলো।...আমরা, দেখলাম নেতাজীর কেমন বাধো-বাধো লাগছে। তা দেখে সে বললে— 'নেতাজী, আপনি নিন, এই আমাব যথাসর্বস্ব।' নেতাজীর দ্বিধার ভাব তবুও কাটলো না, দু' চোখে তাঁর জল ভরে এলো। এর পর তিনি হাত বাড়িয়ে তার দান গ্রহণ করলেন।

সভা ভঙ্গ হবার পর আমি নেতাজীকে জিজ্ঞাসা করলাম -ঐ গরীব স্ত্রীলোকটির কাছ থেকে তিনি টাকা নিতে দ্বিধা করেছিলেন কেন, আর তিনি চোখের জলই বা ফেললেন কেন ?

নেতাজী উত্তরে বললেন—'বড়ই মুশকিলে পড়েছিলাম আমি ; ওর দিকে চেয়েই আমি বুঝেছিলাম—ঐ ওর যথাসর্বস্ব. ঐ টাকা আমি নিলে ওকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে,—আবার না নিলেও মনে ব্যথা পাবে তাও ভাবছিলাম। দেশের স্বাধীনতার জন্য ওর যা কিছু ছিলো সব দিতে এসেছে —এ প্রত্যাখ্যান করলে ওর মনে বড়ই আঘাত দেওয়া হবে, ও হয়তো ভাববে বড়লোকদের মোটা মোটা টাকাই কেবল নিচ্ছি। এই সব নানা কথা ভেবে এই দান আমি গ্রহণ করেছি। আমার মনে হচ্ছে—ধনীদের কোটি কোটি টাকা থেকে, তাঁরা যে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেছেন তার চেয়ে ঐ গরীব মেয়েটির যথাসর্বস্ব তিন টাকার মুল্য অনেক বেশি।'

ভয় কাকে বলে নেতাজী তা জানেন না,—জীবনের কোনো প্রকার সুখ-সম্ভোগের জন্যও তিনি বিন্দুমাত্র লালায়িত ছিলেন না। কোনো দৈব-শক্তি রক্ষাকবচ দিয়ে যেন তাঁকে ঘিরে রেখে দিয়েছিলো। আমি বহুবার দেখেছি অন্যের জন্য তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছেন। এই সব দেখেছি বলেই আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে, তিনি মারা গেছেন। 'নেতাজী জিন্দাবাদ'।

জিয়াওয়াদীর অধিবাসী সকলেই ভারতীয়। এ জায়গাটা হচ্ছে ডুমরাও মহারাজের জায়গা। এখানে একটি বড় চিনির কল আছে। প্রায় আট-দশ মাইল জায়গা জুড়ে অনেকগুলি ছোট ছোট বস্তি আছে। অধিবাসীরা প্রায় সকলেই আরা জেলার লোক। প্রায় সকলেই গরীব। চাষ-আবাদ করে। দেশ থেকে নানাপ্রকার লোভ দেখিয়ে তাদের আনার পর তাদের কোনরূপ সুবিধা দেওয়া হয় না। কাজেই তারা দেশে যেমন জমিদারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হতো, এখানেও তাই হচ্ছে। এখানে এসে বসবাস শুরু করার পর দেশে যাওয়ার সুযোগ বিশেষ ঘটে না। অনেকেই আছে যাদের জন্ম এখানেই, আর যারা এ পর্যন্ত দেশের মুখও দেখেনি। প্রথম-প্রথম বিবাহ ও অন্য কাজে এরা দেশে যেতো, কিন্তু এখন এখানে লোকসংখ্যা এত বেশী হয়েছে যে, এখন আর দেশে যাবার দরকার হয় না। বর্তমানে পুরো জায়গাটি 'জয় হিন্দের' জমি নামে বিখ্যাত। তার কারণ, শোনা যায়, এ জমি সবই আজাদ হিন্দ্ গভর্নমেণ্টকে দান করা হয়েছে। এখানকার বস্তিগুলির নাম বেশির ভাগই ভারতীয়—যেমন রূপসাগর, গাজুগড়, হস্তিনাপুর, জয়নগর প্রভৃতি। আমি চিনির কল থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে চকোইন নামে একটি বস্তিতে আমার ঔষধপত্র নিয়ে থাকতাম।

আমরা এখানে আসার প্রায় একমাস আগে এখানকার চিনির কলের কাছাকাছি বোমা পড়ে। তাতে মিলের কিছু ক্ষতি হওয়াতে এখন মিল বন্ধ। মিলের জন্য এখানকার সব জমিতেই আখ লাগানো হয়। এবার মিল বন্ধ হওয়াতে চাষীরা নিজেরাই আখের রস বার করে তাই জাল দিয়ে গুড় তৈরী করছে। প্রত্যেক গ্রামেই দিন-রাত আখ-মাড়াই কল চলেছে ও গুড় তৈরী হচ্ছে।

মেমিওতে যে হাসপাতালটি কাজ করেছে, এখানেও সেই হাসপাতালটি কাজ করছে। এই হাসপাতালের কম্যাণ্ডিং মেজর খান। গাড়ুগড়ে সবচেয়ে বেশী রুগী রাখার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া রামনগর তেওয়ারী চকের দু'টি শাখাতেও প্রায় চার-পাঁচশো রুগী রাখার বন্দোবস্ত হয়েছে। সবসুদ্ধ এখানকার হাসপাতালে প্রায় এক হাজার রুগী। তাছাড়া যারা রেজিমেণ্টে আছে তাদের মধ্যেও অনেকেই বড় দুর্বল।

একদিন গাড়ুগড় হাসপাতালে বেড়াতে যাই। আমরা যখন ফ্রণ্টে যাই, মেজর খান অসুস্থ হয়ে রেঙ্গুনেই থাকেন। অনেকদিন পরে তাঁর সঙ্গে দেখা। আমরা যখন মান্দালয়ে তখন ক্যাপ্টেন মল্লিক রেঙ্গুনে বদলি হন। এখানে এসে দেখি, আবার এখানকার হাসপাতালে সার্জন হয়ে এসেছেন। এখানে এসে রেঙ্গুনের অনেক গল্প শোনা গেল।

জানুয়ারী মাসের তেইশ তারিখে রেঙ্গুনে বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে নেতাজীর জন্মোৎসব হয়। সেদিন রেঙ্গুনের সমুদয় ভারতীয় নেতাজীকে সোনা ও রূপা দিয়ে ওজন করে। এই যুদ্ধের বাজারে প্রায় দুশো বিশ পাউণ্ড সোনা-রূপা দান বড় সামান্য কথা নয়। তারপর রেঙ্গুনের ভারতীয় অধিবাসী যাদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ, প্রত্যেকে মাথা-পিছু এক গজ করে খদ্দরের কাপড় দান করে। তারপর তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষে 'বাহাদুর শাহ স্কোয়াড' নামে একটি ছোট্ট বাহিনী তৈরী হয়। এই ছোট্ট বাহিনীটির অন্য নাম হচ্ছে 'আত্মহত্যা বাহিনী'। জাপানীদের সেনাবাহিনীতে যেমন 'কামে কাজে' অর্থাৎ আত্মহত্যা বাহিনী আছে, এটিও সেইরূপ। এতে বেশ সুস্থ সবল ও উৎসাহী কয়েকটি যুবক তাদের শরীরের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বাক্ষর করে। যদিও জাতীয় বাহিনীর প্রত্যেকেই প্রাণ দানের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তবুও এই বাহিনীটি বিশেষভাবে গঠিত ও নেতাজীর জন্মোৎসবে রেঙ্গুনের ভারতীয়দের নেতাজীকে উপযুক্ত উপহার দান।

নেতাজী নিজে তাঁর জন্মোৎসবের পক্ষপাতী ছিলেন না। যখন এখানে সব কিছু ঠিক হয়, তখন তিনি বিশেষ কাজে জাপানে ছিলেন। ফিরে এসে দেখেন সব কিছু বন্দোবস্ত হয়ে গেছে—কাজেই দেশবাসীকে নিরুৎসাহ করে তিনি তাদের দুঃখিত করতে চাননি।

নেতাজীকে আমাদের দেশবাসী যে কতখানি শ্রদ্ধাভক্তি করে এ তারই একটি নিদর্শন। তখন টাকাকড়ি ও কাপড়ের বিশেষ দরকার। কাজেই প্রত্যেক ভারতীয় তাদের সর্বস্ব নেতাজীকে দান করেছেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য। হবিব, করিম, গণি, আদমজী প্রভৃতি রেঙ্গুনের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীরা তাঁদের কোটি কোটি টাকার ব্যবসা ও সম্পত্তি সবই দান করে ফকির হয়েছেন।

নেতাজী রেঙ্গুনে যখন ভারতের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহের কবরে তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেন, তখন তিনি হৃদয়াবেগ রুদ্ধ রাখতে পারেননি। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেন, "হে ভারতের শেষ স্বাধীন সম্রাট, আমি আজ দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি, আপনার এই দেহাবশেষ আমরা ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। তারপর যেখানে সমস্ত সম্রাটের দেহ সমাধিস্থ রয়েছে, সেইখানে আমরা আপনার এই দেহাবশেষও সমাধিস্থ করবো।" ভারতের শেষ স্বাধীন সম্রাটের প্রতি স্বাধীন ভারতের গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে আমাদের নেতাজীর এই শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁর মহান্ হৃদয় ও দেশপ্রেমের প্রকৃত পরিচয়।

ক্যাপ্টেন মল্লিকের মুখেই শুনলাম রেঙ্গুনে আমাদের হাসপাতালের উপর নিদারুণ ও হৃদয়হীন বিমানাক্রমণের প্রকৃত খবর। ফেব্রুয়ারী মাসের এগারো তারিখে ব্রিটিশের বহু বিমান, সংখ্যায় প্রায় ষাটখানা, ভীষণভাবে এই হাসপাতালটির উপর আক্রমণ চালায়। মিয়াং নামে জায়গাটি একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় সেদিনের আক্রমণে। এখানকার হাসপাতালটি বহুদিনের—এখানে আমাদের বহু রুগী থাকতো। একদিন হঠাৎ বিমানগুলি এসে আক্রমণ শুরু করে।

প্রথমে কয়েকটি বোমা পড়ার পর ধূলি ও ধোঁয়াতে একেবার সব জায়গা অন্ধকার হয়ে যায়। পাঁচ হাত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় না। রুগী ও ডাক্তাররা প্রত্যেকেই অসহায়ভাবে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছোটাছুটি করে। অনেকে ট্রেঞ্চে আশ্রয় নেয়। প্রথম বোমাবর্ষণের পর শুরু হ'ল পেট্রল ও আগুনে-বোমা। হাসপাতালের পাশে একটি পুকুর ছিল। আগুন দেখে অনেকেই জলের মধ্যে আশ্রয় নেয়। তারপর শুধু পেট্রল আর আগুন। সারা পুকুরে পেট্রল ছড়িয়ে পড়ে ও আগুন লাগে। আহতদের ভীষণ আর্তনাদ। ধূলি ধোঁয়া ও মানুষ পুড়ে যাওয়ার ভীষণ দুর্গন্ধে স্থানটি একেবারে শ্মশানে পরিণত হয়। কয়েক ঘণ্টাব্যাপী এই ভীষণ 'কারপেট বোম্বিং' চলে। চার-পাঁচ মাইল এলাকা জুড়ে শুধু ধ্বংসস্তূপ।

এই বিমানাক্রমণের খবরে নেতাজী বিশেষভাবে বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে আসার জন্য প্রস্তুত হন কিন্তু আক্রমণ এত ভীষণ ছিল যে, তখন পথে বার হওয়া অসম্ভব ছিল। আক্রমণ শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'মিয়াং'-এ এসে উপস্থিত হন। আহতদের বর্মা স্টেট হাসপাতালে পাঠানো হয়। তিনি নিজে সেখানে দাঁড়িয়ে সব কিছু বন্দোবস্ত করেন। সেখানে তখন তাঁর উপস্থিতি যেন দেবতা-দর্শনের মতো প্রত্যেকের প্রাণে সজীবতা এনে দিল। প্রায় দেড়শো থেকে দুশো রোগী মারা যায় এই বিমান আক্রমণে। হাসপাতালের উপর এই নৃশংস আক্রমণে রেঙ্গুনের প্রত্যেক ভারতীয় ও বর্মী বৃটিশের প্রতি বিশেষভাবে বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। পরে ভারতীয়দের এক সভাতে আবার দু'কোটি টাকা তুলে নূতন হাসপাতাল স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই আক্রমণের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসী পুনরায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

আহতরা বর্মা স্টেট হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর বর্মা গভর্নমেন্টের মন্ত্রীরা হাসপাতাল পরিদর্শন করে রুগীদের সব রকম

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেন। নেতাজী প্রতিদিন দু'বেলা হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে প্রত্যেক রুগীকে নিজে দেখতেন। তাদের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা হয়। এই দুর্দশা দেখে তিনি খুবই দুঃখিত হন। কিন্তু তিনি নিজে কোনও দিন কিছুমাত্র ভীত হননি। বিমান আক্রমণের সময় তিনি কদাচিৎ ট্রেঞ্চে যেতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'আমি যে মহৎ কাজে জীবন উৎসর্গ করেছি, তার জন্য ভগবান আমার সহায়, কাজেই বৃটিশের এমন কোনও গোলাগুলি তৈরী হয়নি, যার দ্বারা আমার মৃত্যু ঘটতে পারে। আমাকে হত্যা করার জন্য বৃটিশ এখানে পর্যন্ত গুপ্তঘাতক পাঠিয়েছে—তারা কয়েকবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে।' কী অসীম দেশভক্তি ছিল তার! হৃদয়ে কী অসীম বিশ্বাস তিনি পোষণ করতেন! তাঁর মতো মহান্ ব্যক্তিকে নেতারূপে পেয়ে ভারতবাসী ধন্য হয়েছে। তাঁর নিজের অসীম বিশ্বাস তিনি অপরের হৃদয়েও আরোপ করেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁর হৃদয়ে এত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি প্রায়ই বলতেন—

'The power which could not prevent me to come out of India, cannot prevent me to go back to India' অর্থাৎ "যে শক্তি ভারত থেকে আসার পথে আমাকে বাধা দিতে পারেনি সেই শক্তি আমাকে ভারতে ফিরে যাওয়ার পথেও বাধা দিতে পারে না।" তাঁর এই বাণী আমাদের সৈন্যদের কাছে দৈববাণীর মতোই ছিল। তাইতো প্রত্যেকের প্রাণে যে দেশপ্রেমের সঞ্চার হয়েছে যে অসীম বিশ্বাস তাদের হৃদয়ে এসেছে, তা নষ্ট হতে পারে না। নেতাজীর বাণী—এ যে দৈববাণী, নেতাজীর আদেশ—এ যে দেবতার আদেশ।

আমরা ফ্রণ্টে ছিলাম; কাজেই খবরের কাগজে সব খবর পেলেও আজ প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে সব খবর শুনে বুঝতে পারলাম, প্রকৃত ব্যাপারটা কত ভয়ঙ্কর। এই সমস্ত ঘটনার সময়ে ও পরে আমাদের

ঝাঁসিরাণী রেজিমেন্টের নার্সিং মেয়েরা যে বীরত্ব ও যোগ্যতা দেখিয়েছেন, তা প্রকৃতই প্রশংসার্হ। তাদের আপ্রাণ সেবাই আমাদের বহু রুগীকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। দেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধে এই দান চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে।

জিয়াওয়াদীতে বস্তির পাশে অনেকগুলি আমবাগান ছিল। আমরা তার মধ্যেই কুটীর বেঁধে বাস করতাম। প্রায় প্রত্যেক বস্তিতেই আমাদের পঞ্চাশ-ষাটজন করে লোক থাকতো। তার'পর বাগানে থাকাতে বিমান থেকে আমাদের কেউ দেখতে পেতো না। আমরা দিনের বেলা পথে বিশেষ চলাচল করতাম না। বেশির ভাগ বাইরের কাজই রাতে চলতো। গাহ্‌গড় হাসপাতালে আমার পুরাতন বন্ধু লেঃ অর্ধেন্দু মজুমদারও কাজ করতো। এখানকার 'এরিয়া কম্যাণ্ডার' কর্নেল পি. এন দত্ত। দু'নম্বর হাসপাতাল, যেটি মনেয়াতে কাজ করতো, তার এখন কাজ বন্ধ। এখানে আজাদ হিন্দ দলের বহু লোক ছিল। তাদের কাজ ছিল—গ্রামে গ্রামে ঘুরে টাটকা শাক-সবজি, ডিম ও দুধের ব্যবস্থা করা। এখানে প্রত্যেক গ্রামেই অনেক গরু ও মহিষ ছিল। রুগীদের জন্য প্রত্যহ অনেক দুধ কেনা হ'তো।

নদীর তীরে নালসিং নামে একটি গ্রাম ছিল। সেখানকার 'তাজি' অর্থাৎ সর্দারের সঙ্গে আমাদের বেশ জানাশোনা ছিল। সেখানে যাওয়ার জন্য সে আমাদের প্রায়ই নিমন্ত্রণ করতো। একদিন সন্ধ্যার পর আমরা প্রায় দশজন ডাক্তার সেখানে বনভোজনের জন্য যাত্রা করি। জ্যোৎস্না রাত্রিতে গরুর গাড়িতে করে গ্রামে পৌঁছলাম। সর্দার আমাদের জন্য সবকিছু বন্দোবস্ত করেছিল। আমরা রাতে সেখানে ঘুমালাম। সকালে নদীতে-ধরা টাটকা মাছ যথেষ্ট পাওয়া গেল। দলে আমরা প্রায় বেশির ভাগই ছিলাম বাঙালী। কাজেই টাটকা মাছ আমাদের কাছে পরম লোভনীয়। মাংস রাঁধলেন আমাদের কর্নেল গোস্বামী। সকলে মিলেমিশে আর সব রান্না করা হ'লো। খোলা পল্লীতে আমরা একসঙ্গে

বহুদিন পরে আবার একটি পিকনিক বিশেষভাবেই উপভোগ করলাম। ফিরে এলাম সন্ধ্যার একটু আগে। অবশ্য আসবার সময় কিছু মাছ আমরাও সংগ্রহ করে নিয়ে এলাম। রাতে তিওয়ারী চক্কে মেজর চক্রবর্তীর কাছে খাওয়ার পর্বটা শেষ করে যে যার নিজ নিজ ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

এমনিভাবেই এখানে দিন কাটছিল আমাদের। কয়েক ঘর বাঙালীও এখানে সপরিবারে বাস করতেন। এঁরা সকলেই আগে চিনির কলে কাজ করতেন। আমি যে গ্রামে থাকতাম তার কাছেই ছোট একটি নদী। নদীর ওপারে 'ফিউ' নামে একটি গ্রাম। এই গ্রামটিতে জাপানীদের অনেক রেশন ছিল। বৃটিশ এ খবর জানতে পারে। কাজেই রোজ তিন-চারবার করে এখানে বিমান আক্রমণ হ'তো। এই বিমান আক্রমণ এমন ধারাবাহিক কাজে পরিণত হয়েছিল যে, এদিকে বিমান দেখলেই আমরা জানতাম তারা 'ফিউ'-এর উপর আক্রমণ চালাবে।

তখন আমাদের ছ'নম্বর ডিভিসন পোকোকুর ওদিকে যুদ্ধ করছে। এদিকে আমাদের সৈন্যেরা যেভাবে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে জগতের ইতিহাসে তা' চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে। মেজর ধীলনের নেতৃত্বে নেহরু রেজিমেন্টের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ বৃটিশের পক্ষে এতটা ভীতির সঞ্চার করে যে তারা আমাদের সৈন্যদের দেখলেই 'চলো, দিল্লীওয়ালা আ গিয়া' বলে পালিয়ে যেতো। তারা বার বার নদী পার হওয়ার চেষ্টা করে—কিন্তু প্রতিবারেই আমাদের প্রচণ্ড আক্রমণে ব্যর্থ হয়।

সুন্দরম্ নামে একটি মাদ্রাজী ছেলে—কয়েকটি ভাষা বেশ সুন্দরভাবে বলতে পারতো। সে মাঝে মাঝে শত্রুদের শিবিরে গিয়ে গোপনে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করতো। একবার একটি গুর্খাবাহিনী তাকে ধরে ফেলে আর বলে, 'তুমি আমাদের পক্ষে যোগদান করে অপরপক্ষের সব খবর আমাদের জানাও।' সে অস্বীকার করলে তাকে হত্যা করার ভয় দেখানো হয়। সে বলে,

'আমি মুক্তি ফৌজের সেনা, মৃত্যুকে আমি মোটেই ভয় করি না।' তখন একজন গুর্খা তার হাতের একটি আঙুল কেটে তাকে ছেড়ে দেয়। সে আবার ফিরে আসে।

দু'নম্বর ডিভিসনের আরও একটি মাদ্রাজীর বীরত্বপূর্ণ কাহিনী আমরা শুনেছি। এই ছেলেটি যখন রণক্ষেত্রে এগিয়ে যায় তখন তার কাছে পায়ের বুট ছিল না। রণক্ষেত্রে পৌঁছানোর কিছু পর বুট, জামা-প্যান্ট সে পায়। এগুলি পাওয়ার পর সে খুব আনন্দিত হয় আর ভাবে যে, তার জন্যই বিশেষ করে নেতাজী এগুলি পাঠিয়েছেন। সে নূতন বুট ও জামা-প্যান্ট পরে একেবারে তাদের কম্যাণ্ডারের সামনে উপস্থিত হয় আর অনুরোধ করে যে, কাল যে দল আক্রমণের জন্য যাবে, তাকেও যেন সেই দলে পাঠানো হয়। কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলে যে, নেতাজী তাকে নূতন বুট পাঠিয়েছেন, কাজেই সেও নেতাজীকে যোগ্য সম্মান দেখাতে চায় তার নিজের কর্তব্য পূর্ণ করে। তাকে পরদিনের আক্রমণে পাঠানো হয় কিন্তু ফিরে আর সে আসেনি। এই ঘটনা থেকেই বুঝতে পারা যায় সিপাহীরা নেতাজীকে কতটা সম্মান করতো; তাঁর নাম নিয়ে কিভাবে হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ করতো; আমি বিশেষ দুঃখিত যে, এই বীরের নাম আমার স্মরণ নেই।

কর্নেল শাহনওয়াজের নেতৃত্বে দু'নম্বর ডিভিসন বিশেষ বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করলেও রিয়াজমদন, এম.এন.দে ও অন্য একজন অফিসার ভারতীয় বাহিনীর কলঙ্কস্বরূপ বৃটিশ পক্ষে যোগদান করে। নিতান্ত আশ্চর্য ও দুঃখের বিষয় যে, আজও ভারতবর্ষে মীরজাফর বা উমিচাঁদের অভাব হয় না। এদের পলায়নের সংবাদে নেতাজী বিশেষ দুঃখিত হন। এর কিছুদিন পরেই নেতাজীর একটি আদেশপত্র আসে। তাতে লেখা ছিল, "আমাদের কয়েকজন অফিসার বৃটিশ পক্ষে যোগ দিয়েছে। আমার সৈন্যদের কাছ থেকে আমি এইরূপ কাজ মোটেই প্রত্যাশা করিনি। আমি প্রথমে বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করিনি। জীবনে আমার অধিকাংশ সময়ই কারান্তরালে কেটেছে। সে

জীবন যে কতটা দুঃসহ তা আমি নিজে উপভোগ করেছি। সুতরাং আমার কোনও অফিসার বা সৈন্যকে আমি সেই দুঃসহ কষ্ট দিতে ইচ্ছুক ছিলাম না। কিন্তু বর্তমানে অবস্থার যেরূপ পরিবর্তন হচ্ছে তাতে বিশেষ দুঃখের সঙ্গেই আমাকে বিশেষভাবে কঠোরতা অবলম্বন করার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে। আমার বাহিনীতে আমি এমন কোন লোক চাই না, যারা সুযোগ পেলে অপর পক্ষে যোগদান করতে পারে। সুতরাং আমি জানাচ্ছি যে ভবিষ্যতে যাতে এরূপ ঘটনার পুনরাভিনয় না হতে পারে, তার জন্য সর্বপ্রকার কঠোরতা অবলম্বন করা হবে। আমার প্রকৃত দেশভক্ত সৈনিক ও অফিসাবদের জানাচ্ছি, তাঁরা যদি এমন কোনও সন্দেহভাজন লোককে দেখেন যে, অপব পক্ষে যোগদান কবতে পারে, তাহলে জানাবেন ব্যবস্থা হবে চরম শাস্তি—মৃত্যু। এই মৃত্যুদণ্ডেব জন্য কোনও আদালতের দরকার হবে না, যে-কোনও দেশভক্ত ঐরূপ সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে মারতে পারে। এই আদেশ প্রত্যেককে প্রত্যহ শুনানো হবে। তারপর দিন স্থির করে, যারা পালিয়েছে সেই সমস্ত লোকদের প্রকাশ্য সভায় নানাভাবে অপদস্থ করা হবে। তাদের প্রতিমূর্তি তৈরি করে তাতে আগুন দেওয়া প্রভৃতি নানাপ্রকাব আয়োজন হবে।”

নেতাজীর আদেশমতো নানাস্থানে পলাতক অফিসারদের খড়ের প্রতিমূর্তি তৈরি করে তাতে আগুন দেওয়া হয়। প্রত্যেককে বিশেষভাবে প্রতিদিন ‘রোল’ করে শুনানো হয় নেতাজীর এই আদেশ।

নেতাজী সুভাষ

মণি সান্যাল

নেতাজী সুভাষ আজ আমাদের কাছে শুধু একটি নাম নয় ; নেতাজী সুভাষ আজ আমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল আদর্শ।

পরাধীন ভারতের বন্ধন-মুক্তির সাধনায় অকুতোভয় আত্মাহুতি এই আদর্শের প্রথম কথা। সর্বপ্রকার শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম এই আদর্শের দ্বিতীয় কথা। দেশের বঞ্চিত মানুষের দল, দেশের আপামর জনসাধারণ হবে দেশের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী—এই বক্তব্য হ'ল এই আদর্শের শেষ কথা।

প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সাথে এই আদর্শের অমসৃণ বন্ধুর পথে এগিয়ে চলতে চলতে সুভাষচন্দ্র একদিন নেতাজীরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। বিদেশী শাসকশক্তির শ্যেনদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে পরাধীন ভারতের সীমানা ডিঙিয়ে, স্বাধীনতা সংগ্রামের যে নতুন রূপ তিনি সৃষ্টি করলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্য দিয়ে তা জাতির কাছে এক নতুন আহ্বানের দূত হিসাবে দেখা দিল। "Give me blood and I will give you Freedom"—এই আহ্বানেরই বাণীরূপ।

পরাধীনতাকে নেতাজী অন্যায় বলে মনে করতেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থাকে তিনি আরও অন্যায় বলে মনে করতেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণব্যবস্থাগুলিকে তিনি চরম অন্যায় বলে ঘৃণা করতেন। আর এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। অত্যাচারের সাথে আপস নয়, শোষণের সাথে কোন রফা নয়, পরাধীনতার বন্ধনের কোন স্বীকৃতি নয়—এই ছিল তাঁর জীবনের দৃপ্তবাণী। আর অন্যায়ের

হাত থেকে মুক্তি, অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি, বন্ধনের হাত থেকে মুক্তি ও শোষণের হাত থেকে মুক্তি - এই ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এই মুক্তি আসতে পারে একমাত্র জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়েই। শুধু বিদেশী শাসনের অবসান হলেই হবে না—দেশী-বিদেশী সর্বপ্রকার শোষণের অবসান হওয়া চাই। নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে নেবার সর্ব অধিকার এবং সর্ব সুযোগ জনসাধারণের থাকা চাই। সর্ব ক্ষমতার অধিকারী হয়েই তবে জনগণ এই সুযোগ পেতে পারে। তাই তিনি বার বার বলেছেন—আপামর জনগণের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিতে হবে।

আজ দেশের এক চরম ছুর্দিনে আমরা নেতাজীর কথা স্মরণ করছি। একদিকে পুঁজিবাদী শাসন-ব্যবস্থার চাপে জনসাধারণ চরম ছুঃখ ও দারিদ্র্যের কবলে মৃতপ্রায় জীবন যাপন করছে। আর অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী তার শোষণযন্ত্রকে আরও দৃঢ়ভাবে জনসাধারণের উপর স্থাপন করবার চক্রান্ত করছে। বিদেশী সাম্রাজ্য-বাদী শক্তিরাও নতুন করে সুযোগ খুঁজছে।

ভারতবর্ষের এমনি এক সংকটময় মুহূর্তে দেশের সমস্ত সংগ্রামী শক্তিগুলিকে সংহত করে এই সব চক্রান্তের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই-ই হবে নেতাজীর প্রতি সঠিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন। এবং সেই লড়াই লড়তে হবে ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না জনগণই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়। আসুন, সেই শপথই আজ আমরা গ্রহণ করি।

মাত্র পনরো মিনিটের জন্য

নরেন্দ্রনাথ সেন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানীরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃটিশ ও আমেরিকান অধিকৃত দেশগুলি দখল করে। বর্মা আর সিঙ্গাপুরে তারা বিস্তর ভারতীয় সৈন্যকে বন্দী করে। এইসব যুদ্ধবন্দীদের অধিকাংশই ছিল শিখ ও পাঠান।

এই যুদ্ধের বহু বছর পূর্বে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর দল দিল্লীতে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করে। বোমা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং রাসবিহারী বসু গোপনে জাপানে পালিয়ে যান। তিনি সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তথাপি সর্বদাই ভারতবর্ষের মুক্তির উপায় চিন্তা করতেন।

অবশেষে সুযোগ হ'ল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি বর্মায় ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে সৈন্যদল গঠন করলেন। তাদের সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের পরিকল্পনা করলেন। সুভাষ বসু তখন ইংরেজের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়িয়ে ভারতবর্ষ হতে স্থলপথে জার্মানীতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। রাসবিহারী সুভাষকে তাঁর গঠিত সৈন্যদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে আহ্বান করলেন। সুভাষও এমনই কোন সুযোগ খুঁজছিলেন। সানন্দে এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাবমেরিনযোগে সিঙ্গাপুরে এলেন; সেখান থেকে জাপান হয়ে বর্মায় এসে উক্ত সৈন্যদলের ভার গ্রহণ করলেন। এই সৈন্যদল 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' নামে পরিচিত হ'ল। তারাই সুভাষকে 'নেতাজী' আখ্যা দেয়। এই সৈন্যদল নেতাজীর আদেশে স্থলপথে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের উদ্দেশ্যে রওনা হয় ও আসামের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত কোহিমা ও মণিপুর আক্রমণ করে; ঘোর যুদ্ধের পর শত্রুকে পর্যুদস্ত করে 'আজাদ

হিন্দ ফৌজ' কোহিমা এবং ইম্ফল (মণিপুরের রাজধানী) অবরোধ করতে সক্ষম হয়। ঐ অঞ্চলে তারা ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে। তার পরবর্তী ঘটনার বিষয় তখন বিশেষ জানা যায়নি ; তবে শুনেছিলাম আজাদ হিন্দ্ ফৌজ পরাজিত হয়ে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা যে ভিন্নরূপ তা নীচের কাহিনী থেকে জানা যাবে।

মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সনে জাপানীরা কলকাতায় কয়েক স্থানে বোমা বর্ষণ করে। ফলে তখন বহুলোক প্রাণ-ভয়ে কলকাতা ও নিকটবর্তী সমস্ত অঞ্চল পরিত্যাগ করে চলে যায়। ঐ সময় আমার এক নিকটাত্মীয় ডাঃ জয়ন্ত সেন বরাহনগরে ডাক্তারী করতেন। ঐ অঞ্চল একরকম জনশূন্য হয়ে পড়ায় তাঁর ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। তখন তিনি অনন্যোপায় হয়ে সামরিক বিভাগে চাকরি নিয়ে যুদ্ধের কাজে চলে গেলেন। সৈন্যদলে যোগদান করলেও তিনি নিয়মিত চিঠিপত্র লিখতেন। কোথায় আছেন না-আছেন তার হদিস হ'তো না কিন্তু বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ থাকত। হঠাৎ ১৯৪৪ সনের এপ্রিল মাস থেকে দু'মাস যাবৎ তাঁর কোন চিঠিপত্র পাওয়া গেল না। বাড়িতে তাঁর মা ও অন্যান্য সকলে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। অকস্মাৎ ৭ই জুন টেলিফোনে খবর পেলাম তিনি ববাহনগরের বাড়িতে ফিরে এসেছেন। ঐ সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ আমি বরাহনগরে তাঁর বাড়ি গেলাম। কুশলাদি জানার পর আমি তাঁকে গত দু'মাস যাবৎ চিঠি না লিখবার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন যে, ইম্ফলে দু'মাস অবরুদ্ধ থাকায় তিনি চিঠি লিখতে পাবেননি। তখন আবার প্রশ্ন করলাম, তাহলে এখনই বা তিনি ফিরতে পারলেন কেমন করে? তিনি বললেন, যুদ্ধ ত শেষ হয়ে গেছে। ইম্ফল-কোহিমার সমস্ত বৃটিশবাহিনী জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তিনি আরও বললেন যে, ৫ই জুন প্রভাতে ৮টার সময় তাঁদের সৈন্যাধ্যক্ষ জানান, ঐদিন বেলা ১০টার সময় ইম্ফল ও কোহিমাস্থ সৈন্যবাহিনী একযোগে আত্মসমর্পণ করবে।

তিনি ইচ্ছা করেন না যে, ডাক্তাররাও তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধবন্দী হন। সেই জন্য তিনি তাঁদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার জন্য একটি বিমানের ব্যবস্থা করেছেন। ঐ বিমানটি সাড়ে আটটার সময় তাঁদের নিয়ে কুমিল্লা অভিমুখে রওনা হয়। কুমিল্লা পৌঁছেই তিনি প্রথম ট্রেনে কলকাতা আসেন।

এর কয়েকদিন পর খবরের কাগজে দেখলাম জাপানীরা ইম্ফল ও কোহিমায় পরাজিত হয়ে পশ্চাদপসরণ করেছে এবং ঐ অঞ্চল সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত হয়েছে। আমি এ সংবাদে অবাক হয়ে জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করলাম, যে সৈন্যবাহিনী তু'ঘণ্টা পরেই আত্মসমর্পণ করবে, তারা কিভাবে ঐ সময়ের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে? কিভাবেই বা যুদ্ধ করে জয়লাভ করে? তিনি নিজেও অবাক হন এবং এ কথার জবাব দিতে পারেন না।

এর প্রায় তু'বৎসর পরে আমার পরমবন্ধু গৌহাটির শ্রীকামাখ্যারাম বড়ুয়া চীফ্ জজ হয়ে ইম্ফলে যান। তাঁর অনুরোধে আমিও তখন ইম্ফলে বেড়াতে যাই। সেখানে যুদ্ধের বিষয়ে অনেক কথা শুনলাম জয়ন্তর কাছে। যা শুনেছিলাম সে সব ঘটনা আমি আমার বন্ধুকে বলায় তিনি প্রকৃত ঘটনা জানবার জন্য সচেষ্ট হন। কিন্তু যুদ্ধের সময় ইম্ফলে অবস্থানকারী একটি লোকও পাওয়া গেল না। অবশেষে ইম্ফল হতে তিন মাইল দূরে এক বিহারী ভদ্রলোকের সন্ধান পাওয়া গেল; তিনি যুদ্ধের সময় ইম্ফলে সৈন্যদের রসদ যোগাতেন। আমি ও আমার বন্ধু ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি বললেন ক্যাপ্টেন সেন যা বলেছেন সবই সত্য। তাঁরা সকলে ১০টার সময় আত্মসমর্পণ করবেন ঠিকই ছিল। ঐ উদ্দেশ্যে এমনকি শ্বেত-পতাকাও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ৯টা ৪৫ মিনিটের সময় কোহিমার সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট থেকে এক জরুরী বার্তা আসে—'ডোণ্ট সারেণ্ডার, এনিমি শোয়িং সাইনস্ অব্ রিট্রিট' (আত্মসমর্পণ ক'রো না, শত্রু পশ্চাদপসরণের চিহ্ন প্রকাশ করছে)। এর পরে বেলা ১০টা

১৫ মিনিটের সময় দেখা গেল সত্যই বিপক্ষের সৈন্যদল পশ্চাদপসরণ করছে। কাজেই আত্মসমর্পণের প্রয়োজন হ'ল না এবং ইম্ফলের অবরোধ উঠে গেল।

উক্ত ভদ্রলোক আরও জানান যে, এই ঘটনার কয়েকদিন পরে এক দীর্ঘাকৃতি, শীর্ণকায় সাধু তাঁর বাড়িতে আসেন এবং অত্যন্ত ক্ষুধার্ত বলে কিছু খেতে চান। তাঁকে চিঁড়ে-গুড় খেতে দেওয়া হয়। এই সাধুর হঠাৎ আগমনে ঐ ভদ্রলোকের সন্দেহ হয়। অনেক প্রশ্নের পর সাধু স্বীকার করেন যে, তিনি শিখ, আজাদ হিন্দ ফৌজে ছিলেন। বর্মা থেকে তাঁদের রসদ আসা বন্ধ হওয়ায় সাতদিন উপবাসী ছিলেন। পশ্চাদপসরণের সময় চলতে অক্ষম হওয়ায় তিনি দলভ্রষ্ট হন।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, যুদ্ধে পরাজয় নয়, খাদ্যাভাবই আজাদ হিন্দ ফৌজের পশ্চাদপসরণের কারণ। উভয় পক্ষই নিজেদের দুর্বলতা জানত কিন্তু অপর পক্ষের অবস্থা অবগত ছিল না। কাজেই এ একপ্রকার কাকতালীয় ব্যাপার হয়ে গেল। আজাদ হিন্দ ফৌজ যদি আর পনরো মিনিট অপেক্ষা করত তাহলে মণিপুর ও কোহিমার পতনের সঙ্গে সঙ্গে তারা সমগ্র আসাম ও বঙ্গদেশ দখল করতে পারত, কারণ ইংরেজদের পরবর্তী ঘাঁটি ছিল রাঁচিতে।

আমি ইম্ফলে প্রায় এক মাস ছিলাম। ফিরবার পথে পাহাড়ের গায়ে অনেক স্থানে লেখা দেখলাম—'গ্রেভইয়ার্ড আপহিল'—অর্থাৎ 'পাহাড়ের উপরে কবরস্থান'। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় আমরা 'মাও' নামক একস্থানের নিকট ৮ হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত এক ডাকবাংলোয় আশ্রয় নিলাম। সেখানে ডাকবাংলোর দেওয়ালে ঝুলানো কয়েকখানা কাঠের বোর্ডে আড়াইশো বৃটিশ ও আমেরিকান অফিসারের নাম লেখা ছিল। ঐ সব অফিসারেরা সকলেই ঐখানে আট দিনের যুদ্ধে নিহত হয়। আমরা অবাক হয়ে ভাবলাম, এমন একটা দুর্গম স্থানেই যদি এতগুলি অফিসার মারা যায় তবে সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রে সাধারণ সৈন্যসহ মৃতের সংখ্যা না জানি কত হবে।

অনুমান করতে কষ্ট নেই যে, স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করেই আজাদ হিন্দ ফৌজ ঐ স্থানে জয়লাভ করে।

জয়ন্ত আর একটা কথা বলেছিলেন যা গুরুত্বপূর্ণ। যখন তাঁরা ইম্ফলে ছ'মাস অবরুদ্ধ ছিলেন তখন খাবার টেবিলে অনেক গল্পগুজব হ'তো। আমেরিকান অফিসাররা বলতেন, ক্যাপ্টেন সেন, এখন তোমরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করো না কেন? এই তো তোমাদের সুবর্ণ সুযোগ। এর জন্য আমরা নিরপেক্ষ থাকব। আমরা সাহায্য না করলে ইংরেজ তোমাদের কিছুতেই বাধা দিতে পারবে না। কারণ এখন এরা নিঃস্ব।

লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের ঐতিহাসিক বিচারের পর শতাধিক অফিসার কলকাতায় আসেন। তাঁদের নিয়ে বেলগাছিয়া ময়দানে এক বিরাট সভা হয়। ঐ সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর জেনারেল ধীলন বলেন, আমরা ইম্ফল কোহিমায় এক মারাত্মক ভুল করেছিলাম। আমরা শত্রুকে অবরোধ করে আমাদের অমূল্য সময় ছ'মাস নষ্ট করেছিলাম। অবরোধ না করে ওদের পালাবার সুযোগ দিলে আমরা শত্রুকে পরাজিত করে দেশের স্বাধীনতা আনতে পারতাম।

কল্পনা করা যায় এমনটি ঘটলে বর্মায় জাপানীদের পরাজয়ের পর নেতাজী জাপান অভিমুখে রওনা না হয়ে ভারতবর্ষেই আসতেন। সুভাষচন্দ্রই হয়ত ভারতের জর্জ ওয়াশিংটন হতেন। যা ঘটল তা মাত্র ১৫ মিনিটের আগে-পরের জন্য। একেই বোধহয় বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

এই রচনাটি যাঁর লেখা তিনি বাংলাদেশের একজন কুশলী যন্ত্রবিদ এবং আচার্য জগদীশচন্দ্রের একজন প্রধান শিষ্য ও গবেষণা-সহকর্মী। প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা করেছেন। এই রচনাটিতে দেখা যায় তিনি একজন ঐতিহাসিকের মত সমগ্র বিষয়টি উদ্ধার করেছেন। ঘটনাটি নিছক সত্য।

ধন্য 'চন্দ্র বোস'　　　　　　　　　　　　　　অজিতকুমার তারণ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার কথা। আমি তখন গিয়েছি আরব মুল্লুকে। আমার সামরিক সঙ্গী-সাথীদের বিশেষ করে ক্যাপ্টেন ব্রাউন এবং সার্জেণ্ট মাইকেলকে নিয়ে বেশ আনন্দেই রয়েছি যুদ্ধের নানান আপদ-বিপদ, উদ্বেগ ও ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও। কারণ, আমার মতো ব্রাউন আর মাইকেলেরও যে রয়েছে ভ্রমণের প্রবল নেশা। সুযোগ পেলেই তিনজনে মিলে বেরিয়ে পড়ি অজানাকে জানবার উদ্দেশ্যে।

একবার আমরা বেরুলাম মরূদ্যান ভ্রমণে। উটে চড়ে। বেদুইনী পোশাক পরে। মাইকেল ও আমি সঙ্গে করে একজন দোভাষীকে নিতে চাওয়াতে ঘোর আপত্তি জানায় ব্রাউন "দোভাষীকে সঙ্গে নিয়ে আর কি হবে? তুমি যা আরবী জানো তাতেই চলবে। আর রাস্তা-ঘাটের ব্যাপারে তো উটের চালকই সাহায্য করতে পারবে। আমরা এবারে নতুন কিছু করবো। এ্যাডভেঞ্চার করবো। দোভাষী সঙ্গে থাকলে আর কোনো এ্যাড্‌ভেঞ্চারই হবে না। বুকে (বুকে সশব্দে হাত রেখে) সাহস রাখতে হয়। বুঝলে? তোমরা ভারতীয়রা দারুণ ভীতু লোক।"

"—তা তো বুঝলাম; কিন্তু কোনো অসুবিধেয় যদি পড়ে যাই, তখন?"

এখানে বলেই রাখছি ব্রাউনেরর বার বার 'এ্যাড্‌ভেঞ্চার" ব্যবহার করবার মুদ্রাদোষ থাকায় ওকে বলতাম "মিষ্টার এ্যাড্‌ভেঞ্চারার"।

আমাদের ভ্রমণের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে কয়েকটি মরূদ্যানে বেশ আনন্দেই কাটালাম। মাঝে মাঝে মনে পড়তো, "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন, চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন"।

তৃতীয় দিনেই পড়লাম মহা ফ্যাসাদে। একটা মরূদ্যানে পৌঁছে ওখানকার বাসিন্দাদের ফোটো ওঠাতে গিয়েই শুরু হ'ল যত সব ঝামেলা। ওখানকার বেদুইন এবং সুন্নেহী শ্রেণীর আরবীদের ভেতরে রয়েছে একটা কুসংস্কার। কারুর ফোটো ওঠালেই নাকি সে আর বেশিদিন বাঁচবে না! ...ওদের মধ্যে থেকে প্রায় দশ-পনেরোজন তেড়ে এল আমাদের মারতে। "রফিয়েক" অর্থাৎ বন্ধু বলে সম্বোধন করলে ওদেরও মনে উদয় হয় দয়ার, আমি তা জানতাম, তাই ওই মন্ত্রটি উচ্চারণ করে একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলাম খুব সহজেই। মাইকেল তখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ওদের হাতে কিছু কিছু পয়সা দিতে লাগল। ব্রাউন আমাদের উভয়কেই খুব তিরস্কার করতে লাগল ভীরুতার জন্য। এবং এ্যাড্‌ভেঞ্চার করবার জন্য ওর পিস্তলটি খাপ থেকে বার করে ধরল উঁচিয়ে। আর যায় কোথায়? ওর পেছন দিক থেকে এসে কয়েকজন বেদুইন ওকে বেদম মারধর করতে লাগল পাইকারী হারে। একজন ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিল পিস্তলটি। এ্যাড্‌ভেঞ্চারারের শরীরের কয়েকটি ক্ষতস্থান থেকে বেরুতে থাকে তাজা বৃটিশ রক্তধারা টপ্‌ টপ্‌ করে। আমরা তখন ওদের কাছে রীতিমত বন্দী। আমি দুরু দুরু বক্ষে ক্ষমা চেয়ে ওদের সঙ্গে একটা আপস মীমাংসার আলাপ-আলোচনা শুরু করি। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। ওরা কিছুতেই শান্ত হ'ল না। বরং স্থির করল আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য ও টাকা-পয়সা প্রভৃতি নিঃশেষে কেড়ে নেবে, তারপর তিন-জনকেই ইহজগতের মায়া থেকে মুক্ত করে দেবে চিরতরে।—"একে দেখে মনে হচ্ছে যেন ভারতবর্ষের হায়দরাবাদের লোক বলে এবং মুসলমান তো বটেই। নিশ্চয়ই মুসলমান।" আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে একজন বেদুইন। "—তাই তো মনে হচ্ছে, অনর্গল আরবীও যখন বলতে পারে। মুসলমান তো হবেই। এই সিস্‌মাক?" (অর্থাৎ তোমার নাম কি?) "—ইস্‌মি (আমার নাম) আবদুল

করিম তারণ, অবশ্য দেশের লোকেরা উচ্চারণ করে থাকে একটু অন্যভাবে'', কাতরকণ্ঠে জবাব দিই আমি, "দেশে আমার মা আছেন, আর আছে স্ত্রী-পুত্রাদি। আমায় প্রাণে মারলে বহু ক্ষতি হবে যে রফিয়েক (বন্ধু)।"

"—না, না। মায়া-দয়া আমাদের নেই। তোমাদের সব কয়টাকেই খুন করবো। এক্ষুণি।" ধ্বনিত হ'ল সমকণ্ঠে।

"—তোমাদের দেশের আবুল কালাম আজাদ আমাদের দেশের একজন মস্তবড়ো নেতা। তিনি খুবই বিদ্বান এবং ভারতবাসীদের বন্ধু ব্যক্তি।" "—এইচ্ হেদা ? মা আরেফ—এটা আবার কে ? চিনি না।"

আবার বলি, "বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ টেগোর, ভারতের সবচেয়ে বড় নেতা গান্ধী আর নেহরু, তাদের বিষয়ে তোমরা নিশ্চয়ই ওয়াকিবহাল। আমি তো ওই ভারতেরই লোক। ছেড়ে দাও দাতুভাইরা আমায়। আর কখনো তোমাদের অঞ্চলে আসবো না, ফোটোও তুলব না। ক্যামেরার নিকুচি করেছি।" ...হায় হায়! ওরা এ তিন-চারজনের একজনকেও চিনল না। ওঁদের নাম উল্লেখ করেও সুফল লাভের আশা তো দূরের কথা, আরবীদের রাগের মাত্রা যেন ধাপে ধাপে বেড়েই চললো। ইতিমধ্যে ব্রাউন ও মাইকেলের পোশাক-পরিচ্ছদ আর টাকা-পয়সা সবই গেছে। "মাই গড! মরবার আগে যে একটা সিগারেট টানবো তারও উপায় নেই। অল লষ্ট ? আচ্ছা মিষ্টার টারণ, তুমি তো এ্যাজাড, ট্যাগোর, গাণ্ডহী আর নেহরুর কথা ওঁদের কাছে খুবই বললে, এতে কিছু কাজ হ'ল ?" ব্রাউনের সকরুণ প্রশ্ন।

"—অন্ততঃপক্ষে আমাদের এ এ্যাড্ভেঞ্চারের কাহিনী লিখবার জন্য তোমার ফিরে যাবার প্রয়োজন আছে।" যোগ দিল মাইকেল।

"—আচ্ছা ভালো কথা, অত কিছু বলেও যখন কিছু লাভ হ'ল না তখন একবার আমাদের সুভাষচন্দ্র বোসের নামটা বলে দেখি না, যদি কিছু সুবিধে-টুবিধে হয়। বলা যায় না। "—রফিয়েক, আন্তা আরেফ সুভাষচন্দ্র বোস—বন্ধু, সুভাষচন্দ্র বোসকে জানো কি ?"

"—মা আরেফ—জানি না।" সমকণ্ঠের উত্তর। তৎক্ষণাৎই আবার কয়েকজন বলে উঠল যে তারা "চন্দ্র বোস"কে জানে, তিনি শুধু ভারতেরই নন, পৃথিবীর একজন সেরা বীরপুরুষ। তিনি বাঙালী এবং কালকুত্তার (কলকাতার) লোক। তাদের মধ্যে একজন লোক আমার পকেট থেকে নোটবুকটি নিল খুবই আগ্রহভরে। তাতে পেন্সিল দিয়ে নেতাজীর একটা সুন্দর ছবি এঁকে এনে দেখাল অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই। আমরা অবাক!

"—আরে আমি তো তাঁরই শাগিদ, চন্দ্র বোসের। আমিও বাঙালী, হায়দরাবাদী কেন হতে যাব? কোনোকালেই ছিলাম না। আগে সবই বলেছি প্রাণ বাঁচাবার জন্যে।"

"—তবে আর তোমাকে খুন করবো না, হাত মেলাও। তুমি মুক্তি পেয়ে গেলে, আর ভয় নেই। তোমার খিদে পেয়েছে বোধ হয়, কি খাবে বলো রফিয়েক। কিন্তু ইংরেজ দুটোকে শেষ করবোই। এরা তোমাদের শত্রু যে।"

"—ওরা ইংরেজ হলেও লোক হিসেবে খুবই ভাল। হঠাৎ না জেনে একটা ভুল করে বসেছে। দু'জনেই আমার বিশেষ বন্ধু। তাছাড়া বুঝতেই তো পারো, আমি একা ক্যাম্পে ফিরে গেলে বাকী ইংরেজরা আর আমায় আস্ত রাখবে না। তোমাদের হাত থেকে রেহাই পেলেও ওদের হাতে আমার প্রাণটা ···। তবে আমাকেও শেষ করো। শুনেছি এবং বইপত্রে পড়েছি তোমরা যেমনি নির্দয় তেমনি আবার দয়ালু এবং ক্ষমাশীলও। তাই এদের দু'জনেরও প্রাণ ভিক্ষে চাইছি।"

সঙ্গে সঙ্গেই ওদের দু'জনের সবকিছু জিনিসপত্রাদি ফিরে এল। মায় ব্রাউনের পিস্তলটি পর্যন্ত এবং কিছুক্ষণ পরে বেদুইনরা আমাদের খেতে দিল সুমিষ্ট তরমুজ, কলা এবং খেজুর প্রভৃতি। ফল খেতে খেতে ব্রাউন বললে, "দেখো কিছুদিন আগে যে সুভাষচন্দ্র বোসের ফোটো তোমার বাক্সে পেয়ে এবং তোমাকে আজাদ হিন্দ ফৌজ

রেডিও থেকে প্রচারিত যাঁর কথা শুনতে দেখে আমাদের বড়ো-কর্তারা তোমার কোর্ট-মার্শালের ব্যবস্থা করেছিলেন, আজ 'কি না তাঁরই নামে আমরা তিনজনেই বেঁচে গেলাম। ধন্য 'চন্দ্র বোস'।"

বেদুইনদের 'ক্ষেতের খাইরেক' (অশেষ ধন্যবাদ) বলে বিদায় নিলাম।

যুব-আন্দোলন ও নেতাজীর অবদান

বিভাস দে

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসেব পাতা ওল্টালে দেখতে পাওয়া যাবে ভারতীয় বিপ্লবী-যুবকদের এক অদম্য বিশ্বাস ছিল—অল্প সংখ্যক যুবকের চরম ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ-বরণের মধ্যে দিয়েই সশস্ত্র বিপ্লবের পথে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে—গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে প্রকাশ্য বিদ্রোহে ইংরেজকে দেশছাড়া করতে হবে। তখন দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ অজ্ঞ, রাজনৈতিক চেতনাহীন, নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম। তাই এই বিপ্লবী যুবকের দল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী—শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিপ্লবের বাণী প্রচার করতেন—আর তাদের বিপ্লবী করে গড়ে তুলতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। পুলিশের সদা-সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে সন্তর্পণে, সংগোপনে তাঁদের কাজ করে যেতে হ'তো, অনেক সময় অনভিজ্ঞ বা অনুপযুক্ত নেতৃত্ব থাকায় এইসব যুবকবৃন্দকে বিচ্ছিন্নভাবে লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হয়েছে। বিপ্লবীদের কাজ লোকচক্ষুর অন্তরালে চললেও যেখানেই মানুষের দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা, অভাব-অভিযোগ সেখানেই তাঁরা প্রকাশ্যে জনসাধারণের দুঃখমোচনে এগিয়ে এসেছেন। আর্তের সেবায়, দুর্গতদের দুঃখ নিবারণে, নির্যাতিত-নিপীড়িতের পক্ষ সমর্থনে তাঁরা সব সময় অগ্রসর হয়েছেন। সাধারণ যুবকের জীবনের কাম্য ছিল—একান্ত নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রব জীবন যাপন। কিন্তু বিপ্লবী যুবকদের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ পৃথক, প্রবৃত্তি আলাদা, কাম্যধন ভিন্নতর। তাদের জন্য—"নহে ঘরের মঙ্গল শঙ্খ", "নহে সন্ধ্যার দীপালোক", "নহে প্রেয়সীর অশ্রুসজল চোখ", "নহে শান্তি, নহে সে আরাম", "পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা", "পথে পথে গুপ্তসর্প

গূঢ়ফণা।" যে পথের পথিককে নিয়ত দুঃখ দহিতে হয়—দৈন্য বহিতে হয়—দণ্ড সহিতে হয়—বিপ্লবী যুবকেরা ছিলেন সেই পথের পথিক।

শাসন এবং শোষণের নামে একটা সমগ্র জাতিকে যারা জীর্ণ-শীর্ণ ও পঙ্গু করে ফেলেছিল—তাঁদের ন্যায্য অধিকার হতে করেছিল বঞ্চিত—তাঁদের মুক্তির পথ করেছে অবরুদ্ধ—মানুষের সমাজে, মানুষের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবার দাবি করেছে অস্বীকার—তাদের সমূলে উচ্ছেদ করাই ছিল এইসব বিপ্লবী যুবকদের জীবনের ব্রত। দেশবাসীর দুঃখ, দৈন্য, অপমান ও লাঞ্ছনা—এই সকলের মর্মবেদনা বিপ্লবী যুবকদের মর্মে মর্মে বিঁধেছিল—তাই তাঁরা ছাত্রসাধারণ ও যুবকদের মধ্যে তাঁদের এই মর্মবেদনা নিবেদন করেছিলেন। তাঁরা সুসংবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত দল গঠনে বহুবার সচেষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু সবসময়ে মনোমত দল গঠিত হয়নি বিভিন্ন কারণে। এইসব যুবকদের দাবি ছিল—"ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান চাই—মানুষের বাঁচার পথ খোলা চাই"। তাই তাঁরা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

সুন্দর-সুঠাম-স্বাস্থ্যবান যুবকের দল—জীবনের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হেলায় বিসর্জন দিয়ে যাঁরা চেয়েছিলেন স্বদেশের স্বাধীনতা—চেয়েছিলেন দেশের অগণিত নর-নারীর সুখ-সুবিধা—পুলিশের হাতে, কারা-প্রাচীরের অন্তরালে বিচারাধীন অবস্থায় তাঁদের অনেকেরই হ'লো জীবনান্ত। কোন তদন্ত হ'লো না—কোন কৈফিয়ৎ মিলল না। সেদিন স্বাধীনতার ভিৎ গড়তে এমনি বলিরই প্রয়োজন হয়েছিল। তাই "মহারাজা নন্দকুমার, বাহাদুর শাহ, তাঁতিয়া টোপী, সিপাহী যুদ্ধখ্যাত ২৩ বছরের তরুণী ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাই দত্ত, বাঘা যতীন, চিত্তপ্রিয়" প্রভৃতি যুবক-যুবতীর দল একে একে আত্মাহুতি দিলেন স্বাধীনতার বেদীমূলে।

ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে ভারতের দুর্ভাগ্যের কথা। 'বাংলার বুকেই নেমে এসেছে পরাধীনতার কালো ছায়া। বাংলার

প্রাণশক্তি নষ্ট করা হ'লো ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে। হেষ্টিংসের তাঁবেদারী না মানায় মহারাজা নন্দকুমারের হ'লো ফাঁসী। লোকের চোখ খুললো। দেখা দিলেন "ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রাণাডে, তায়েবজী" আরও কত মহাপুরুষ। এঁদের উদাত্ত আহ্বানে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে খান্ খান্ করে ফেলতে জেগে উঠলেন যুবকদল, উদাত্ত কণ্ঠে গাইলেন :

"ঐ শৃঙ্খল ছিঁড়ে বন্দী জীবন মুক্ত ধরণীতলে
জাগে, গণদেবতার অজেয় মন্ত্রবলে।"

অনুষ্ঠিত হ'লো "হিন্দুমেলা"। "বন্দেমাতরম" মন্ত্র দেশের যুবশক্তিকে পাগল করে তুললো। শঙ্কিত হলো সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ। দেশময় যে আঁধার পুঞ্জীভূত হয়েছিল নবজীবনের সৌরকর পরশে তা' যদি অপসৃত হয়—যদি হিমালয় থেকে কুমারিকা—গান্ধার থেকে চট্টল পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের যুবকেরা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে—তাহলে ছল-চাতুরীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইংরেজের এই সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তাই বৃটিশ রাজশক্তি কুলিশ-কঠোর-হস্তে কুঠার হানে ভারতের প্রাণশক্তি বাংলার বুকে—লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব এনে। সেদিন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক সুরেন্দ্রনাথের আহ্বানে লর্ড কার্জনের settled factকে unsettled করতে এগিয়ে এসেছিলেন বাঙালী যুবকের দল।

ভগীরথের মর্ত্যে গঙ্গা আনয়নের মত সেদিন কারা স্বাধীনতা চেতনার মরা গাঙে জোয়ার এনেছিল ?—তারাই তো আমাদের যুব-সমাজ। নেতাজীর কথায়—

"যাহা নূতন, যাহা সরস, যাহা অনাস্বাদিত—তাহার উপাসক যাহারা ; যাহারা এনে দেয় পুরাতনের মধ্যে নূতনকে, জড়ের মধ্যে চঞ্চলকে, প্রবীণের মধ্যে নবীনকে এবং বন্ধনের মধ্যে অসীম মুক্তিকে।"

যে যুবসমাজকে উদ্দীপ্ত করতে নজরুল লিখেছেন ঃ

"নবীন মন্ত্রে দানিতে দীক্ষা আসিতেছে ফাল্গুনী—
জাগোরে জোয়ান! ঘুমায়োনা ভুয়ো শান্তির বাণী শুনি।"

ভাবীকালের স্বামীজী বিবেকানন্দের উত্তরসাধক হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। যুবসমাজের প্রতি স্বামীজীর উদাত্ত আহ্বান ছিলো :— "আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া তোমরা কেবল মাত্র স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির আরাধনা কর ; অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয় বৎসর ভুলিলেও কোন ক্ষতি নাই।"

বাংলার যুবকেরা জ্বালিয়েছিল যে বিপ্লবের আগুন—ভারতের স্বদেশী আন্দোলন সেই আগুনের পরশে বন্ধন-মুক্তির আন্দোলন হয়ে উঠতে লাগলো। প্লেগ কমিশনার মিঃ ব্যাণ্ডের এবং পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ডের অত্যাচারে সকলে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না। এই অসন্তোষ-বহ্নিতে ঘৃতাহুতি দিল যুবক সুশীল সেনের প্রতি বেত্রাঘাতের আদেশে। সেইদিন যুবকেরা গুপ্ত সমিতিতে ঠিক করলে প্রতিশোধ নেওয়া হবে কিংসফোর্ডকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের ভার পড়লো যার উপর—তিনি যুবক ক্ষুদিরাম—স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম শহীদ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসর। জার্মানী তখন ইংরেজ সাম্রাজ্য ধ্বংস করবার জন্য বদ্ধপরিকর। সেই সময় বার্লিনে "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি" গড়ে তোলেন যিনি—তিনি তামিল যুবক চেম্পাকরমন। গদর দলের হরদয়াল, অধ্যাপক তারকনাথ দাস, বরকাতুল্লা, চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, হেরম্ব গুপ্ত, বীরেন্দ্র সরকার তাতে যোগ দিয়ে, জার্মান পররাষ্ট্র বিভাগের নানা কাজ নিয়ে আমেরিকা থেকে ভারতীয় যুবকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের আয়োজন করেছিলেন। ব্যাঙ্ককে গদর দলের শিখরা আর বাতাভিয়ার বাঙালী বিপ্লবী যুবকেরা সাঙহাইয়ের জার্মান কনসাল জেনারেলের নির্দ্দেশের অপেক্ষায় কাল গণনা করেছিলেন। কলকাতায় 'ওভারটুন হল্' বাড়ির নীচে অমরেন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় আর রাম মজুমদারের শ্রমজীবী সমবায় স্বদেশী কাপড়ের দোকানে ব্যবসায়ের ছলে চলেছিল ভারতীয় যুবকদের অস্ত্র আমদানির চেষ্টা। দিকে দিকে মাতৃভূমির বন্ধনমোচনের আয়োজন। সন্তানদল নিশিদিন ধরে তৈরি করেন পথঘাটের নকশা, সংগ্রহ করেন আত্ম-বলিদানে উৎসুক সৈনিকদল। প্রকাশ্যে চলে বৃটিশের সমরায়োজন, আর গোপনে অগ্রসর হয় ভারতের মুক্তিকামী যুবকদের ঐকান্তিক উদ্যোগ। 'রায় মঙ্গলের' অপার বারিধির দিকে অপলক চেয়ে প্রহরায় থাকেন যুবকের দল মাভেরিক জাহাজের সঙ্কেতের আশায়। মহালগ্ন বুঝি উত্তীর্ণ হয়ে যায় তাই বালেশ্বরে বুড়িবালামের তীরে নব ভারতের হলদিঘাট রচনা করতে যুবক যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁরা বাংলার যুবশ্রেণী—যাঁরা কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন :—Tell the people of Bengal that I and Chittapriya Roy sacrificed our lives in indicating the honour of Bengal.

* * * *

মুক্তির পথ কৃচ্ছ্রসাধনের পথ। গণ-আন্দোলনের ব্যর্থতায় দেশ যখন নৈরাশ্যের অন্ধকারে দিশেহারা, পরশাসনের গ্লানিতে বিদ্বিষ্ট মন যখন নিষ্ফল ক্ষোভে আর্তনাদ করছে, ঠিক সেই মুহূর্তে দেশবাসীর সামনে কর্ম ও ত্যাগের নূতন আদর্শ তুলে ধরবার জন্য ডাক পড়েছিল নূতন যুগের দধীচিদের। দুঃখ ও সাহসের পথে শুরু হ'লো অভিসার। অসহযোগ আন্দোলনোত্তর যুগের এই ধারায় প্রথম এলেন যুবক গোপীনাথ, তারপর যুবক যতীন দাস, ভগৎ সিং প্রভৃতি। ১৯৪২ সাল। আপস-আলোচনার অবসান ঘটেছে। ভারতীয় জনগণ বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারবাহী গর্দভের কাজ করতে নারাজ। সমগ্র দেশ গর্জন করে উঠলো—"ছাড়, ছাড়, ভারত ছাড়।" দল নেই—নেতারা কারারুদ্ধ কিন্তু জনগণ জাগ্রত। যুবকদের নেতৃত্বে সেদিনের ৪২-এর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন দুর্বার হয়ে ওঠে। আন্দোলন

পরিচালনা করতে গিয়ে গুলির আঘাতে মৃত্যুবরণ করলেন আসামের দরং জেলার যুবতী কনকলতা।

*　　*　　*　　*

১৯৪৬ সাল। কলকাতার নাগরিকেরা পথে এসে জড়ো হয়েছে। স্কুল-কলেজ শূন্য করে পার্কে পার্কে জমায়েত হয়েছে যুবক-যুবতীর দল। আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবিতে সারা দেশ চঞ্চল। তারা জেনেছে নিরুদ্দিষ্ট নেতার সন্ধান:

"বিরাট কালের অজ্ঞাতবাস ভেদিয়া পার্থ জাগে,
গাণ্ডীব ধনু রাঙিয়া উঠিল লক্ষ লাক্ষারাগে!"

—তারা জেনেছে ভারতের বীর সন্তানেরা দেশের আজাদীর জন্য হাজার হাজার মাইল দূরে বৃটিশের তাঁবু ছিঁড়ে ফেলে আজাদ হিন্দ সরকার ঘোষণা করেছিলেন, স্বদেশের মাটির বুকে লাল রক্তের ছাপ রেখে দিয়েছিলেন। নিরুদ্দিষ্ট নেতার আহ্বানে মৃতকল্প দেশ ও জাতি যেন সোনার কাঠির পরশে জেগে উঠলো।

"সেই নেতাজী ডাক দিল রে, দিল প্রাণের দোল,
সেই দোলাতে কণ্ঠে তাদের স্বাধীনতার বোল্।
বঙ্গমাতা দেখলো চেয়ে ছুটছে ছেলে-মেয়ে
হাস্য-মুখে গর্ব-ভরে প্রাণ সঁপিতে ধেয়ে।
গুলির মুখে এগিয়ে গেল বীর কিশোরের দল।
নাই হাতিয়ার, কেবল বুকে তেজ ছিল সম্বল।"

*　　*　　*　　*

১৯০৫ সালের জাতীয় আন্দোলনে—মহামতি তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে—রাউলাট আইনের প্রতিবাদে—রডা কোম্পানীর মশার পিস্তল অপহরণ ষড়যন্ত্রে—সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সাইমন কমিশন বর্জন আন্দোলনে বা অন্ধকূপহত্যার মিথ্যা কলঙ্ক-ভিত্তি-স্তম্ভ অপসারণের দাবিতে বা নৌ-বিদ্রোহে—আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি-আন্দোলনে—রসিদ আলি আর ভিয়েৎনাম দিবসে বিপ্লবের সাথী হিসাবে যুবকেরাই

এগিয়ে এসেছেন সবার আগে। বুক পেতে আঘাত নিয়েছেন আর বুকের রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছেন এই শহরের রাজপথ। তাই পথের প্রান্তে এসে ভুলতে পারি না আমরা তাঁদের ত্যাগের কথা। দেশের মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘদিন গভীরভাবে যুক্ত থেকে নেতাজী সুভাষ বুঝেছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের যুবক ও ছাত্রশ্রেণীর স্থান বড় কম নয়। তিনি স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন—

"ধ্বংসের অথবা সৃষ্টির যেখানে প্রয়োজন, সেখানে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, যুবকদের উপর নির্ভর করিতে হইবে, তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে, তাহাদের হাতে ক্ষমতা ও দায়িত্ব তুলিয়া দিতে হইবে।"

সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল ভারতের রাজনীতিতে যুবসমাজের যোগদান যতই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে ততই শাসকশক্তির শেষ-দিন ঘনিয়ে আসবে। সেজন্য আজ থেকে ৩৫ বছর আগে ইতিহাসের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন যুব-লীগের। তাঁর মতে—

'তরুণ প্রাণ কখনও বর্তমানকে, বাস্তবকে চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। বিশেষতঃ যেখানে সে বর্তমানের মধ্যে, বাস্তবের মধ্যে অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার দেখিতে পায় সেখানে তাহার সমস্ত প্রাণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে—সে ঐ অবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন করিতে সাহসী হয়। যুব-আন্দোলনের উৎপত্তি প্রবল অসন্তোষ হইতে—ইহার উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে নূতন আদর্শে নূতনভাবে গড়িয়া তোলা। সুতরাং আদর্শবাদই যুব-আন্দোলনের প্রাণ।"

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সেদিন সংস্কারবাদের পঙ্কিল আবর্তে ডুবে ছিল—জাতির মুক্তি-আন্দোলন সফল করতে হলে যে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী ও বলিষ্ঠ সাংগঠনিক ক্ষমতা প্রয়োজন তা সেদিন আপস-ধর্মাবলম্বী কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের ছিল না—বৃটিশের সঙ্গে আপস রফাই তাঁদের ছিল কাম্য। সেদিনের ভ্রান্ত নেতৃত্বের হাত থেকে যুবশ্রেণীকে

মুক্ত করে—তাঁদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাকে সঙ্ঘবদ্ধ করে বিপ্লবের পথে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি সমবেত যুব-সমাজকে আহ্বান করেছিলেন যুব-লীগের পতাকাতলে। সেদিনের জাতীয় আন্দোলনে নেতাজী এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত যুব-লীগ দেশকে যে নির্ভুল নেতৃত্ব দিয়েছিল—নিখিল ভারত যুব-লীগের প্রথম সাধারণ সম্পাদক শহীদ ভগৎ সিং-এর মৃত্যবরণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার জন্য চরম ত্যাগ স্বীকারের যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন—তা বোধহয় নতুন করে জানাবার প্রয়োজন নেই।

সুভাষচন্দ্র ও যোগী বরদাচরণ

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

...কংগ্রেসের সভাপতি-পদ ত্যাগ সুভাষচন্দ্রের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। সেদিন সুভাষচন্দ্রের জীবনের একটি অধ্যায় শেষ হইয়া নূতন আর এক একটি অধ্যায়ের সূচনা জীবন-বিধাতা নিঃশব্দে অলক্ষ্যে করিয়া থাকেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে চালিত সমগ্র কংগ্রেস-শক্তি সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে নূতন কর্মপন্থা নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র সাতিশয় কর্মব্যস্ত, সেই সময়ে লালগোলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় বরদাচরণ মজুমদার গ্রীষ্মের ছুটিতে কলিকাতায় আসেন। শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার রায় তাঁহার এক পুস্তকে এই মহাযোগীর বিবরণ কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শোনা যায় যে, শ্রীঅরবিন্দ বরদাবাবু সম্বন্ধে নাকি মন্তব্য করিয়াছিলেন, The greatest yogi of modern Bengal. এখানে উল্লেখ থাকে যে বরদাবাবুর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের কোনোদিন চাক্ষুষ দেখা বা পত্রেও আলাপ হয় নাই। কলিকাতায় আসিয়া বরদাবাবু সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একবার দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সমস্ত জরুরী কাজ ফেলিয়া সুভাষচন্দ্র একদিন সকাল আটটার সময় বরদাবাবুর নিকট উপস্থিত হম। তারিখটি হইল ১৯৩৯ সালের ১২ই জুন, সোমবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬ সাল।

সুভাষচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া বরদাবাবু একটি ঘরে প্রবেশ করেন, বরদাবাবু সেই সময়ে মোহিনীমোহন রোডে এক বাড়িতে অবস্থান করিতেছিলেন।

ঘরে ঢুকিবার সময় বরদাবাবু বলেন, 'আমি দরজা না খুললে দরজায় কেউ ধাক্কা দিও না।'

আড়াই ঘণ্টা পরে বন্ধ দরজা খুলিয়া সুভাষচন্দ্রকে লইয়া বরদাবাবু

বাহির হন, দেখা যায় যে সুভাষচন্দ্রের সারা মুখ অস্বাভাবিক লাল ; চোখ-মুখ দেখিয়া মনে হয় যেন তিনি নেশা করিয়াছেন, পদক্ষেপ স্বাভাবিক নহে, একটু যেন টলিতেছেন।

সুভাষচন্দ্রকে তাঁর গাড়িতে উঠাইয়া দেওয়া হইল, নিঃশব্দে তিনি স্থানত্যাগ করেন। বুঝিতে কষ্ট হইল না যে, কথা বলিবার মত মনের অবস্থা তাঁব তখন ছিল না। ইহা আমার শোনা কথা নয়, নিজে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

পরদিবস সন্ধ্যার সময় বরদাবাবুর নিকট উপস্থিত হইতেই তিনি বলিলেন, 'ভায়া, সুভাষবাবু আজও এসেছিলেন, সওয়া দু'ঘণ্টা কাটিয়ে গেছেন।'

শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। কারণ পরদিন তিনি আসিবেন এমন কথা তিনি বলেন নাই। তাঁর সঙ্গে যে কথা হইয়াছিল তাহাতে একদিন দেখা করার কথাই হইয়াছিল। তা' ছাড়া, পরদিন বিশেষ কাজে সুভাষচন্দ্রের কলিকাতার বাহিরে যাওযার ব্যবস্থা সমস্ত ঠিকঠাক হইয়াছিল।

মাত্র আমরা জনকতক লোক সেখানে ছিলাম, বরদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যাপার কি বলুন তো ?'

তিনি শান্ত সুরে জবাব দিলেন, 'সব কথা বলা সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, সুভাষবাবু প্রথমে আশ্চর্য হয়ে যান, জিজ্ঞাসা করেন কেমন করে এসব জানলেন ?—তাঁব অতীত জীবনটাই সুভাষবাবুব নিকট খুলে ধরেছিলাম। যে কথা তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি জানেন না, তাঁর জীবনের তেমন কথাও কয়েকটি বলেছিলাম।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাঁর অতীত জীবনই শুধু দেখলেন ? ভবিষ্যতের কথা কিছু বললেন না ?'

পূর্ববৎ শান্ত সুরেই বরদাবাবু উত্তব দিলেন, 'আগেই বলেছি যে, সব কথ বলা চলবে না।'

বুঝিলাম যে, বরদাবাবু এবং সুভাষবাবুর মধ্যে কি ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা চিরকালই গোপন থাকিবে। তবু জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সুভাষবাবু আজ আবার এলেন কেন ?'

এ প্রশ্নের জবাব বরদাবাবু দিলেন, বলিলেন, 'আজ তাঁকে যোগের বিশেষ প্রক্রিয়া (ক্রিয়াযোগ) বলে দিলাম। ধ্যানে বসিয়েছিলাম, অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ ছিলেন।'

উৎসাহিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, 'কেমন দেখলেন ?'

এবার বরদাবাবুও একটু উৎসাহ লইয়া উত্তর দিলেন, 'মহাক্ষত্রিয়। যদি ব্রাহ্মণের দৃষ্টি খোলে, তবে অঘটন ঘটাবে।'

ব্রাহ্মণের দৃষ্টি বলিতে যোগীর মুক্তদৃষ্টিই বরদাবাবু বুঝাইয়াছিলেন।

জীবনের একটি চরমক্ষণেই এই মহাযোগীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। এই সাক্ষাৎকারের পর হইতেই সুভাষচন্দ্রের মধ্যে নেতাজীর প্রকৃত জাগরণ আরম্ভ হয় এবং সুভাষচন্দ্র নিজের জীবনের প্রকৃত মিশন সম্বন্ধে সম্যক সচেতন হন—তাঁহার পরবর্তী জীবনই ইহার প্রমাণ।

বরদাবাবু বলিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণের দৃষ্টি খুলিলে তিনি অঘটন ঘটাইবেন। অঘটন সুভাষবাবু ঘটাইয়াছেন, কিন্তু যোগীর তৃতীয় নেত্র তাঁর খুলিয়াছিল কি ?…

'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ'—ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই হ'ল তপঃ-সাধনা। সেই প্রথায় সুভাষচন্দ্রকেও বিদ্যাধ্যয়ন-তপস্যায় ব্রতী হতে হয়েছিল, আর সে তপস্যায় তাঁর একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সীমা ছিল না। সে তপস্যা সার্থকতার বিপুল সম্ভাবনা জাগিয়েছিল সুভাষচন্দ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির তেজে। তিনি তাতেও কিন্তু মনে তৃপ্তি পাননি—সব সময় তিনি আকুল—মন যেন তাঁর আরও কিছু চায়—কি যে চায়, তা যেন ঠিক উপলব্ধি করতে পারতেন না তিনি।

কটকে কৃতী পিতার স্নেহাশ্রয়ে এবং মায়ের আদরের নীড়ে থেকে সুভাষচন্দ্র সেখানকার স্কুল থেকেই দ্বিতীয় বিভাগে সসম্মানে ম্যাট্রিক পাস করেন। এই সময়ই বাংলার বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন এবং তাঁর জীবনকথা ও বাণী সকলের অন্তরালে তাঁর মনকে এক নব সেবাধর্মে দীক্ষিত করে তোলে। পিতা তখন তাঁকে পাঠালেন কলকাতায় শ্রেষ্ঠ বিদ্যামন্দির প্রেসিডেন্সি কলেজে বিদ্যাধ্যয়নের জন্য। লেখাপড়া চলতে লাগলো, মনের মতো সঙ্গীও জুটলো। এইসব সঙ্গীদের সাথে প্রায়ই তাঁর কথা হ'তো—পরীক্ষা-পাসের পর কী? হয় বড় চাকুরি, না হয় ব্যারিস্টারি-ওকালতি কিংবা ডাক্তারি অর্থাৎ টাকা রোজগার...কিন্তু তাতেই কি জীবনের সার্থকতা! তার চেয়ে দেশের সেবা—অনাথ, আর্ত, গরীব-দুঃখীকে দেখা এবং ধর্ম-সাধনা করব আমরা। সুভাষচন্দ্র শুধু এই আলোচনা করেই ক্ষান্ত থাকতে পারলেন না। মনের অশান্তি তাঁর বাড়লো—এক নতুন শক্তি যেন তাঁকে আকর্ষণ করতে লাগলো। অবশেষে একদিন তিনি সন্ন্যাসী হলেন—পরনে গৈরিকবাস ও সর্ববিষয়ে কৃচ্ছ্রতাসাধন।

কিন্তু গুরু চাই—যিনি দেবেন তাঁকে সত্যিকারের পথের সন্ধান, তাঁর মনের অশান্তি করবেন দূর। গুরুর সন্ধানে তিনি তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করলেন—কত গিরি-পর্বতে গেলেন—হরিদ্বার, লছমনঝোলা, বৃন্দাবন, মথুরা, দিল্লী, আগ্রা, বেনারস প্রভৃতি স্থান ঘুরে কোথাও মনের মতো গুরুর সন্ধান পেলেন না। যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর নিকট তাঁকে কর্মযোগের দীক্ষা নিতে হয়েছিল—সে গুরু তখন কলকাতার প্রধান বিচারালয়ে রাজসিক অর্থ-সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। তাই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে আবার লেখাপড়ায় মন দিলেন এবং ভালভাবেই ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাস করলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ পড়তে লাগলেন। লেখাপড়ায় খুব অনুরাগ, সতীর্থরাও তাঁকে ভালবাসেন। সহসা এই সময়কার একটি ঘটনা তাঁকে কলকাতায়, বিশেষ করে ছাত্রমহলে সুপরিচিত করে দিল—এমন কি, সেই ঘটনা তাঁর নিজের জীবনেও একটা স্থায়ী এবং গভীর প্রভাব রেখে গেল। কলেজের ইংরেজ অধ্যাপক মিঃ ওটেন শাসকের জাতি তিনি, এদেশবাসীকে যেন মানুষ বলেই গ্রাহ্য করতে চান না—তারা যেন ক্ষুদ্র কীটাণু-কীট। ক্লাসে এলে তাঁর সে অবজ্ঞা প্রায় প্রতিদিনই প্রকাশ পেতো। একদিন মিঃ ওটেন খুব বেশি অকথা-কুকথা বলায় ছাত্রেরা করলো ধর্মঘট—যার নেতা ছিলেন সুভাষচন্দ্র। তিনি বললেন—"এ অপমান সহ্য করলে মানুষ বলে পরিচয় দেবার আর আমাদের কিছু থাকবে না।" প্রিন্সিপাল জেমস সাহেবের মধ্যস্থতায় দু'পক্ষের ক্ষমা প্রার্থনায় সে গোলযোগ মিটল। কিন্তু কতদিন! কিছুদিন যেতে-না-যেতেই মিঃ ওটেন আবার নিজরূপে প্রকাশ পেতে লাগলেন। বাঙালী জাতিকে অকথা-কুকথা বলে আবার একদিন দিলেন গালাগালি। যে বাংলাদেশে বসে, বাঙালীর টাকায় উদর-পূর্তি, বিলাস-ব্যসন ইত্যাদি, সেই বাঙালীর নিন্দা সুভাষচন্দ্র সহ্য করতে পারলেন না। অধ্যাপক ওটেনকে তাঁর ইতর স্পর্ধার উপযুক্ত জবাব দিলেন।

বাঙালীর ছেলে—সে তোলে সাহেবের গায়ে হাত! অধ্যাপক ওটেনকে কে যে মেরেছে, তা এখনও প্রকাশ পায়নি, অথচ বিনা-বিচারে শাস্তি ভোগ করেছেন সুভাষচন্দ্র। মানুষকে, বিশেষ করে গুরুস্থানীয় ব্যক্তিকে প্রহার করা যে অত্যন্ত গর্হিত, এ-বিষয়ে কোন মতদ্বৈধও থাকতে পারে না। তাহলেও বিশ্বের কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, যা ব্যক্তিনির্বিশেষে খাটে—কেউ যদি অপরকে বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা করে, তাহলে অপরেও তাকে বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা করবে। এমন কি, কেউ যদি গায়ের জোরে তাল ঠুকে মাথা দিয়ে দেয়াল ভাঙতে চায়, নির্জীব দেয়ালও তার মাথা ভাঙতে চেষ্টা করে। কেউ যদি প্রতিধ্বনিকে বলে—'তুই বর্বর', প্রতিধ্বনিও তাকে বলে—'তুই বর্বর'। বিশ্বে এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যে নিয়ম আছে, তার হাত থেকে কারুর নিষ্কৃতি নেই। অধ্যাপক ওটেন নিজেই নিজেকে এই নিয়মের অধীন করে ফেলেছিলেন। শিষ্যের যে গুরুকে ভক্তি করা উচিত, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু গুরুর পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিটি যতই অপদার্থ, অভদ্র বা দুষ্ট হোক—তাঁকে ভক্তি করে তাঁর বাধ্য থাক, এ অতি উচ্চধরনের উপদেশ হলেও—সেক্ষেত্রে ভক্তি ও বাধ্যতা কি স্বাভাবিক? এক পক্ষের আচরণ ও মনোভাব যদি গুরুর মত না হয়, তথাপিও অন্য পক্ষের আচরণ শিষ্যের মত হবে—এটা কি আশা করা যায়? মোট কথা, ইংরেজ অধ্যাপক যদি নিজেকে উৎকৃষ্ট ও প্রভু জাতীয় এবং ছাত্রকে নিকৃষ্ট ও দাস-জাতীয় বলে মনে করেন- তাহলে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক যথাযোগ্য হতে পারে না। তাই সুভাষচন্দ্রের সজীব মন ও সচেতন ব্যক্তিস্বভয়ে অসাড়তা অবলম্বন না করে এই অবমাননার প্রতিবিধানের জন্যই রুখে দাঁড়িয়েছিল।

বিশ্বে যে ঘাত-প্রতিঘাত আছে, মানুষের ঝগড়া-বিবাদেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। অসভ্য সমাজে বা অসুসভ্যভাবে শাসিত দেশে একজন যদি আর একজনকে প্রহার বা অপমান করে—তাহলে

আক্রান্ত বা অপমানিত ব্যক্তিও প্রহার বা অপমান করে তার প্রতিশোধ নেয়। কিন্তু এটা কি বাঞ্ছনীয়? সভ্য সমাজে বা উন্নত প্রণালীতে শাসিত দেশে, আইনই মাঝখানে দাঁড়িয়ে আঘাতের প্রতিঘাত করার দায়িত্ব বহন করে—এটাই বাঞ্ছনীয় এবং এই জন্যেই আইনের, বিচারকের বা শাসনকর্তার সমদর্শী হওয়া প্রয়োজন। আইনের চক্ষে - শুধু কাগজে-কমলেই নয়; মাঠে ঘাটে, রাস্তায়, রেলগাড়িতে অফিস-আদালতে, কল-কারখানায়, স্কুল-কলেজে সর্বত্রই সকলের সমান ব্যবহার পাওয়া দরকার। সুতরাং বিজ্ঞ ও বিবেচক নেতৃবৃন্দ ও রাজনীতিবিদরা এই সমস্ত বিষয়কে দৃষ্টিপথে রেখেই এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন, যার ফলে ক্রমান্বয়েই ব্যক্তিগত প্রতিশোধের অভ্যাস ও প্রবৃত্তি কমে গিয়ে তার স্থানে আইন-নির্দিষ্ট প্রতিবিধান ও প্রতিঘাত প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব আইন যেখানে অ-পক্ষপাতের প্রতিবিধানের ভার নেয়—সেইটেই আদর্শ দেশ, জাতি ও সমাজ। এই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টিত হওয়া সর্বত্রই বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিগত প্রতিশোধস্পৃহা, গুপ্ত আক্রমণ ও আঘাত করে ভয়ে ভয়ে থাকাটা মনুষ্যত্ব বিকাশেরও অন্তরায়—অতএব অতীব গর্হিত। এই সমস্ত অসঙ্গতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধেই ছিল সুভাষচন্দ্রের প্রতিবাদ।

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল যখন সুভাষচন্দ্রকে ডেকে গর্জন করে বললেন—কলেজের সমস্ত ছেলের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে উচ্ছৃঙ্খল, তাই কলেজ থেকে তোমাকে বিতাড়িত (রাস্টিকেট) করা হ'ল, সুভাষচন্দ্র কোন কথা না বলে স্বচ্ছন্দচিত্তেই কলেজ ত্যাগ করে চলে এলেন।

এই ঘটনার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একচ্ছত্র সম্রাট স্যার আশুতোষ বুঝলেন—এ ছেলে তো নোট মুখস্থ করা নির্জীব প্রাণী নয়। এর আছে মন, সজীব মন, সে মনে আছে তেজ—এ মানুষ। কিছুদিনের মধ্যেই ছাত্রবন্ধু আশুতোষের সহায়তায় সুভাষচন্দ্র আবার

কলেজে পড়ার অনুমতি পেলেন এবং স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হয়ে বি. এ পড়া শুরু করলেন। কিন্তু এই ঘটনা একদিন যেমন সুভাষচন্দ্রকে কলকাতার ছাত্র ও উচ্চ মহলে সুপরিচিত করে দিল, আর একদিকে তিনি পেলেন জীবনকে সার্থক করে তোলবার পথ-নির্দেশ। এই ঘটনা সম্পর্কে পরে সুভাষচন্দ্র নিজেই বলেছেন—"সদাচরণের দিক থেকে বিচার করলে আমাব বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন নিষ্কলঙ্ক নয়। সেদিনের কথা এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে, যেদিন কলেজের অধ্যক্ষ ডেকে কলেজ থেকে আমাকে 'সাসপেণ্ড' করা হ'ল বলে আদেশ জানালেন। তাঁর সেদিনের কথাগুলি এখনো আমার কানে বাজছে—'কলেজের সমস্ত ছেলেদের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে উচ্ছৃঙ্খল।' সেদিনটা ছিল সত্যিই আমার জীবনের একটা স্মরণীয দিন। আমার জীবনের অন্য সব আনন্দ নিষ্প্রভ হয়ে যায়, আমার জীবনে এই প্রথম নীতি এবং স্বাদেশিকতার বাস্তব ক্ষেত্রে কঠোর পরীক্ষা হয়ে গেল। আমি যখন এই পরীক্ষায উত্তীর্ণ হয়ে বড় হলাম তখন আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মপন্থা চূড়ান্তরূপে স্থির হয়ে গিয়েছে।"

স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি. এ পরীক্ষায় দর্শন বিভাগে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে এম. এ. পড়তে পড়তে সুভাবচন্দ্র আই. সি এস. পরীক্ষা দেবার জন্য বিলেত চলে যান। ১৯২০ সালে মাত্র আট মাস পড়াশুনার পর তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করে আই. সি. এস. পরীক্ষায উত্তীর্ণ হন এবং এই অল্প সময়ের মধ্যেই কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালযের মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানে ট্রাইপোজ সহ বি এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। এই সময় পাঞ্জাবের জালিযানওয়ালাবাগে ভারতবাসীর ওপর বৃটিশ সরকারের অমানুষিক অত্যাচারের পর ভারতব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনে গঙ্গা-যমুনা-নর্মদা-কাবেরীর তীরে-তীরে এক নবজীবনের স্পন্দন দেখা দিল। বিশেষ করে বাংলাদেশে তখন এক নতুন ভাবের রক্ত-প্রভাত নেমে এলো। ভাবোন্মত্ত বাংলা-

দেশ জাতীয় মনুষ্যত্বের সন্ধানে এদিক-ওদিক খুঁজছিল—সহসা এক অতি বিলাসীর স্বর্ণসৌধচূড়ায় তাঁর আগমন-জ্যোতি দেখা দিল। সর্ব মোহ, সর্ব ঐশ্বর্য ত্যাগ করে চিত্তরঞ্জন পথে এসে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দাঁড়ালেন। বাঙালী উল্লাসভরে গেয়ে উঠল—স্বাগত হে দেশবন্ধু! স্বাগত হে রাজভিখারী!

সুভাষচন্দ্র বিলাতে বসেই অন্তরের অন্তস্তলে সে আহ্বান শ্রবণ করলেন। আই সি. এস. পরীক্ষায় পাসের পর তিনি দেশে ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করে দেশসেবার সুযোগ লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে লিখলেন—"আমি বাংলাদেশে আমাদের সেবাযজ্ঞের ঋত্বিক—তাই আপনার নিকট আজ আমি উপস্থিত হয়েছি আমার যৎসামান্য বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও উৎসাহ নিয়ে। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করবার আমার বিশেষ কিছুই নেই —আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীর। আমার আর কিছু দেবার নেই। আমি আজ প্রস্তুত, আপনি শুধু কর্মের আদেশ দিন।"

সুভাষচন্দ্র নিজেকে দেশমাতৃকার চরণে অঞ্জলিরূপে নিবেদন করবার অদম্য প্রেরণা অন্তরে অনুভব করেই সযত্নে অর্জিত আই. সি. এস. পদ ত্যাগ করে ভারতে চলে আসেন। প্রথম যৌবনে সুভাষচন্দ্র সন্ন্যাসের প্রেরণায় যে গুরুর সন্ধানে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন—বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখলেন, সে গুরু তাঁরই অপেক্ষা করছেন। সুভাষচন্দ্রও ভক্ত, শিষ্য ও সাথী হিসাবে সেদিন দেশবন্ধুর নিকট আত্মসমর্পণ করলেন—বাংলাদেশে স্বদেশসেবার আয়োজনে এক নূতন যুগের সূচনা হ'ল।

বিদেশী শিক্ষা বর্জন করে জাতীয় শিক্ষার ধারা প্রবর্তনের জন্য দেশবন্ধু যে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরে প্রথমেই তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। কর্মযোগী সন্ন্যাসী এতদিন পরে কর্মস্রোতে সন্ধান পেলেন এবং অতি অল্প

সময়ের মধ্যেই দেশবন্ধুর প্রধান সহচররূপে গণ্য হলেন। ১৯২১ সালে কংগ্রেসে যোগদান করার পর প্রথমেই সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর সঙ্গে কারারুদ্ধ হলেন—অগ্নি-দীক্ষার ব্রতে এই তাঁর প্রথম আত্মাহুতি। কারামুক্তির পরেই তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। গয়া কংগ্রেসের পর দেশবন্ধু তাঁর নবগঠিত স্বরাজ্য দলের মুখপত্ররূপে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং সুভাষচন্দ্র তখন দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্তরূপে স্বরাজ্য দলের এই পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বঙ্গীয় স্বরাজ্য দল কলিকাতা কর্পোরেশন দখল করলে সুভাষচন্দ্র এই নবগঠিত কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু ছ'মাস পরেই সুভাষচন্দ্র ভারতরক্ষা আইনানুসারে কারারুদ্ধ হয়ে সুদূর মান্দালয় জেলে নির্বাসিত হন। মান্দালয় জেলে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে ও ক্ষয়রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং এই ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য ১৯২৭-এর এপ্রিল মাসে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর মান্দালয় জেল থেকে সুভাষচন্দ্র তাঁর এক সহকর্মী বন্ধুর পত্রোত্তরে লিখেছিলেন—"রাজনীতির স্রোত ক্রমশ যেরূপ পঙ্কিল হয়ে আসছে, তাতে মনে হয় অন্তত কিছুদিনের জন্য রাজনীতির ভিতর দিয়ে দেশের কোন উপকার হবে না। সত্য এবং ত্যাগ এই দুইটি আদর্শ রাজনীতিক্ষেত্রে যতই লোপ পেতে থাকে, রাজনীতির কার্যকারিতা ততই হ্রাস পেতে থাকে। রাজনৈতিক আন্দোলন নদীর স্রোতের মত কখনও স্বচ্ছ, কখনও পঙ্কিল; সব দেশেই এরূপ ঘটে থাকে। রাজনীতির অবস্থা এখন বাংলাদেশে যাই হোক না কেন, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সেবার কাজ করে যাও। তোমার মনের বর্তমান অশান্তিপূর্ণ অবস্থার কারণ কি তা তুমি বুঝতে পেরেছ কি না জানি না, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি, শুধু কাজের দ্বারা মানুষের আত্মবিকাশ সম্ভব নয়।

বাহ্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া ও ধ্যান-ধারণারও প্রয়োজন। কাজের ভিতর দিয়ে যেমন উচ্ছৃঙ্খলতা নষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষ সংযত হয়, লেখাপড়া ও ধ্যান-ধারণার দ্বারা সেরূপ ভিতরের সংযম প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিতরের সংযম না হলে বাইরের সংযম স্থায়ী হয় না। আর একটি কথা, নিয়মিত ব্যায়াম করলে শরীরের যেরূপ উন্নতি হয়—তেমনি নিয়মিত সাধনা করলেও সদ্‌বৃত্তির অনুশীলন ও রিপুর ধ্বংস হয়ে থাকে। সাধনার উদ্দেশ্য দু'টি—(১) রিপুর ধ্বংস—প্রধানত কাম, ভয়, স্বার্থপরতা জয় করা; (২) ভালবাসা, ভক্তি, ত্যাগ, বুদ্ধি প্রভৃতি গুণের বিকাশসাধন করা।"

মান্দালয় জেল থেকে বেরিয়ে সুভাষচন্দ্র ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েই আবার দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে তিনি পূর্ণ সামরিক পদ্ধতিতে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়ে তোলেন এবং নিজেই সেই বাহিনীর 'জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং' হন। কলিকাতা কংগ্রেসের পর তিনি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের প্রস্তাব নিয়ে 'স্বাধীন সংঘ' গঠন করেন। এই সময় তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সভায় পরিচালকরূপে ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে 'দেশগৌরব' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তিনি বার বার কারারুদ্ধ হয়ে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তাঁর স্বাস্থ্য ও জীবন সম্বন্ধে সমগ্র ভারত তখন উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে এবং গভর্নমেণ্ট তখন তাঁকে ভারত ত্যাগ করে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে যেতে দিতে সম্মত হন। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে ভারত ত্যাগ করে চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যাত্রার সময় তিনি বলেছিলেন—"বাংলা মরিলে কে বাঁচিবে? বাংলা বাঁচিলে মরে কে?" এ প্রাদেশিকতার বাণী নয়, আত্মরক্ষার বাণী। বাস্তবপক্ষে, আজকের এই দুর্দিনে জাতিকে বাঁচাতে হলে বাংলার যুবশক্তিকে সুভাষচন্দ্রের এই বাণীকে সফল করে তুলতে হবে।

১৯৩৫ সালে ভারত গভর্নমেন্টের বিনা অনুমতিতেই আইন অমান্য করে ভারতের বোম্বাই শহরে পদার্পণ করা মাত্রই আবার ১৯১৮ সালের ৩ আইন অনুসারে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হ'ল এবং কিছুদিন বিভিন্ন জেলে স্থানান্তরিত করার পর তাঁকে কার্সিয়াং-এ অন্তরীণ করে রাখা হ'ল। ১৯৩৭ সালে অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলে কিছুদিন ডালহৌসীতে থেকে চিকিৎসার পর পুনরায় বিলাত গমন করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেস সভাপতিত্ব করার আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশে ফিরে এলেন—দুঃখ-দৈন্যজয়ী বীরের মাথায় তাঁর স্বদেশবাসী জাতীয় গৌরবের শ্রেষ্ঠ মুকুট পরিয়ে দিলো। তার পরের বছরে, অর্থাৎ ১৯৩৯ সালেও তিনি পট্টভি সীতারামিয়াকে পরাজিত করে পুনরায় ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। কিন্তু প্রাচীনপন্থী নেতৃবৃন্দ এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করে তিনি নতুন দল 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করেন। তখন বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন—তাই তিনি চেয়েছিলেন সমস্ত বামপন্থী দলগুলিকে একত্রিত করে স্বাধীনতা লাভের চরম সংগ্রামের জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত করে বিশ্বযুদ্ধের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে। কিন্তু বামপন্থীরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তখন এগিয়ে আসতে পারলো না।

ভারতবর্ষের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের কল্পনায় স্বাধীন ভারতের যে চিত্র উজ্জীবিত হয়েছিল, তার রূপরেখা তুলে ধরে তিনি বলেছিলেন—"আমরা চাই ভারতের রূপান্তর। আমাদের সমস্ত জাতীয় জীবন—ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত—সব কিছু নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। এই নবজন্মের ও স্বাধীনতার নবপরিকল্পনার উদ্বোধন চাই। প্রতিটি ব্যক্তির জন্য আমরা চাই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক—যে কোন ক্ষেত্রেই হউক না কেন—স্বাধীনতার তাৎপর্য প্রতিটি ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিটি মানুষ—সে নারীই হোক আর

পুরুষই হোক—সমান হয়ে জন্মায়। তাই জীবনকে উন্নত করে গড়ে তোলবার সুযোগও সকলের সমান হওয়া প্রয়োজন।"

ভারতে সমাজবাদী চিন্তাধারা প্রথম যাঁরা প্রচার করেন এবং সমাজবাদী আদর্শে জনমানসকে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন, সুভাষচন্দ্র তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি চেয়েছিলেন—'সমাজবাদী লোকতন্ত্র'—তাই সমাজবাদ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারার মূল দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছিল করাচী নওজোয়ান সভার অভিভাষণে—"যে আদর্শে আমাদের সম্মিলিত জীবন গড়ে তুলতে হবে তা হ'ল—ন্যায়, সমতা, স্বাধীনতা, অনুশাসন ও প্রেম। এই পঞ্চনীতিই হ'ল সমাজবাদের সারকথা। এই সমাজবাদকেই আমি ভারতে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই। বিদেশ থেকে আমরা আলো ও অনুপ্রেরণা গ্রহণ করবো। কিন্তু একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, অন্য দেশকে আমাদের অন্ধভাবে অনুসরণ করা চলবে না। অন্য দেশ থেকে আমরা যা অর্জন করবো, তাকে অনুধাবন করে আমাদের জাতীয় প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োগ করব।...মোট কথা, ভারতবর্ষের নীতি হবে সম্পূর্ণ ভারতীয়।"

১৯৪১ সাল—বিশ্বযুদ্ধের রণ-দামামা বেজে চলেছে। স্বগৃহে অন্তরীণ সুভাষচন্দ্র—অর্গলবদ্ধ গৃহে পূজার্চনা, ধ্যান-ধারণায় মগ্ন। রহস্যজনকভাবে অন্তর্ধান করলেন তিনি ২৬শে জানুয়ারীর স্বাধীনতা দিবসে। ছদ্মবেশ ধারণ করে তিনি ক্ষিপ্র গ্রহের মত কাবুল হয়ে 'দুর্গম গিরি-কান্তার মরু' অতিক্রম করে চক্রশক্তির দেশ রোম হয়ে জার্মানীতে গমন করেন এবং হের হিটলার কর্তৃক সম্বর্ধিত হয়ে জার্মানীতেই 'নেতাজী'রূপে পরিচিত হলেন। তারপর অক্লান্ত পরিশ্রমে আধুনিক রণ-কৌশল আয়ত্ত করে—যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আরও রহস্যজনকভাবে রণ-বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের তলদেশ দিয়ে টোকিওতে উপস্থিত হন। সেখান থেকে সিঙ্গাপুরে এসে ডাক দিলেন এশিয়ার নেতাজী—গড়ে তুললেন এক বিরাট শক্তিশালী 'আজাদ হিন্দ্ রাষ্ট্র' ও তার সেনাবাহিনী 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'। অদ্ভুত,

বিস্ময়কর অথচ বাস্তব সত্য। মহাশক্তিধর 'ভারত-পথিক' মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র—হাতে তাঁর জ্বলন্ত মশাল, মুখে তার অগ্নিবর্ষী ভাষা—'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' অলৌকিক কর্মতৎপরতা, অসামান্য দার্ঢ্য—দুর্লভ শৌর্যবীর্যের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর বুকে একটা আলোড়ন তুলে ব্রহ্মদেশ অতিক্রম করে সসৈন্যে ভারতের পূর্ব-সীমান্তে কোহিমায় ইম্ফলে এসে ভারতের বিজয়কেতন উড্ডীন করেন। ভারতের বিরোধী দলগুলিকে স্তব্ধ করে অজ্ঞাত স্থান হতে বেতারে ভেসে-আসা নেতাজীর কণ্ঠস্বর—দুর্গম অরণ্য ও পর্বতের ভিতর দিয়ে তাঁর সৈন্য চালনা—হিন্দু-মুসলমান, বাঙালী-অবাঙালীতে কোন পার্থক্য না রেখে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা—এই তো ছিল স্বামী বিবেকানন্দের বীর-বাণীর প্রধান আকর্ষণ—এই তো শ্রেষ্ঠ দেশসেবী মহান কর্মযোগীর কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন।

'ভারত পথিক' বলতে আমাদের যা মনে আসে, তা হ'ল এই ভারতবর্ষেরই নিজস্ব এক বিশেষ মূর্তি। এই ভারতবর্ষ একাধারে গৃহী ও সন্ন্যাসী ভারতবর্ষ; বিশ্বভুবনের যিনি পরম দেবতা তাঁরই উদ্দেশ্যে পৃথিবীর পর্বতে, অরণ্যে, মরুপ্রান্তে, সাগরসঙ্গমে, নদীতটে এই ভারতের পরিব্রাজক। ভারতবর্ষের সেই পরিব্রাজকের রূপটি আমরা দেখতে পাই ভারতবর্ষের পুরাতন ঋষিদের মধ্যে—দেখতে পাই বুদ্ধ-শঙ্কর-চৈতন্য-বিবেকানন্দের মধ্যে আর দেখতে পাই ভারতের অগণিত নর-নারীর অন্তহীন তীর্থযাত্রীর অব্যাহত ধারার মধ্যে। ভারত-পথিক সুভাষচন্দ্র তাঁর পনরো বছর বয়স থেকেই জীবনের সুনির্দিষ্ট অর্থ ও লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছিলেন—'আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়'—উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি সনাতন ভারতবর্ষকেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন; তাই আঠারো বছর বয়সেই নিজের জীবনের সার্থকতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—"Embodiment of the past, product of the present and prophet of the future."—নিজের এই

ভাবমূর্তিই কিশোর বালকের ধ্যানে ধরা পড়েছিল, অর্থাৎ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান—ত্রিকালের মধ্যে বিস্তারিত ভারতবর্ষকেই নিজের অস্তিত্বের গণ্ডুষে ধরবার অগস্ত্য-পিপাসা।

বিস্তারিত ভারতবর্ষের সেবার দুর্বার আকর্ষণই সুভাষচন্দ্রকে তাঁর কুসুমিত জীবনের ভোগ-বিলাসের আহ্বান বিসর্জন দিয়ে রাজনীতির কণ্টকাকীর্ণ পথে টেনে এনেছিল। কেন তিনি রাজনীতি গ্রহণ করলেন, নিজেই তার উত্তর দিয়ে বলেছিলেন—"রাজনীতি আমি সাময়িক বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিনি। নিজের জীবনকে পূর্ণরূপে বিকাশ করে ভারতমাতার চরণে অঞ্জলি নিবেদন করবো—এই আদর্শের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। এই আদর্শই আমার জীবনের জপ-তপ ও স্বাধ্যায়।"

তাই তো ছিলেন তিনি জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বাবয়ব প্রতিমূর্তি—ভারত-পথিক সুভাষচন্দ্র। দৃষ্টিপথে তাঁর ভারতের অতীতের সমুজ্জ্বল ইতিহাস, উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ—বেরিয়ে পড়লেন তিনি ভারত-আত্মার সন্ধানে। চলেছেন ভারত-পথিক সুভাষচন্দ্র—পথ চলতে চলতে 'দুর্গম গিরি-কান্তার মরু' লঙ্ঘন করে, 'দুস্তর পারাবার' অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছেন ভারত-আত্মার সেই একনিষ্ঠ সাধক। ডাক দিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র সমগ্র এশিয়া-বাসীকে—দিলেন তাদের মুক্তির মন্ত্র। কিন্তু দৃষ্টি তাঁর ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দিকে - এগিয়েই চলেছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র—লক্ষ্য তাঁর ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। ডেকে বললেন তিনি ভারতবাসীকে—"আমার আদর্শ দেশের ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি।"

আজ তাঁর আত্মত্যাগ ও দেশসেবার আদর্শকে অনুধাবন করে বুঝতে হবে—"রাজনীতি পেশা নয়, স্বদেশ ও সমাজসেবার মহান আদর্শ।"

সুভাষচন্দ্রের আন্তর্জাতিকতা

নির্মল বসু

কোন দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি কখনও সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্করহিত হতে পারে না। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘটনাবলী নানাভাবে জাতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে। একথা ঠিক, দেশের নিজস্ব পরিবেশ ও সমস্যা অনুযায়ীই সে দেশের নীতি ও কর্মসূচী নির্ধারিত হয়, কোন একটি বা একাধিক পররাষ্ট্রের ধরন অনুযায়ী হয় না—যদি না অবশ্য সে দেশ সম্পূর্ণ অপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়, তবু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রভাব পড়তে বাধ্য।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতের অগ্রগণ্য জাতীয়তাবাদী নেতা। ভারতে ইংরেজ শাসন অবসানের জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। যে কোন মূল্যে মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনই ছিল তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান। জাতীয়তাবাদের আদর্শে গভীর বিশ্বাস সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ কখনও সঙ্কীর্ণ ও জঙ্গী জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়নি। আন্তর্জাতিকতার আদর্শে তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল। সুভাষচন্দ্রের আন্তর্জাতিকতা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে, এবং বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য তা নয়। সুভাষচন্দ্রের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর সুভাষচন্দ্র সর্বদা গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতি গভীরভাবে অনুশীলন করেছেন। আন্তর্জাতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের স্বাধীনতা

আন্দোলনের কর্মসূচী নির্ধারণের জন্য তিনি সব সময় চেষ্টা করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নিয়ামক শক্তিরূপে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ওপর এত গুরুত্ব আরোপ সুভাষচন্দ্রের মত আর কেউ করেননি। য়ুরোপ পরিভ্রমণের সময় তাঁর বিভিন্ন মন্তব্য, হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণ ও পরবর্তীকালে ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও সরকারের প্রধানরূপে তাঁর ভাষণ এর স্বাক্ষর বহন করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার বেশ আগে থেকেই সুভাষচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে, মহাযুদ্ধ আসছে। যুদ্ধে ব্রিটেন বিব্রত থাকবে। সুতরাং এই সুযোগে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হবে। এবং এব জন্য দেশব্যাপী ইংরেজ সরকার-বিরোধী সংগ্রাম শুরু করতে হবে—এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। সুস্পষ্ট আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে এই বিশ্লেষণ ও কর্মপন্থার কথা ভাবা সম্ভব নয়।

সুভাষচন্দ্র বলেছেন, "বিশ্ব আজ বড় ছোট হয়ে এসেছে। বলতে গেলে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সীমান্তের আড়াল ভেঙে গেছে। পৃথিবীর এক প্রান্তে যা ঘটছে, সর্বত্র তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে। সুতরাং কেবলমাত্র জনসাধারণের সঙ্গে যোগস্থাপন অথবা ঐতিহাসিক ঘটনার সম্যক উপলব্ধি যথেষ্ট নয়, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে পদে পদে ভুল হবার সম্ভাবনা।" ('ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 'হার্ট সার্চিং', ২৮শে অক্টোবর, ১৯৩৮)।

ভারতের সকল আন্দোলনের ওপর কিভাবে আন্তর্জাতিক ঘটনার প্রভাব পড়েছে, সুভাষচন্দ্র তা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন একই প্রকারের উত্থান দেখা দিয়েছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয় সেই সময়। ১৯০৫ সালের আন্দোলন দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়োর যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে এবং ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের সম-সময়ে গড়ে ওঠে। মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে যে বিপ্লব প্রচেষ্টা, তা ছিল তখনকার সারা পৃথিবীর বিশিষ্ট

ঘটনা। ১৯২০-২১ সালের আন্দোলন দেখা যায় পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুসরণ এবং আইরিশ সিনফিন বিপ্লব এবং তুর্কীর স্বাধীনতা আন্দোলনের সম-সময়ে। নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, ভারতের জাতীয় জাগরণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।"

সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন দেশের ইতিহাস অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করেছেন। ইতিহাস ছাড়াও তিনি বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়কদের জীবনী ও তাঁদের লেখা পড়েছেন। 'ভারত-পথিক' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, য়ুরোপের ইতিহাস এবং বিশেষ করে বিসমার্কের 'অটোবায়োগ্রাফি', মেটারনিকের 'মেমেরিয়স,' কাভুরের 'লেটাবস' প্রভৃতি পাঠ করাব ফলেই তাঁর মধ্যে প্রথম রাজনৈতিক প্রকৃতি অনুসাধন করতে সক্ষম হন। মার্কস ও লেনিনের লেখাও সুভাষচন্দ্রের আন্তর্জাতিক দৃষ্টি-ভঙ্গীকে প্রভাবিত করেছে। হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে তিনি উপনিবেশবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং ব্রিটেনের ন্যায় উপনিবেশবাদী দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে উপনিবেশবাদের অবসানের গুরুত্ব আরোপ প্রসঙ্গে লেনিনের বক্তব্য বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৮ তারিখে লণ্ডনে রজনী পাম দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সুভাষচন্দ্র বলেন—মার্কস্ ও লেনিনেব রচনাবলী এবং কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের বক্তব্য পাঠ করে তিনি জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার প্রকৃত সম্পর্ক ও সাম্যবাদের ভূমিকা বুঝতে পেরেছেন। ('ক্রশরোডস', পৃঃ ৩০)।

১৯৩৩ সালে সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং তদানীন্তন নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হিউ টয় তাঁর সুভাষচন্দ্র বসু (দি স্প্রিংগিং টাইগার) গ্রন্থে আলোচনা করেছেন, কিভাবে এই ভ্রমণ তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশে সাহায্য করে। এই সময় তিনি বার্লিন, রোম, প্রাগ, ওয়ারশ, ইস্তাম্বুল, বেলগ্রেড, বুখারেষ্ট প্রভৃতি শহরে যান। চেকোশ্লোভাকিয়ার তদানীন্তন পররাষ্ট্র-

মন্ত্রী ও পরে রাষ্ট্রপতি ডঃ বেনেস, আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবী নেতা ডি. ভ্যালেরা, তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক ও মনীষী রোম্যাঁ রঁল্যা সুভাষচন্দ্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সুভাষচন্দ্র বিদেশের সাহায্য গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন। এ ব্যাপারে লেনিনের দৃষ্টান্ত তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি শেষ পর্যন্ত জার্মানী ও জাপানের সাহায্য গ্রহণও করেছেন।

ভারত থেকে অন্তর্ধানের পর সুভাষচন্দ্র কাবুল হয়ে প্রথমে মস্কো যান। কিন্তু সেখানে তিনি স্ট্যালিন বা অন্য কোন সোভিয়েট নেতার সাক্ষাৎ বা কোন প্রকার সাহায্য পাননি। যদি সেদিন সুভাষচন্দ্র ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনায় সোভিয়েট ইউনিয়নের সাহায্য পেতেন, তা হলে তাঁকে হয়তো আর জার্মানী বা জাপান যেতে হ'ত না। ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসও হয়তো ভিন্নরূপ হ'ত।

বিদেশে ভারতের বক্তব্য প্রচারের প্রয়োজনীয়তার ওপর সুভাষচন্দ্রই কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে প্রথম জোর দেন। হরিপুরা ভাষণে এ বিষয়ে তিনি বিস্তৃত কর্মপন্থা পেশ করেন। এক ভাষণে তিনি কংগ্রেস কর্তৃক সুস্পষ্ট বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ স্থাপনের ওপর জোর দেন। সকল দেশের বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, য়ুরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা এবং উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় কংগ্রেসের শক্তিশালী প্রচার কেন্দ্র স্থাপন, আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র ও চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন, এবং বিদেশে, বিশেষ করে জাঞ্জিবার, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয়, সিংহল প্রভৃতি দেশের ভারতীয়দের সঙ্গে যোগস্থাপনের কথা তিনি বলেন।

বিদেশে ভারতের স্বাধীনতার বক্তব্য প্রচার করার জন্য সুভাষচন্দ্রের যুক্তির সারবত্তা অনুভব করে ও সুভাষচন্দ্রের কার্যকলাপে মুগ্ধ হয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভার ভূতপূর্ব সভাপতি ও বিশিষ্ট কংগ্রেস

নেতা বিঠলভাই প্যাটেল জেনেভায় মৃত্যুর পূর্বে কয়েক লক্ষ টাকা এই কাজে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্রের জন্য দিয়ে যান। অবশ্য ভারতের কয়েকজন দক্ষিণপন্থী নেতার চক্রান্তে শেষ পর্যন্ত এই টাকা সুভাষচন্দ্রের হাতে এসে পৌঁছয়নি।

সুভাষচন্দ্র নিজে সর্বদা বিদেশে তাঁর ভ্রমণ, অপরের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন, বক্তৃতা, সব কিছুর মধ্য দিয়ে ভারতের বক্তব্য প্রচারের চেষ্টা করেছেন। সুভাষচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু দিলীপকুমার রায় 'দি সুভাষ : আই নিউ' গ্রন্থে বিদেশে সুভাষচন্দ্রের দৌত্যকার্যের এক সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। ভিয়েনায় ১৯৩১ সালে অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্র বিখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী রেনে মূলারের সঙ্গে পরিচিত হন। মূলার দিলীপকুমার রায়কে এক পত্রে লেখেন, সুভাষচন্দ্রের মত আরও কয়েকজন ব্যক্তি য়ুরোপে ভ্রমণ করলে য়ুরোপে ভারতের আর কোন প্রচারের প্রয়োজন হবে না।

ভারতের অন্যান্য নেতারাও যাতে এইভাবে বিদেশে ঘোরেন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চেষ্টা করেন, তার জন্য সুভাষচন্দ্র বারে বারে বলেছেন। লণ্ডনে দ্বিতীয় রাউণ্ড টেব্‌ল কনফারেন্স ব্যর্থ হবার পর তিনি বলেছিলেন, গান্ধীজীর আমেরিকা ও য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে সফর করে সম্মেলনের ব্যর্থতার কারণ ও ভারতের বক্তব্য বোঝানো উচিত ছিল। অবশ্য কয়েকটি দেশে গান্ধীজী গিয়েছিলেন কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মতে, গান্ধীজীর আরও বেশী ঘোরা উচিত ছিল এবং বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মেশার প্রয়োজন ছিল। (দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগ্‌ল্, ১৯২০-১৯৩৪, পৃঃ-১৫)।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের লড়াই-এর সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছেন, এবং নানাভাবে এইসব দেশের নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। নেতাজী ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের

কার্যকলাপের ফলে কেবল ভারত নয়, পূর্ব-এশিয়ায় বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সম্ভব হবে, বার্মার তদানীন্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী থাকিন মু এই কথা বলেছেন।

৫ই নভেম্বর ১৯৪৩ তারিখে টোকিওতে যে পূর্ব-এশিয়া জাতি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, (অ্যাসেম্বলী অব ইষ্ট এশিয়াটিক নেশন্‌স্) নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেই সম্মেলনের আলোচনায় অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি সকল স্বাধীন রাষ্ট্রের মিলিত বিশ্ব সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। তবে তা এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির শোষণের ভিত্তিতে নয়; স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক সাহায্যের নীতির ওপর গড়ে তুলতে হবে।

সুভাষচন্দ্র তখন জেলে। তাঁকে রাখা হয়েছে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে দোতলায়। সঙ্গে আছেন তাঁর বহুদিনের সহকর্মী নরেনবাবু—নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী। নীচের তলায় থাকত কয়েকজন গ্রীক নাবিক—চোরা কারবারের অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছে। একে দুর্দান্ত দাপুটে ইউরোপীয়ান, তার ওপর আবার দুর্বোধ্য গ্রীক ভাষা। মাঝে মাঝে তারা চেঁচামেচি করে নিজেদের মধ্যে কী বলে কিছুই বোঝা যায় না। মনে হয় হট্টগোল লেগেই আছে।

যতীন নামে এক ফালতু সুভাষচন্দ্রের ওয়ার্ডে কাজ করত। ফালতুরা ছিল পুরনো কয়েদী। রাজবন্দীদের ভৃত্য হিসেবে কাজ করবার জন্যে তাদের নিয়োগ করা হ'ত। যতীন ছিল সুভাষচন্দ্রের খুব আজ্ঞাবহ। এত বড় একজন নেতার কাজ করতে পারার জন্যে মনে মনে তার একটু গর্বও ছিল বৈকি!

একদিন হ'লো কী, সুভাষচন্দ্র ও নরেনবাবু ওপরে বসে গল্প-গুজব করছেন, হঠাৎ নীচে থেকে শোনা গেল এক বিকট চীৎকার। আর যতীনও শান্তশিষ্ট সুবোধ ছেলের মত ওপরে উঠে এসে ঘরের সামনে বারান্দার একপাশে চুপচাপ বসে রইল। ক্রমে ক্রমে চীৎকারের ধ্বনিটা আরও বাড়তে লাগল।

কী হ'লো? কী হ'লো? সুভাষচন্দ্র ও নরেনবাবু দু'জনেই এগিয়ে গেলেন। দেখলেন একটা সাহেব সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসছে আর তার পেট দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত ঝরে পড়ছে। ওপরে এসে সে যতীনকে দেখিয়ে হাউমাউ করে কী সব বলতে লাগল।

সুভাষচন্দ্র যতীনকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কী হয়েছে রে, যতীন? সব খুলে বল।'

সুভাষচন্দ্রের জেরার উত্তরে যতীন যা বলল তার মর্মার্থ এই —যতীন গিয়েছিল কলতলায় সুভাষচন্দ্রের জন্য কুঁজোয় জল ভরতে। সেই সময় একটা গ্রীক সাহেব কলতলায় দাঁড়িয়ে কুঁজোর ওপরেই মূত্রত্যাগ করতে থাকে। যতীন এর প্রতিবাদ করলে যতীনকে সে কালো চামড়ার লোক বলে অবজ্ঞা করে, এবং তার সামনে উলঙ্গ হয়ে নৃত্য আরম্ভ করে দেয়। হাতের কাছে ছিল একটা থান ইট, যতীন ক্ষিপ্ত হয়ে সেই ইটখানাই সজোরে ছুঁড়ে মারে সাহেবের পেটের ওপর। তার ফলেই এই রক্তারক্তি কাণ্ড।

যতীন ক্রুদ্ধস্বরে বলতে থাকে—'আমরা কালো আদ্‌মি বলে ওরা ঘৃণা করবে ? ওরা পেয়েছে কী ?'

সুভাষচন্দ্র মুহূর্তে মনস্থির করে ফেললেন। যতীনকে বাঁচাতেই হবে। খস্‌খস্ করে একটা কাগজে জেলারের কাজে কি যেন লিখলেন। সেপাইকে ডেকে সেটা জেলারের কাছে পাঠিয়ে নরেনবাবুকে বললেন—'তুমি রান্নাঘরের ফাল্‌তুকে একটু তালিম দাও। আমি অন্য ব্যবস্থাগুলো করছি।'

অর্থাৎ এটা প্রমাণ করতে হবে যে, যতীন নিতান্ত সুবোধ বালকের মত কলতলায় কাজ করছিল, আর ঐ বেহায়া সাহেবগুলো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধস্তাধস্তির ফলে একটা সাহেবের দেহের কিছু অংশ ছড়ে গিয়ে থাকবে।

নরেনবাবু ছুটে গেলেন নীচের রান্নাঘরে। পাচককে হাত করে ফেললেন। তারপর যখন ওপরে উঠে এলেন, দেখলেন জেলার সাহেব মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছেন, আর সুভাষচন্দ্র ঝরঝর করে ইংরেজীতে গ্রীক সাহেবগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যাচ্ছেন।

জেলার সাহেব 'আচ্ছা আমি ব্যবস্থা করছি', বলে কোনরকমে পালিয়ে বাঁচলেন।

নীচে গিয়েই তিনি কড়া সুরে সাহেবগুলোকে ধমকাতে লাগলেন।

তারা হৈ-চৈ-গোলমাল যাতে করতে না পারে সেজন্য এক প্রহরীও বসিয়ে দিলেন তাদের ঘরের সামনে।

এই সামান্য ঘটনা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সুভাষচন্দ্র তাঁর সেবক এক জেলের সাধারণ ফালতুকেও কতখানি ভালবাসতেন, ভারতীয়দের অবজ্ঞাকারী সাদা চামড়ার লোকদের কতখানি ঘৃণা করতেন।

নেতাজীর স্বদেশ-চিন্তা শ্রীমন্তকুমার জানা

নেতাজীর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল ভারতের মুক্তিসাধন—'India shall be free and before long' স্বদেশ ছাড়া তাঁর অন্তরে অন্য কোনো জিনিসের স্থান ছিল না। দেশমাতৃকার দুঃখমোচনকে তিনি ঈশ্বর-আরাধনার পবিত্র কর্ম বলে মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন।

বৃটিশ শাসনে ভারতের নিদারুণ পঙ্গু দশা তাঁর অন্তরাত্মাকে অত্যন্ত পীড়িত করেছিল। নেতাজী লিখেছেন—'British imperialism has meant for India moral degradation, cultural ruin, economic impeverishment and political enlsavement.'

তাই রাষ্ট্রিক মুক্তিসাধনই নেতাজীর প্রাথমিক কাম্য ছিল। তাঁর মতে: ভারতবাসীর প্রয়োজন 'Complete independence', 'All or nothing'. এই দাবি মেনে নিলে বৃটিশ সরকারকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে। নতুবা দেশব্যাপী সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করা অবশ্য কর্তব্য। আগে চারদিকের শৃঙ্খল ছিঁড়লে পরে দেশের সার্বিক উন্নতি।

রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা লাভ করলেই একটা দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'ল একথা বলা চলে না। বিবিধমুখী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিন্তায় ও কর্মে দেশের সাধনা চললে তবেই দেশের সর্বতোমুখী জাগরণ। এদিকে নেতাজীর মনঃশক্তি নিবদ্ধ ছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনের ফাঁকে ফাঁকে তার পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই সামান্য নিবন্ধে তারই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছি।

সমকালীন সমাজজীবন সম্পর্কে নেতাজীর প্রখর দৃষ্টি ছিল। অন্ধ

আচার সংস্কারগ্রস্ত ভারতীয় সমাজজীবন একটা অচলায়তনে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল। মৃতকল্প দেশে প্রাণশক্তি সঞ্জীবিত করতে হলে য়ুরোপীয় জঙ্গমজীবনের আদর্শ-চর্চা বিশেষভাবে প্রয়োজন। নেতাজী লিখেছেন—'In India we want to-day a philosophy of activism. We must be inspired by robust optimism. We went to adopt ourselves to modern condition'.

জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ ভেদাভেদ ও অস্পৃশ্যতা পাপ দূর করে গান্ধীর নেতৃত্বে জনজীবনে জাতীয় চেতনা উন্মেষের যে মহা প্রচেষ্টা চলছিল তাতে নেতাজী খুবই মুগ্ধ হন। সেই সঙ্গে তিনি সমাজে তারুণ্যশক্তি উদ্বোধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। ১৯২৯-৩১ সাল পর্যন্ত নেতাজীর নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নেতাজী সভাপতির ভাষণে বলেন, জগতের বড় বড় সভ্যতা তারুণ্যশক্তির সৃষ্টি। তরুণের ধর্ম—সমাজ থেকে, রাষ্ট্র থেকে অসত্য, জড়ত্ব ও অন্যায়-অত্যাচার দূর করে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা ও কল্যাণের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। কাজ করতে গেলে ভুল হয়তো হবে—কিন্তু লক্ষ্য যেন বিভ্রান্ত না হয়। ছাত্রদের সামনে নেতাজী স্বাধীন ভারতের আদর্শ সম্পর্কে বলেন— "Free India will be a perfect synthesis of what is best in the East and the West."

নেতাজীর মতে : ভারতের পূর্ণ মুক্তি ও উন্নতি সমাজতান্ত্রিকতার পথেই সম্ভব। সমাজতন্ত্র একটি বড় আদর্শ। এখানে যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকার ও মর্যাদা থাকবে, ভারতের সমাজতান্ত্রিক জীবনে বিশ্বের সভ্যতা সংস্কৃতির আদর্শকে সাঙ্গীকৃত করে নিতে হবে। নেতাজী তাঁর 'Indian Struggle' গ্রন্থে সাম্যবাদী সংঘের কথা বলেছেন, যার মধ্যে সমাজতন্ত্রের আদর্শের কথা প্রচ্ছন্ন—'It will stand for political independence for India, so that a new state could be created in free

India on the basis of the internal principles of justice equality and freedom. It will stand for the ultimate, fulfilment of India's mission so that India might be able to deliver to the world the message that has been her heritage through the past ages.'

নেতাজী জানতেন প্রাণের দিক দিয়ে সম্পদ না পেলে মানুষ বা জাতি বড় হতে পারে না। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে শান্তি-নিকেতনে এক ভাষণে নেতাজী বলেন, "আজ আমরা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি, কিন্তু আমাদের আদর্শ বড়। আমরা চাই মানুষের ও জাতির পরিপূর্ণ জীবন, আমরা চাই সব দিক দিয়ে আমাদের অখণ্ড জাতি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। এই যাত্রার পথে, এই সাধনার পথে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা একটা সোপান মাত্র।"

ভারতের পথ মানবমৈত্রীর পথ। মহামানবতার আদর্শের মধ্যে সকল মানুষের সব আদর্শ ও চিন্তা সমন্বিত করাই ভারতের লক্ষ্য। নেতাজীর দৃষ্টি এত বিশ্বপ্রসারী ছিল যে, স্বাধীন হওয়ার পর ভারতকে ধর্ম, শিক্ষা ও অর্থনীতি সব দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ করে আন্তর্জাতিক মহিমায় উন্নত করতে হবে। রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় নেতাজী একটি অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা তৈরী করেন। যার মূলকথা পল্লীপ্রধান কৃষিকেন্দ্রিক ভারতীয় সমাজজীবনের ভিত্তিতেই আধুনিক যন্ত্রসভ্যতাকে গ্রহণ করতে হবে। দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বমানবের উৎকর্ষ জীবনাদর্শকে বরণ করে নিতে হবে। নেতাজী বলেন—"আমরা যে নূতন ভারত তৈরী করব তার প্রতিষ্ঠা হবে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শের উপর। তাকে ভিত্তি করে স্বরাজের সৌধ নির্মিত হবে। তার মধ্যে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ফুটিয়ে তুলতে পারব। যেদিন ভারতের প্রত্যেক নর-নারীকে মনুষ্যত্বের উচ্চতম সোপানে উন্নীত করতে পারব, সেদিন আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবে।"

নেতাজীর স্বদেশ-চিন্তার কর্মরূপ 'মহাজাতি সদন' প্রতিষ্ঠা

১৯৪০ সালে জানুয়ারী মাসে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রবীন্দ্রনাথ। নেতাজী তাঁর ভাষণে কবিগুরুর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বলেন—"যে সমস্ত কল্যাণ প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্তজীবনের আস্বাদ পাবে এবং ব্যক্তির ও জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হবে এই গৃহ তারই জীবনকেন্দ্র হয়ে 'মহাজাতি সদন' নাম সার্থক করে তুলুক—এই আশীর্বাদ আপনি করুন। এই আশীর্বাদ করুন, যেন আমরা অবিরাম গতিতে আমাদের সংগ্রাম-পথে অগ্রসর হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করি এবং আমাদের মহাজাতির সাধনাকে সব রকমে সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত করে তুলি।"

নেতাজীর রাজনৈতিক সংগ্রাম-জীবনের অন্তরালে চিরন্তন ভারতসত্তা অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় বর্তমান ছিল। রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের মতো আধুনিক কালে নেতাজীও ছিলেন অন্যতম একজন ভারত-পথিক।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাধের ও গর্বের ঘাঁটি সিঙ্গাপুরের শেষ পর্যন্ত পতন হ'লো—উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের পনরোই ফেব্রুয়ারী জাপানীদের হাতে। ভারতীয় সৈন্যসামন্ত ও অফিসারদের বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে ব্রিটিশ প্রভুরা সসম্মানে পালিয়ে বাঁচলেন। জাপানীরা অবশ্য এই পরিত্যক্ত ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলেন না। জাপানীরা 'সিঙ্গাপুর'-এর নাম দিলেন—'শোনান'।

জাপানীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী বললেন যে, ভারতীয়দের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁরা সাহায্য করবেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব-এশিয়ায় 'ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ' স্থাপিত হ'লো।

এক বছর পরের কথা বলছি। পূর্ব-এশিয়ায় হঠাৎ সাড়া পড়ে গেলো—সুভাষচন্দ্র বসু আসছেন। তিনিই এবার ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। সারা পূর্ব-এশিয়ায় প্রাণের জোয়ার এলো।

উনিশশো তেতাল্লিশ সালের জুলাই মাসের দু'তারিখ। শোনানে ভীষণ হৈ-হৈ। নেতাজী শোনানে এসে পৌঁছোলেন। একদিকে বিনয়, শক্তি ও তেজস্বিতা, আর একদিকে অভ্রভেদী ব্যক্তিত্বের মহিমামণ্ডিত নেতাজী।

ঐ মাসে ন'তারিখে শোনানের মিউনিসিপ্যাল অফিসের সামনে পাতাং-এ বিরাট জনসভার আয়োজন করা হ'লো। নেতাজী আজ সকলকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা দেবেন। সভায় যেন শহরের লোক ভেঙে পড়েছে। চারদিকে কালো কালো মাথা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। অতো লোকের সভা, কিন্তু কোনো গোলমাল নেই।

নেতাজী কথা বলতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে যেন কি মায়াবলে সব চুপ হয়ে গেলো। অনেকক্ষণ পরে বক্তৃতা শেষ হ'লো। লোকেরা এতোক্ষণ যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়েছিলো।

নেতাজী সভাস্থল ত্যাগ করে যাবার জন্য প্রবেশদ্বার পর্যন্ত এসেছেন, এমন সময়ে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। ঐ অগণিত জনস্রোতের মধ্য থেকে একটি বৃদ্ধা তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন। নেতাজী একটু অপেক্ষা করলেন। ইতিমধ্যে বৃদ্ধাটি তাঁর কাছে এগিয়ে এসেছেন। তিনি কিন্তু নেতাজীকে কোনো কথা বললেন না বা কোনো প্রশ্নও করলেন না। বৃদ্ধাটি সটান নেতাজীর পায়ে হাত দিতে যাচ্ছিলেন। নেতাজী তাড়াতাড়ি তাঁকে তুলে ধরলেন এবং নিজে মাথাটি নিচু করে সেই বৃদ্ধার হাত দু'টি নিজের মাথায় দিয়ে বললেন, 'মা, আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন।' নেতাজীর এই কথা শুনে চারপাশের লোকদের চোখে তখন জল এসে পড়েছে।

আরও কিছুদিন পরের কথা।

নেতাজী শোনানে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট গঠন করেছেন। প্রবাসী ভারতীয়দের দেওয়া টাকাতেই সব কাজ চলতো। আর আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট, তার সেনাবাহিনী এবং যুদ্ধের জন্য যে অজস্র টাকাকড়ির দরকার হ'তো, একথা অবশ্যই বলা বাহুল্য।'

একবার নেতাজী এক বিরাট জনসভায় জানালেন যে, তাঁর কাজ চালানোর জন্য আরও বহু টাকার প্রয়োজন এবং তিনি সকলকে বললেন, 'সর্বস্ব ত্যাগ করো, দেশের জন্য ফকির হও।' নেতাজীর এই আহ্বানে অদ্ভুত সাড়া পাওয়া গেলো। সেই সভাতেই বহু লোক বহু টাকা নেতাজীকে দিলেন। মেয়েরা নিজেদের গায়ের অলঙ্কার খুলে দিতে লাগলেন। দেশের মুক্তি-সংগ্রামে তাঁরা কিছু দিতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাজার হাজার টাকা সংগৃহীত হ'লো।

সভা শেষ হবার পর এক জীর্ণশীর্ণ বৃদ্ধা ধীরে ধীরে নেতাজীর

কাছে এগিয়ে এলেন। তিনি তাঁর আঁচলের খুঁট থেকে তিনটি টাকা বার করে নেতাজীকে জানালেন যে, ঐ তিনটি টাকাই তাঁর শেষ সম্বল। নেতাজীকে দেবার মতো আর কিছুই তাঁর নেই। বৃদ্ধার কথা শুনে দু'টি চিন্তা নেতাজীর মনে উদিত হ'লো। প্রথমে তিনি ভাবলেন, যদি তিনি বৃদ্ধার টাকা তিনটি না নেন তো ঐ বৃদ্ধা ভাববেন যে, যেহেতু তিনি দরিদ্র এবং তাঁর তিন টাকার চেয়ে বেশি দেবার মতো কিছু নেই, তাই নেতাজী তাঁর এই দান অতি সামান্য বলে নিলেন না এবং মনে মনে তিনি খুব দুঃখও পাবেন। আর দ্বিতীয়তঃ তিনি ভাবলেন যে, ঐ তিনটি টাকাই মাত্র বৃদ্ধাটির সম্বল। তিনি যদি তা নেন তো ঐ বৃদ্ধাটির পরের দিন কি করে চলবে? এই কথা ভেবে নেতাজী মনে মনে দুঃখ অনুভব করলেন।

এই দুই চিন্তায় নেতাজী মহা সমস্যায় পড়লেন, কি করবেন তিনি? কয়েক সেকেণ্ড তিনি ভেবে নিলেন। প্রথম চিন্তায় বৃদ্ধাটির মনের উদারতা ও এই ত্যাগস্বীকারের মহত্ত্বে নেতাজী মনে আনন্দ ও গর্ব বোধ করলেন। আবার পরক্ষণেই দ্বিতীয় চিন্তায় নেতাজীর চোখে জল এলো।

কিন্তু অবশেষে নেতাজীর প্রথম চিন্তাই জয়ী হ'লো। অশ্রু-সজল চোখে তিনি হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধাটির হাত থেকে টাকা তিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গেই নিলেন।

মহানায়ক সুভাষচন্দ্র মধুসূদন চক্রবর্তী

সুভাষচন্দ্র ভারতাত্মার বাণীমূর্তি। ভারতবর্ষের মূক জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেওয়ার জন্য বিলাসের জীবন ছেড়ে তিনি ত্যাগ ও দুঃখময় জীবনকে বরণ করে নিয়েছেন। তাঁর জীবনের একমাত্র ধ্যান ও ধারণা ছিল ভারতবর্ষের বন্ধনমুক্তি। দেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিপাগল এই ত্যাগব্রতী মানুষটি জীবনের অভ্যুদয় থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত একইভাবে সংগ্রাম করেছেন। সে সংগ্রাম আপসহীন বিরামহীন সংগ্রাম। মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক সুভাষচন্দ্র সেজন্য আজও কোটি কোটি ভারতবাসীর হৃদয় জুড়ে বসে আছেন।

কারাগারে যাঁরা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একসাথে কাটিয়েছেন, তাঁরা লক্ষ্য করেছেন জীবনে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা ছাড়া আর কোনো বিষয়েই তাঁর আনন্দ নেই। তাঁর সমস্ত উদ্যম, সমস্ত চিন্তা এবং সমস্ত আনন্দ এই একটি ধারায় প্রবাহিত। এই স্বাধীনতার সংকল্পকে কার্যে রূপায়ণের পথ নিয়ে গান্ধীজী সহ ভারতের তদানীন্তন জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর বার বার বিরোধ হয়েছে। শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে তাঁকে জাতীয় মহাসভা থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। আদর্শের পূজারী সুভাষচন্দ্র দমেননি। তাঁর মনে ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল আবেদন আর নিবেদন করে কিছু হবে না, এর দিন ফুরিয়ে গিয়েছে। ইংরেজকে ভারত-ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করতে হবে—নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়। একজন্য অহিংস নয়—তিনি চেয়েছিলেন সহিংস সংগ্রাম। মনেপ্রাণে একথা বিশ্বাস করেছেন বলেই সুভাষচন্দ্র এক বিপদসঙ্কুল পথ বেছে নিলেন—যে পথে ছিল প্রতি পদে মৃত্যুর আহ্বান। সুভাষচন্দ্র সেই মৃত্যুর আহ্বানকে সঙ্গীতের মত শুনে দেশত্যাগ করেছেন। এক

মহান স্বপ্নে বিভোর হয়ে তিনি দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর সমুদ্র পাড়ি দিলেন। তাঁরই স্বপ্নসাধনার ফলশ্রুতি : স্বাধীন ভারতবর্ষ।

বিদেশে গিয়ে কিন্তু সুভাষচন্দ্র ভারতাত্মার বাণীই প্রচার করতে লাগলেন। কোন অসূয়া বা সঙ্কীর্ণতা তাঁর বিরাট হৃদয়কে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তাই দেখতে পাই ভারতবর্ষে যাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর মত ও পথের একান্ত বিরোধ, বিদেশে গিয়ে সুভাষচন্দ্র তাঁরই উদ্দেশে জানালেন প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, আস্থা ও কৃতজ্ঞতা। ভারতীয় রাজনীতিতে বর্তমানকালে যেরূপ শ্রদ্ধাহীনতা, বিদ্বেষ ও ব্যক্তিগত আক্রমণ আবহাওয়া কলুষিত করেছে, ত্রিশ বছর আগে সেরূপ ছিল না। নিদারুণ মতবিরোধ সত্ত্বেও মহাত্মাজীর প্রতি সুভাষচন্দ্রের অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে তাঁর মহত্ত্ব ও সাংস্কৃতিক মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী আজকের কল্পনারও অতীত। সুভাষ-জীবনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, গান্ধীজীকে বা গান্ধীপন্থাকে ছোট করে সুভাষচন্দ্র নিজের মতাদর্শকে বড় করতে প্রয়াস পাননি, করেনওনি।

সুভাষচন্দ্র মহাত্মাজীর প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, নিম্ন ঘটনার মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওযারকিং কমিটির যে বৈঠক ডাকা হয়েছিল, মহাত্মাজীর নির্দেশে সুভাষচন্দ্রকে ওই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। উল্লেখ আছে যে, কংগ্রেসের তৎকালীন দক্ষিণপন্থী নেতাদের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে সে বছরই এপ্রিল মাসে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস-এর সভাপতি-পদ ত্যাগ করেন। পরে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এই মর্মে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় যে, তখন থেকে তিন বছরের জন্য সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস-এর কোনো নির্বাচনী পদে দাঁড়াতে পারবেন না। এই সম্পর্কিত প্রস্তাবটির খসড়া মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং রচনা করেছিলেন। সেদিন ছিল ৯ আগষ্ট, ১৯৩৯ সাল।

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন এরই তিন বছর পরে, ঠিক একই তারিখে অর্থাৎ ৯ আগষ্ট বোম্বাই-এর অধিবেশনে ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রকে একজন একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক মনে করেই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর মতামত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। জাতির চরম সঙ্কটক্ষণে সুভাষচন্দ্র মহাত্মাজীর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেননি। তিনি আমন্ত্রণ পাওয়া মাত্র ওয়ার্ধায় গেলেন। আশ্রমে পৌঁছেই সুভাষচন্দ্র মাথা নত করে গান্ধীজীর চরণে প্রণতি জানান। গান্ধীজীও সস্নেহে সুভাষচন্দ্রের পিঠে হাত বুলিয়ে তাঁর শুভ কামনা ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। এই প্রাণস্পর্শী দৃশ্যটি যাঁরা দেখেছেন তাঁদেরই একজনের কাছে আমি এই ঘটনার কথা শুনেছি। রাজনৈতিক মতবিরোধ সত্ত্বেও ভারত-প্রেমিক এই দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষের মধ্যে এক অনাবিল শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল।

এই প্রসঙ্গে ১৯৪৩ সালের ২ অক্টোবর তারিখে (গান্ধীজীর জন্মদিন) ব্যাঙ্কক থেকে নেতাজীর এক বেতার ভাষণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন: "এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ১৯২০ সালে গান্ধীজী সংগ্রামের এক নতুন অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে না এলে আজও পর্যন্ত ভারতবর্ষ তেমনি শক্তিহীন অবস্থায় পড়ে থাকত। ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁর কর্মোদ্যোগ অদ্বিতীয় ও তুলনাহীন। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে একটি জীবনে কোন মানুষ এতখানি সাফল্য অর্জন করতে পারত না।" নেতাজী আরও বলেন: "১৯২০ সাল থেকে মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে ভারতবাসীরা দু'টি জিনিস শিক্ষা পেয়েছে। সে দু'টি জিনিসই স্বাধীনতালাভের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। প্রথম শিখেছে তারা আত্মসম্মানবোধ ও আত্মবিশ্বাস; যার ফলে তাদের অন্তরে বৈপ্লবিক উৎসাহ ও প্রেরণা জাগ্রত আছে। ...মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতার সোজা পথে আমাদের দৃঢ়পদে চলতে শিখিয়েছেন। তিনি এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আজ কারারুদ্ধ। সেজন্য

যে কাজ মহাত্মা গান্ধী আরম্ভ করেছেন, তাঁর স্বদেশে ও বিদেশে অবস্থিত দেশবাসীদের সে কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে।"

তার পরের বছর আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারত সীমান্তে ইংরেজ সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধরত। ভারতের পূর্ব-সীমান্তে একটা অস্থির উত্তেজনা। ১৯৪৪ সালের ৪ঠা জুলাই ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়দের এক সম্বর্ধনার উত্তরে নেতাজী দেশভক্ত ভারতবাসীকে স্বাধীনতার বিনিময়ে মৃত্যুর আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি মুক্তি-সংগ্রামের সহকর্মীদের উদ্দেশে বলেন: "সকলের উপর একটি জিনিস আজ তোমাদের কাছ থেকে দাবি করব। রক্ত চাই। শত্রু যে রক্তপাত করেছে তার একমাত্র প্রতিশোধ রক্তদান। স্বাধীনতার মূল্য একমাত্র দিতে পারে আমাদের রক্ত।" উদাত্ত কণ্ঠে তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেন: 'আমাকে রক্ত দাও—আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি দেব তোমাদের স্বাধীনতা।"

স্বাধীনতার উন্মত্ততায় নেতাজী তখন বিভোর। তাঁর উদাত্ত আহ্বানে সেদিন ভারতবাসীদের মধ্যে 'কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান' তারি লাগি কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। হাজারে হাজারে বালবৃদ্ধ নরনারী মৃত্যুর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। নেতাজীর মধ্য দিয়ে সেদিন প্রবাসী ভারতীয়রা অন্তর দেবতার আহ্বানই শুনেছিলেন। এরই দু'দিন পর ১৯৪৪-এর ৬ই জুলাই ভারতের স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামের সফল রূপায়ণের জন্য মহাত্মা গান্ধীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে রেডিও মারফত এক ভাষণ দেন। ওই ঐতিহাসিক ভাষণেই নেতাজী মহাত্মাজীকে 'জাতির জনক' রূপে আখ্যা দেন। ঐ ভাষণে কী অবস্থার মধ্যে তিনি ভারতমাতার বন্ধনশৃঙ্খল মুক্ত করার জন্য ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছেন তা বিবৃত করে দিল্লীর বড়লাটের ভবনশীর্ষে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উড্ডীন করার মহান সঙ্কল্প পুনরায় ঘোষণা করেন। এই মহাত্মাজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে নেতাজী বলেন যে, "১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে গান্ধীজী যখন অকুতোভয়ে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছেন, তখন ভারতের বাইরে দেশপ্রেমিক

ভারতীয় এবং ভারতের স্বাধীনতার পক্ষপাতী বিদেশী বন্ধুদের চোখে তাঁর (গান্ধীজীর) মর্যাদা শতগুণে বেড়ে গিয়েছে।”

নেতাজী বলেন যে, এই বিপদসঙ্কুল সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গ্রহণের আগে তিনি এর সকল দিক সতর্কভাবে অনুধাবন করার জন্য বহু দিন, রাত ও মাস অতিবাহিত করেছেন। তিনি বলেন, “আমার সাধ্যানুসারে বহুকাল আমি দেশের জনগণের সেবা করেছি, বিশ্বাসঘাতক হওয়ার কোন অভিপ্রায় নেই বা আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করতে কাউকে সুযোগ দিতেও আমি চাই না।” মহাত্মাজীর মাধ্যমে দেশবাসীর সদাশয়তা ও ভালবাসার জন্য তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে নেতাজী বলেনঃ “জনসেবী হিসাবে সর্বোচ্চ সম্মান আমার ভাগ্যে জুটেছে। বন্ধুর পথ অতিক্রান্ত করে আমার বিদেশ-যাত্রার দ্বারা আমি নিজের জীবন বা ভবিষ্যৎ নয়, তার চেয়েও আমি আমার দলের ভবিষ্যং বিপন্ন করেছি। আমার যদি এতটুকুও আশা থাকত যে, বিদেশ থেকে সংগ্রাম চালান ছাড়া স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হবে, তা হলে সঙ্কটের সময় আমি কখনো ভারত ছেড়ে আসতাম না।’

জীবদ্দশায় স্বাধীনতালাভের আর একটি সুযোগ—বর্তমান বিশ্ব-যুদ্ধের মত আর একটি সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া যাবে এই বিশ্বাস যদি তাঁর থাকত তা হলে নেতাজী স্বদেশ ছেড়ে বাইরে বের হতেন কি না সে বিষয়ে তিনি সন্দেহ পোষণ করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বযুদ্ধে বিপর্যস্ত ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত হেনে খতম করার এটিই স্বর্ণক্ষণ। গান্ধীজীকে তিনি বলেনঃ “আমাদের শত্রুরা যখন ভারত থেকে বিতাড়িত হবে, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা কায়েম হবে, তখনই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকারের লক্ষ্য সিদ্ধ হবে। আমাদের প্রচেষ্টা আমাদের বিপদ ও ত্যাগ বরণের জন্য একটি মাত্র পুরস্কারই কাম্য—দেশমাতৃকার স্বাধীনতা। আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যে, ভারত স্বাধীন হওয়ার পর রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণে ইচ্ছুক।”

নেতাজী বলেন: "ভারতের শেষ স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকগণ সাহসের সঙ্গে ভারতভূমিতে সংগ্রামরত। অপরিসীম দুঃখ এবং কষ্ট সত্ত্বেও তাঁরা ধীরে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। এই সশস্ত্র সংগ্রাম চলবে যতদিন পর্যন্ত না ব্রিটিশ-সন্তান ভারতভূমি থেকে বিতাড়িত হয় এবং ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা নয়াদিল্লীর লাটপ্রাসাদের শীর্ষে উড্ডীন না হয়।"

ভাষণের উপসংহারে তিনি বলেন: "জাতির জনক! ভারতের স্বাধীনতার এই পবিত্র সংগ্রামে আমরা আপনাদের শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি।"

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতাজী গান্ধীজীকে যেমন সু-উচ্চ আসনে বসিয়েছেন তেমনি আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন বিশ্বপথিক বিবেকানন্দকে। নেতাজীর নিজের কথায়: "বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি যেন আত্মহারা হয়ে যাই।"

স্বামীজী জীবিত থাকলে সুভাষচন্দ্র তাঁর চরণে আশ্রয় নিতেন—এই ইচ্ছা ১৯৩২ সালের ৬ই মে 'মারহাটা' কাগজে লিখিত এক প্রবন্ধে তিনি প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন: "স্বামী বিবেকানন্দই বর্তমান বাংলার স্রষ্টা।" আমাদের জগতে এরূপ ব্যক্তিত্ব বাস্তবিকই বিরল।

স্বামীজী ও গান্ধীজী ভারতবর্ষের এই দুই পুরুষের আদর্শ উত্তরসাধক নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

ব্রিটিশ ঐতিহাসিক মাইকেল এডওয়ার্ডস তাঁর The last days of British India নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

"India owes more to Netaji Bose than to any man —even though he seemed to be a failure".

শেষের ক'টি বৎসরের কথা তাই স্মরণ করি—

দীর্ঘদিনের ক্লেশ ও যন্ত্রণার বিনিময়ে দেশবাসী স্বদেশ সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ নেতাকে সর্বোচ্চ সম্মানে অভিষিক্ত করল। রাষ্ট্রপতির শোভাযাত্রায় অগণিত নর-নারী তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করল। সভাপতির অভিভাষণে সুভাষচন্দ্র বললেন :

"...কেবলমাত্র ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমরা সংগ্রাম করছি না, সমগ্র জগতের সর্বমানবের মুক্তির জন্য আমরা সংগ্রাম করছি। ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে বিশ্বমানবের মুক্তির সমস্যা বিজড়িত।"

সুভাষচন্দ্রের এই বাণী আজ সমগ্র বিশ্বের মানবপ্রেমিকের বাণী। সকলের কণ্ঠে এই একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত।

এই সময়টা ছিল মহা সঙ্কটের কাল,—নানা চক্রান্ত ভারতের ন্যায্য দাবি থেকে তাকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করছে। সুভাষচন্দ্র দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়ালেন। তাঁর এই নির্ভীক ভঙ্গী ও স্পষ্টবাদিতা তখন অনেকের কাছে কটু মনে হ'ল; সুতরাং কংগ্রেসের ভিতর অনেকে তাঁকে সইতে পারছিলেন না। এর পর বৎসর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এই বিরোধ আর চাপা রইল না। প্রকাশ্যভাবে তাঁর বিরুদ্ধে ছোট-বড় অনেকেই অনেক কথা বলতে শুরু করলেন। গান্ধীজী চার-আনার সদস্য না হলেও কংগ্রেসের কর্ণধার 'তিনিই—তাঁকে সন্তুষ্ট

রাখতে পারেন নি সুভাষচন্দ্র। তিনি স্পষ্ট গলায় তাঁর বক্তব্য উচ্চারণ করলেন। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের বামপন্থী দলের সমর্থন পেলেন।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রাক্কালে মৌলানা আজাদ, সীতারামাইয়া আর সুভাষচন্দ্রের নাম প্রস্তাবিত হল কংগ্রেস-সভাপতি পদের জন্য। আজাদ সাহেব নাম প্রত্যাহার করলেন। আগে কংগ্রেসের সভাপতি পদের নির্বাচনে ভোটা-ভুটির ব্যাপার ছিল। এইবার সুভাষচন্দ্রের নির্বাচনে নামার ফলে একটা অসন্তোষ ফেটে পড়ল ; বরদৌলি থেকে ওয়ার্কিং কমিটির সপ্ত-সারথি এক বিবৃতিতে সুভাষচন্দ্রকে বক্রোক্তি করলেন। সুভাষচন্দ্র একটা পালটা জবাব দিলেন। স্বয়ং গান্ধীজী বললেন—সুভাষচন্দ্রের পুনর্বার নির্বাচন দেশের পক্ষে ক্ষতিকর।

সুভাষচন্দ্র বললেন: তিনি নিজে সভাপতি হতে চান না, যদি আচার্য নরেন্দ্র দেবের মত কেউ দাঁড়ান তাহলে তিনি সরে দাঁড়াবেন।

সেদিন কিদওয়াই, নরীম্যান, খারে, মাসানী, মেহের আলী প্রভৃতি প্রগতিবাদী নেতৃবৃন্দ সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করলেন। সুভাষচন্দ্রকে নাম প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেওয়া হল। একদিকে প্রবল প্রতাপশালী নেতৃবৃন্দ অপরদিকে একা সুভাষচন্দ্র।

২৯শে জানুয়ারী সভাপতি নির্বাচনের দিন—সুভাষচন্দ্র বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেন। ডাঃ সীতারামাইয়া পেলেন ১৩৭৬ ভোট ; আর সুভাষচন্দ্র পেলেন ১৫৭৫। বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, তামিলনাদ, পাঞ্জাব, কর্ণাটক প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সুভাষচন্দ্র প্রচুর ভোট পেলেন।

তারপর···

সারা দেশে আনন্দের জোয়ার প্রবাহিত হলেও ক্রুদ্ধ হলেন তখনকার নেতৃবৃন্দ। গান্ধীজী বললেন : এই পরাজয় আমার পরাজয়। কংগ্রেসে বহু ভুয়া-ভোট আছে···হাজার হোক সুভাষবাবু দেশের শত্রু নন। যাঁরা কংগ্রেসে থাকা অস্বস্তিকর মনে করবেন তাঁরা চলে আসবেন—ইত্যাদি। এর পর ওয়ার্কিং কমিটির বারো জন সদস্য

পদত্যাগ করলেন। এই সময় সুভাষচন্দ্র বিশেষ পীড়িত ও উদ্‌বেগ-আকুল; কিন্তু রাজনীতিতে সহানুভূতি ও সহৃদয়তার স্থানে নেই।

ত্রিপুরীতে অসুস্থ দেহ নিয়ে সুভাষচন্দ্র উপস্থিত হলেন এ্যাম্বুলেন্সের সওয়ারী হয়ে। ত্রিপুরীতে গান্ধীজী এলেন না। বললেন: তুমি ডাক্তারকে উপেক্ষা করতে পারো, আমি পারি না।

এই সময় সুভাষচন্দ্র সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন: "ব্রিটিশ গর্ভনমেণ্টকে চরমপত্র দেওয়া হোক, ৬ মাসের মধ্যে স্বাধীনতা না দিলে আমরা আন্দোলন শুরু করব ব্রিটিশকে দেশ থেকে তাড়ানোর জন্য।"

এই আবেদন উপেক্ষিত হল। আর সুভাষচন্দ্রের এই আলটি-মেটামের শেষ দিনটিতেই ১৮৩৯-এ পৃথিবীব্যাপী মহাসমর শুরু হল।

বিরূপতার ফলে সুভাষচন্দ্র সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন ওয়েলিংটন পার্কে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায়। দক্ষিণপন্থীর জয়-জয়কার। বাকী সময়টুকুর জন্য সভাপতি হলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

সুভাবচন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করলেন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে। প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী অনেকে এই দলে যোগ দিলেন।

এর পরের বছর কংগ্রেস অধিবেশন বসলো রামগড়ে। এর কাছেই বসলো সুভাষচন্দ্রের আপস-বিরোধী সম্মেলন। রামগড়ে কংগ্রেসের সমতুল এক বিরাট অধিবেশনের ব্যবস্থা হল। অনেক চেষ্টা করেছিলেন এই সম্মেলন ব্যর্থ করার; কিন্তু সুভাষচন্দ্রের নামের যাদু আছে—এই অধিবেশন সফল হলো। তাঁর একক প্রচেষ্টায় এই সম্মেলন এক ঐতিহাসিক সাফল্য লাভ করল। সুভাষচন্দ্রের কর্মশক্তির সবাই প্রশংসা করলেন। রামগড় সুভাষচন্দ্রকে গৌরবান্বিত করল।

এর পর হলওয়েল মনুমেণ্ট আন্দোলন। এই আন্দোলনটিকেও অনেকে উপহাস করলেন। বাঙালী নবাব সিরাজউদ্দৌলার কলঙ্ক হিসাবে এই মনুমেণ্ট কলকাতার বুকে মিথ্যার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের চেষ্টা জয়যুক্ত হল। মনুমেণ্ট অপসারিত হল। সুভাষচন্দ্র তখন কারাগারে।

আবার মুক্তি পেলেন সুভাষচন্দ্র। তিনি এইবার খুব অসুস্থ। পরিচিতরা এসে দেখে যায়। বাড়ির দরজায় পুলিশের কড়া পাহারা। মাথার উপর তিন-চারটে মামলা-ঝুলছে।

হঠাৎ ১৯৪১-এর জানুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনের সময় জানা গেল তিনি নিরুদ্দেশ। কোথায় সুভাষচন্দ্র। তুমি নয়, আমি নই, যাঁকে কোটি কোটি মানুষ চেনে তিনি কোথায়।

আবার ইন্দ্রজাল।

শিবাজীর মত সুভাষচন্দ্রও অদৃশ্য—একথা বললেন প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

গেলেন কি করে? কোনো সন্ধান নেই। পুলিশ হতভম্ব। সরকারী বড়কর্তারা ফাঁপরে পড়লেন—শোনা গেল হয়ত রোম, বার্লিন কিংবা টোকিও। সাবমেরিনে গেছেন হয়ত। কেউ বলল স্ত্রীলোক সেজে আফগানিস্থানের ভেতর দিয়ে গেছেন, কেউ বলল পদব্রজে হিমালয়ের পারে…

গুজবের শেষ নেই।

তারপর যখন রেডিওতে শোনা গেল—"আমি সুভাষ বলছি,…" আজও লোকের বিশ্বাস হয় না। সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর নকল হতে পারে, কিন্তু বক্তব্য যে তাঁর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নিষিদ্ধ বেতারের সংবাদ ভারতের মানুষ দিনের পর দিন শুনেছে। ইতিহাসে অসংখ্য নজীর আছে বিদেশী রাষ্ট্রের সহায়তায় স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন করার। সুভাষচন্দ্র সেই চেষ্টাই করলেন। ইতিহাস তাঁর কর্মকাণ্ডের শ্রেষ্ঠ বিচারক।

পার্ল হারবারের পর সুভাষচন্দ্র জার্মানী ছেড়ে টোকিও চলে এলেন সাবমেরিনে বসে। তারপর ধীরে ধীরে সংবাদ এসেছে আজাদ হিন্দ ফৌজের। সুভাষচন্দ্রের অসংখ্য শত্রু, তাঁরা রটনা করলেন—তিনি শত্রুর চর, কুইসলিং, পঞ্চমবাহিনীর কর্তা। এমন কি, ইম্ফলের রণাঙ্গনে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল আর্মির নাম হল ইম্পিরিয়াল নিপ্পন

আর্মি। তাই সুভাষচন্দ্র আই. এন. এ.-এর পরিবর্তে আজাদ হিন্দ ফৌজ নামটাই বেশি পছন্দ করতেন।

এই বিরাট বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

শিবাজী একদিন ধর্মরাজ্য গঠনে বিচ্ছিন্ন ভারতকে বাঁধার চেষ্টা করেছিলেন—সে ধর্ম জাতীয়তার ধর্ম। সুভাষচন্দ্র সেই স্বপ্নকে সফল করার প্রয়াস করেন। সহায়-সম্বলহীন একজন মানুষ, বিদেশের ভূমিতে কেবলমাত্র নিজের শক্তি, চারিত্রিক দৃঢ়তা, অসামান্য মনোবল আর আত্মত্যাগের ফলে অসম্ভবকে সম্ভব করলেন। তাঁর কর্মশক্তির প্রমাণ আজাদ হিন্দ ফৌজ। সুভাষচন্দ্র যে কারো তাঁবেদার ছিলেন না তার প্রমাণ পাওয়া গেছে লালকেল্লার বিচারসভায় আর সেইকালের অসংখ্য নথিপত্রে।

সুভাষচন্দ্র বলতেন: "করো সব নীচবর আউর বনো ফকির"—সব বিসর্জন দিয়ে ফকির হও। তাই তাঁর আহ্বানে সেদিন ভারতীয়রা ছুটে এসেছে আর সেই সঙ্গে চীন, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতির জনগণও তাঁকে সমর্থন জানিয়েছে। শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

মহাবিপ্লবী সুভাষচন্দ্র সভায় দাঁড়িয়েছেন—দৃঢ়-দীপ্ত ভঙ্গী। অনমনীয় উচ্চশির আর মুখে ভুবন-ভোলানো হাসি। সুভাষচন্দ্র এক দিনে সকলের চিত্ত জয় করেছিলেন। এই সেই নেতা যিনি লক্ষ্যপথে নিয়ে যেতে পারেন। এই সেই নেতা যিনি লক্ষ্যভেদের জন্য উপযুক্ত তীরের সন্ধান জানেন।

সুভাষচন্দ্র আজ তাই উপকথার নায়কে রূপান্তরিত। আজ হিন্দ রণাঙ্গনের যে বিবরণ পাওয়া গেছে তা মানবিকতার স্পর্শে এক পবিত্র স্মৃতির স্বাক্ষর বহন করে এনেছে।

তিনি কখনও কাউকে সোনার স্বপন দেখানোর প্রতিশ্রুতি দেননি। বলেছেন—"এই পথ বন্ধুর, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। তোমরা আমাকে রক্ত দাও।"

লক্ষ কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হল—নেতাজী জিন্দাবাদ।

এই তো শেষের ক'টি উজ্জ্বলতম মুহূর্ত। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এই পর্বটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চার্চিল বলেছিলেন, "আমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে দেউলিয়া করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিনি।' কিন্তু মহাযুদ্ধের শেষে তাঁকে সরতে হল আর ভারত স্বাধীনতা পেল। জিন্না সাহেবের ভাষায় মথ ইটন ট্রানকেটেড—পাকিস্তানের মত ট্রানকেটেড স্বাধীনতা। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অবদান ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে অবিস্মরণীয়—একথাই আজ বিদেশী ইতিহাসকারদের বলতে হচ্ছে। শেষের ক'টি বৎসর ভারতের ইতিহাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদ এবং সেই অংশটুকু জুড়ে আছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁর বাল্যবন্ধু সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে এক নিবন্ধে লিখেছেন : 'সুভাষ জন্মেছিল মহাজনের দীপ্ত শিখা নিয়ে, তাই তার আলোয় এত বন্যা, মনে ফুটেছিল বীর্যের ফুল, ত্যাগের ফুল, ধর্ম-বিশ্বাসের ফুল।' বিশ্ববাসী সুভাষচন্দ্রের নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও অমিতবীর্যের কথা জানেন। কিন্তু তিনি এই বীর্য ও ত্যাগের প্রেরণা যে পেয়েছিলেন প্রবল ধর্মবিশ্বাস থেকে একথা অস্বীকার করলে চলবে না। সুভাষ-চন্দ্রের লেখা "পত্রাবলী"র প্রথম ন-খানা চিঠির ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে কিশোর সুভাষের অধ্যাত্ম ভক্তিবিশ্বাস। দু-একটা দৃষ্টান্ত দিলে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দ, এই এক বছর কটক প্রবাসী সুভাষচন্দ্র তাঁর মা প্রভাবতী বসুকে অনেকগুলো চিঠি লিখেছিলেন। এক সংখ্যক চিঠি, তিনি মা-কে লিখছেন :

> আজ নবমী, সুতরাং আপনি এখন দেশে—দেবীর আরাধনায় নিমগ্ন আছেন। এ বৎসর বোধ হয় পূজা বেশি জাঁকজমকে সম্পন্ন হইবে। কিন্তু মা, জাঁকজমকে প্রয়োজন কি? যাঁহাকে আমরা ডাকি—তাঁহাকে যদি প্রাণ খুলিয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে ডাকিতে পারি তাহা হইলে যথেষ্ট হইল; আর অধিক কি প্রয়োজন? যে পূজায় আমরা ভক্তি-চন্দন ও প্রেমপুষ্প ব্যবহার করিতে পারি তাহাই জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা। —পৃষ্ঠা ১

এই একই সময়ে সুভাষচন্দ্রের মনে হয়েছিল নিরামিষ আহারই ভালো। মা-কে চিঠি লিখছেন :

আমি নিরামিষাশী হইতে চাই, কারণ "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"

একথা আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন। কেবল শাস্ত্রকারেরা বলেন নাই—স্বয়ং ঈশ্বর একথা বলিয়াছেন। আমাদের কি অধিকার আছে যে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টি নষ্ট করিব? তাহাতে কি ঘোর পাপ হয় না?—পত্র ২, পৃষ্ঠা ৪

কিন্তু মাতৃভক্ত পুত্র মাতৃহৃদয়ে দুঃখ দিয়ে আমিষ আহার ত্যাগ করতে চান না। তিনি পত্রের শেষে লিখলেন: 'আপনাদের বিনা অনুমতিতে আমার কিছু করিতে প্রবৃত্তি হয় না।'

আর একখানি চিঠি। এ চিঠিটাও সুভাষচন্দ্র কটক থেকে মা-কে লিখছেন:

> ভগবানের দয়ার অভাব নেই—দেখিতে বসিলে জীবনের প্রতি মুহূর্তে তাঁহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে আমরা অন্ধ, অবিশ্বাসী, ঘোর নাস্তিক, তাই তাঁহার দয়ার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি না।···দুঃখে পড়িলে তাঁহাকে ডাকি—অনেকটা প্রাণ খুলিয়া ডাকি—কিন্তু যেই দুঃখ দূর হইল—যেই সুখের আলোক আসিতে লাগিল—অমনি আমাদের ডাকা বন্ধ হইল আর আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া গেলাম। এই জন্যই ত কুন্তীদেবী বলিয়াছিলেন, "হে ভগবান্! আমাকে সর্বদা বিপদের মধ্যে রাখিও; তাহা হইলে আমি তোমায় সর্বদা প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিব, সুখের সময় তোমাকে ভুলিয়া যাইতে পারি—অতএব আমার সুখে প্রয়োজন নাই।"—পত্র ৪, পৃষ্ঠা ৭

অধিকাংশ হিন্দু জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। যদি আমরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হই তাহলে স্বীকার করব: একটি পনেরো-ষোলো বছরের কিশোরের কোমল হৃদয়ে এ ধর্মভাব জেগেছিল শুধুমাত্র পূর্ব-জন্মের সুকৃতির ফলেই। সত্যিই মানুষ দুঃখে না পড়লে ঈশ্বরের কথা চিন্তা করে না। সুভাষচন্দ্র আশৈশব ধর্মভীরু ছিলেন বলেই ধর্মের পরম সত্য তাঁর হৃদয়ে অনুরণিত হত। এ কথার নজির 'পত্রাবলী'-র চার চার-সংখ্যক চিঠি। সুভাষচন্দ্র মাকে লিখছেন:

জন্ম-মৃত্যু লইয়া এ জীবন—তাহাতে একমাত্র সার জিনিস—হরিনাম। তাহা না করিতে পারিলে জীবন নিরর্থক। আমাতে পশুতে প্রভেদ এই যে পশুরা ভগবানকে বুঝিতে বা বুঝিয়া ডাকিতে পারে না আর আমরা চেষ্টা করিলে তাহা পারি। তবে এ ভবে আসিয়া যদি ভগবানের নাম না করিতে পারিলাম তবে এখানে আসা আমার বিফল হইল।—পৃষ্ঠা ৭

এই একই চিঠিতে তিনি লিখছেন :

এখন চাই কেবল বিশ্বাস—অন্ধ বিশ্বাস – শুধু "হরি আছেন" এই বিশ্বাস ; আর কিছু চাহি না। ভক্তি বিশ্বাস হইতে আসিবে এবং জ্ঞান ভক্তি হইতে আসিবে। মহর্ষিগণ বলিয়াছেন—"ভক্তির্জ্ঞানায় কল্পতে"– ভক্তি জ্ঞানের জন্য ধাবিত হয়।—পৃষ্ঠা ৭

ইস্কুলের গণ্ডি যিনি ছাড়ান নি এমন একটি কিশোরের মনে কী আশ্চর্য ভক্তিভাব জাগতো তা ভাবলে বিস্ময়ে অবাক্ হতে হয়। যাঁর রক্তে অধ্যাত্মবোধের স্রোত নিয়ত প্রবহমান একমাত্র তাঁর পক্ষেই এ-উক্তি সম্ভব : 'চাই কেবল বিশ্বাস—অন্ধ বিশ্বাস···ভক্তি বিশ্বাস হইতে আসিবে এবং জ্ঞান ভক্তি হইতে আসিবে।' হীরের মতো দ্যুতিময় আরো পঙ্‌ক্তি আছে এই একই চিঠিতে :

লেখা-পড়া শিখিয়াও কেহ যদি হীনচরিত্র হয় তবে তাহাকে কি পণ্ডিত বলিব ? কখনই না। আর যদি কেহ মূর্খ হইয়াও বিবেকাধীন হইয়া চলিতে পারে এবং ভগবদ্‌বিশ্বাস ও ভগবৎ-প্রেমিক হইতে পারে তবে তাহাকে বলিব মহাপণ্ডিত। দুই চার কথা শিখিলেই কি জ্ঞানী হয়—প্রকৃত জ্ঞান—ঈশ্বরজ্ঞান। আর সমস্ত জ্ঞান—অজ্ঞান।···ভগবানের নাম স্মরণে যাহার চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হয় আমি তাহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করি। মেথর হইলেও আমি তাহার পদরেণু বক্ষে ধারণ করিতে চাহি। আর একবার "দুর্গা" বা একবার "হরি"

বলিলে যাহার ধর্ম্ম, অশ্রুত্যাগ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ আবির্ভূত হয়, তাহার ত কথাই নাই—সে স্বয়ং ভগবান্। - পৃষ্ঠা ৯

মায়ের সঙ্গে পুত্রের বাঙালী প্রসঙ্গে এক অন্তরঙ্গ আলোচনার চিত্র পাই পাঁচ সংখ্যক চিঠিতে। এ চিঠিতে সুভাষচন্দ্র স্নেহময়ী মায়ের কাছে স্বজাতি প্রসঙ্গে আপন মত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে মায়ের মত জানতে চেয়েছেন :

আমি প্রায় ভাবি - বাঙালী কবে মানুষ হইবে · কবে ছার টাকার লোভ ছাড়িয়া উচ্চ বিষয়ে ভাবিতে শিখিবে কবে সকল বিষয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিখিবে—কবে একত্র শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে শিখিবে - কবে অন্যান্য জাতির ন্যায় নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া নিজেকে "মানুষ" বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে। আজকাল বাঙালীদিগের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা পাইয়া নাস্তিক ও বিধর্মী হইয়া যায় দেখিলে বড় কষ্ট হয়। আজকাল বাঙালীরা বাবুয়ানি ও বিলাসিতার স্রোতে ভাসিয়া গিয়া নিজের মনুষ্যত্ব হারাইতেছে—দেখিলে বড় কষ্ট হয়। আজকাল বাঙালীরা নিজের জাতীয় পরিচ্ছদকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে—দেখিলে বড় কষ্ট হয়। বাঙালীদের মধ্যে সবল, সুস্থ এবং বলিষ্ঠকায় লোক খুব কমই আছে—দেখিলে প্রাণে কষ্ট হয়।··· বাঙালীরা আজকাল হইয়াছে—বিলাসিতাপ্রিয়, পরচর্চাকারী, কুটিলহৃদয়, পর-সুখদ্বেষী এবং মনুষ্যত্ববিহীন — মা, ভাবিলে বড় কষ্ট হয়। আমরা পড়িতেছি - সম্মুখে যদি চাকরির এবং অর্থের লোভ থাকে—তাহা হইলে কি লেখাপড়া - তাহা হইলে কি মনুষ্যত্বের অধিকারী হইতে পারা যায়? মা, বাঙালী কি কখনও মানুষ হইতে পারিবে? আপনার কি মত?—পৃষ্ঠা ১৩

শৈশব থেকেই সুভাষচন্দ্র মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধার চোখে

দেখতেন। পরাধীন ভারতভূমি তাঁর কাছে ছিল বড় আদরের দেশ। তিনি ছয় সংখ্যক চিঠি শুরু করেছেন :

> মা, ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান—এই মহাদেশে লোকশিক্ষার নিমিত্ত ভগবান যুগে২ অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্টা ধরণীকে পবিত্র করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মের ও সত্যের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতার রূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এতবার তিনি কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই—তাই বলি, আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ।—পৃষ্ঠা ১৪

সুভাষচন্দ্রের শান্ত ভাবাবেগ, অপূর্ব রচনাশৈলী ও সুন্দর চিত্রকল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাঁর অসংখ্য চিঠির মধ্যে ছড়িয়ে আছে তথাপি ছয় সংখ্যক চিঠিখানার (১৪-১৮ পৃষ্ঠা) তুলনা হয় না। একটি কিশোর ভবিষ্যতে যিনি জন-গণ-মনের অধিনায়ক হবেন তারই সাক্ষ্য বহন করে আলোচ্য পত্রখানি।

"পত্রাবলী" শুধু সুভাষচন্দ্রের আধ্যাত্মিকতা বিশ্লেষণের পরিচিতি নয়, "পত্রাবলী"-র নানা পত্রে গভীরভাবে ভাববার কথাও আছে। কৈশোরে সুভাষচন্দ্রকে 'বাবু' কথাটা বিশেষভাবে ভাবাতো। 'বাবু' বলতে তিনি কী মনে করতেন তা তাঁরই ভাষায় উদ্ধৃতি দিলুম :

> ভগবান কলিযুগে একটি নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহা অন্য কোনও যুগে ছিল না। সেই নূতন—"বাবু"-সৃষ্টি। আমরাই সেই "বাবু" সম্প্রদায়ভুক্ত। আমাদের ঈশ্বরদত্ত পদযান আছে কিন্তু আমরা ২০।২২ ক্রোশ হাঁটিয়া যাইতে পারি না—কারণ আমরা "বাবু"। আমাদের দুইটি অমূল্য হস্ত আছে—কিন্তু আমরা শারীরিক পরিশ্রমে কুণ্ঠিত হই—আমরা হস্তের উপযুক্ত ব্যবহার করি না—কারণ আমরা "বাবু"। আমাদের এই ঈশ্বরদত্ত সবল দেহ আছে কিন্তু আমরা শারীরিক

পরিশ্রমকে "ছোটলোকের কাজ" বলিয়া ঘৃণা করি, কারণ আমরা "বাবুলোক"। আমরা সব কাজে চাকরকে হাঁক মারি—আমাদের হাত পা চালাইতে যে কষ্ট হয়—কারণ আমরা যে "বাবু"। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মিলেও আমরা গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারি না, কারণ আমরা "বাবু"। আমরা সামান্য শীতকে এত ভয় করি যে সর্বাঙ্গ বোঝায় চাপাইয়া রাখি, কারণ আমরা "বাবু"। আমরা সর্বত্র "বাবু" বলিয়া পরিচয় দিই, কারণ আমরা "বাবু"। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমরা মনুষ্যত্বহীন মনুষ্যরূপধারী পশু।—পত্র ৫, পৃষ্ঠা ১২

"পত্রাবলী"-তে এ ধরনের দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। আমি উদাহরণের বোঝা আর বাড়ালুম না।

সুভাষচন্দ্র বসুর "পত্রাবলী"-র অধিকাংশ পত্রে যে দুঃখ-বেদনা প্রকাশ পেয়েছে তা মূলত ধর্মের সঙ্গেই জড়িত। এ সুর পরে তাঁর যৌবনে রাজনীতির চাপে কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে, কিন্তু তিনি গীতা পাঠ ছাড়তে পারেননি। সুদূর মান্দালয় কারাপ্রাচীরের অন্তরালে তিনি নিয়মিত গীতা পাঠ করতেন একথা সুভাষ-অনুরাগী মাত্রই জানেন।

"পত্রাবলী"-র শ্রেষ্ঠ চিঠিগুলো মায়ের উদ্দেশে লেখা। তারপরই উল্লেখ করতে হয় সুভাষচন্দ্রের মেজবৌদিকে লেখা চিঠিগুলোর। সুভাষচন্দ্র মেজবৌদিদি বিভাবতী বসুকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করতেন। মেজবৌদির কাছে তিনি সর্বদা অকপট ছিলেন। মান্দালয় জেল অথবা শিলং প্রভৃতি স্থান থেকে মেজবৌদিকে তিনি যে চিঠিগুলো (৮০, ৮৩, ৯২, ১৩৬ ইত্যাদি সংখ্যক) লিখেছিলেন তা "পত্রাবলী"-তে স্থান পেয়েছে। ৮৩ সংখ্যক চিঠির এক জায়গায় মেজবৌদিকে তিনি লিখছেন :

এখানে দুর্গাপূজার আয়োজন করা হচ্ছে। আশা করি এখানেই

মায়ের পূজা করতে পারব …পূজার কাপড় এখানে পাঠাতে যেন ভুল না হয়—বিজয়া দশমী যখন এখানেই কাটবে।

—পৃষ্ঠা ১৭৩

মেজবৌদিকে লেখা আর একটা চিঠি :

আপনার প্রেরিত পাঞ্জাবী কয়েকদিন হ'ল পেয়েছি। পার্শ্বেলটা পেয়েই বুঝতে পারি যে বাড়ির সূতার তৈয়ারী…

পাঞ্জাবীটি খুব সুন্দর হয়েছে এবং আমি পরেই লিখছি। নিজের হাতের রান্না যেমন পরের রান্নার চেয়ে দশগুণ মিষ্ট লাগে নিজের হাতে তৈয়ারী কাপড় তেমনি পরের তৈয়ারী কাপড়ের চেয়ে দশগুণ সুন্দর বোধ হয়। পত্র ৯২, পৃষ্ঠা ২০৭

সুভাষচন্দ্র বসু আমাদের কাছে রাজনীতিবিদ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক "নেতাজী" হিসেবেই পরিচিত। কিন্তু ওই দুটো পরিচয় ছাড়াও তাঁর চরিত্র যে আরও নানা গুণে বিভূষিত ছিল তার নানান পরিচয় পাই "পত্রাবলী" পড়লে।

চিঠিপত্র বক্তিমানসের পরিচয় বহন করে। "পত্রাবলী" ও সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিমানসলোকের ক্রমবিবর্তন সাধারণের কাছে পরিচিত করতে সাহায্য করে, তাই সুভাষচন্দ্রের "পত্রাবলী"-র মূল্য অপরিমেয়। এবং এই কারণেই বাঙলা পত্র-সাহিত্যে সুভাষচন্দ্র বসুর 'পত্রাবলী" এক উল্লেখ্য সংযোজন ও বাঙলা সাহিত্যের এক সম্পদ বিশেষ।

যে কোন যোদ্ধার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি স্থিরীকৃত হয় তাঁহার প্রতিপক্ষের শক্তি, সামর্থ্য ও চরিত্রবলের অনুপাতে। যিনি যত বড় প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিতে পারেন তিনি তত বেশি যশস্বী হন। অধ্যাপক ওটেনের সহিত সুভাষচন্দ্রের যে সংঘর্ষ বাধিয়াছিল তাহা কেবল মাত্র নেতাজীর ব্যক্তিগত জীবনে নহে, পরন্তু জাতীয় জীবনেরও এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সুভাষচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তিনি ধীর, গম্ভীর ও সংযত প্রকৃতির ছাত্র ছিলেন। হটকারিতার প্রভাবে একটা অন্যায় কাজ করিবার মত পাত্র তিনি ছিলেন না। তিনি যখন কলেজে পড়েন তখন ভগিনী নিবেদিতার Aggressive Hinduism-য়ের বাণী আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছিল। নীরবে বিদেশীর কাছ হইতে অপমান সহ্য যে শুধু কাপুরুষতা নহে, পরন্তু নৈতিক মেরুদণ্ড-বিহীনতার পরিচায়ক, সেকথা তরুণ সুভাষচন্দ্র মনে মনে অনুভব করিয়াছিলেন। তাই তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাকে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার অধ্যাপক ওটেনের গায়ে হাত তুলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই অধ্যাপকটির পুরা নাম এডওয়ার্ড ফার্লে ওটেন (Edward Farley Oaten)। তিনি গ্রীক্ ও রোমান্ সাহিত্যে এবং ইতিহাসে সমান পারদর্শিতা দেখাইয়া ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে প্রবেশ করেন ও কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের পদ লইয়া কর্মজীবন শুরু করেন। পরে তিনি শিক্ষাবিভাগের অধিনায়ক, ডাইরেক্টর অব্ পাবলিক্ ইন্‌সট্রাকসন পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত Anglo Indian Literature, Glimpses of India's History

এবং European Travellers in India গ্রন্থগুলি দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। কিন্তু তিনি যে উচ্চস্তরের কবিও, একথা আমার জানা ছিল না। আর ইহাও আমি অবগত ছিলাম না যে, তিনি আজও বাঁচিয়া আছেন।

আমার আচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য শ্রীযুক্ত প্রথমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি. লিট্., এস্ এল্. ভি. বিদ্যাবাচস্পতি মহোদয়ের নিকট ঐ দুইটি খবর পাইলাম। তিনি আবও বলিলেন যে, ওটেন সাহেবের তিনি প্রথম ভারতীয় ছাত্র এবং তিনি ওটেনকে বাংলা ভাষা শিখাইয়া গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধ বাধিবার কয়েক মাস পূর্বে ওটেন তাঁহাকে বাংলা ভাষায় দুই পৃষ্ঠাব্যাপী যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন তাহাও আমাকে তিনি দেখাইলেন। সুন্দর বাংলা হস্তাক্ষর, সাধুভাষায় লেখা আন্তরিকতাপূর্ণ পত্র কিন্তু নামটি সই ইংরাজীতে। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, এখন ওটেনের বয়স ৮৫ বৎসর, আর তাঁহার বয়স ৭৬। ষাট বছর আগে উভয়ের মধ্যে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হইলেও আজও তাঁহারা বছরে দুই-তিনখানি পত্র বিনিময় করেন, আর একখানি চিঠি প্রায় কুড়ি পৃষ্ঠাব্যাপী হয়, উভয় পক্ষেরই। আজকালকার দিনে ছাত্র-অধ্যাপকের মধ্যে এমন স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক কল্পনা করা কঠিন।

শ্রীযুক্ত প্রথমবাবু বলিলেন, গত বৎসর ওটেন সাহেব তাঁহাকে তাঁহার স্বরচিত এক কবিতার বই উপহার পাঠাইয়াছেন ও তাহাতে সুভাষচন্দ্র বসু শীর্ষক একটি কবিতা আছে। এই কথা শুনিয়া আমার অত্যন্ত কৌতূহল জাগিল—যাঁহার হাতে সাহেব মার খাইয়াছিলেন তাঁহার সম্বন্ধে তিনি সুদীর্ঘকাল বাদে কি লিখিয়াছেন দেখিবার জন্য আকুল হইয়া আমার আচার্যদেবকে সেই কবিতাগ্রন্থ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম। তিনি নিজে যখন খুঁজিয়া পাইলেন না তখন তাঁহার সহকারীকে ডাকাইলেন। কয়েকটি চামড়ার স্যুটকেস হাতড়াইবার পর ছোট্ট বইখানি মিলিল। নাম

Song of Aton and other Verses. ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সেকেন্দ্রাবাদে মুদ্রিত। ওটেন সাহেব ইংলণ্ডে বসবাস করেন, অথচ তাঁহার বই এদেশে কেন ছাপা হইল তাহার কোন কারণ আচার্যদেব বলিতে পারিলেন না। তবে তিনি বইখানি বিলাত হইতে জাহাজী ডাকে পাইয়াছেন ও বইয়ের সঙ্গে পাঠানো চিঠিও তাহার সাক্ষ্য দিল।

ঐ কাব্যগ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত কবিতাটি আছে—

Subhash Chandra Bose
oblit 1945

Did I once suffer, Subhash, at your hand ?
Your patriot heart is stilled ! I would forget !
Let me recall but this, that while as yet
The Raj that you once challenged in your land
Was mighty, Icarus—like your courage planned
To meet the skies, and storm in battle set
The ramparts of high Heaven, to claim the debt
Of freedom owed, on plain and rude demand.
High Heaven yielded, but in dignity
Like Icarus, you sped towards the sea
Your wings were melted from you by the sun,
The genial patriot fire that brightly glowed
In India's mighty heart and flamed and flowed
Eorth from her Army's thousand victories won !

কবিতাটির প্রতি ছত্রে সুভাষচন্দ্রের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি গ্রীক আখ্যায়িকায় আইক্যারাসের সহিত সুভাষচন্দ্রের তুলনা করিয়াছেন। আইক্যারাস্ ছিলেন ডিডালাসের পুত্র। তিনি যখন ক্রীট দ্বীপ হইতে উড়িয়া যাইবার সংকল্প করিয়াছিলেন তখন

তাঁহার পিতা তাঁহার গায়ের সঙ্গে গালা দিয়া তৈয়ারী দুইখানি পাখা জুড়িয়া দিয়া বলিয়াছিলেন তিনি যেন বেশী উপরে উঠিবার চেষ্টা না করেন। আইক্যারাস্ পিতার এই উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি এত উপরে উঠিয়াছিলেন যে, সূর্যের তাপে তাঁহার পাখা দুইখানি গলিয়া গিয়াছিল ও তিনি সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলেন। ঐ সমুদ্র তাঁহার নাম অনুসারে আইকেরিয়ান সাগর নামে এখন পরিচিত। সমুদ্র হইতে তাঁহার মৃতদেহ যখন তীরে ভাসিয়া আসিল তখন হিরাক্লিস স্বয়ং তাহা কবরস্থ করেন। গ্রীক্ উপকথা অনুসারে আকাশে উড়িবার প্রথম উদ্যম করেন আইক্যারাস্।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক ওটেন যখন সংবাদপত্রে পড়িলেন যে, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির নেতা সুভাষচন্দ্র বসু বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন তখন তাঁহার স্মৃতিতে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের ঘটনা ভাসিয়া উঠিল। তিনি প্রথমেই নিজেকে প্রশ্ন করিলেন— "সুভাষ! তোমার হাতেই কি আমি একদিন লাঞ্ছিত হইয়াছিলাম? তোমার সেই স্বদেশভক্ত হৃদয়ের গতিবেগ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। একথা যে ভুলিতে পারিলেই ভাল হইত। আজ মনে পড়ে যে তোমার দেশে তুমি যে রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলে তাহা ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু তুমি সাহসের সহিত আইক্যারাসের মতন আকাশে উঠিয়া অমরাপুরীর দুর্গপ্রাচীর সংগ্রামের মধ্যে ভাঙিয়া ফেলিবার দুর্জয় সাহসময় সংকল্প করিয়াছিলে। তোমার উদ্দেশ্য ছিল তোমার দেশের যে স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছিল ও যাহার জন্য নিয়মতান্ত্রিক (plain) এবং রূঢ় (rude) রক্তাক্ত দাবি করা হইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া পাওয়া। ক্যাবিনেট মিশন পাঠাইয়া সেই রাজশক্তি (High Heaven) তোমাদের দাবি মানিয়া লইতে রাজী হইয়াছিল; কিন্তু তোমার সম্মান ও মর্যাদাবোধ তোমাকে আইক্যারাসের মতন সমুদ্রের অভিমুখে চালিত করিয়াছিল। তোমার পাখা সূর্যের তাপে গলিয়া গেল। ঐ তাপ হইতেছে ভারতমাতার

বিশাল হৃদয়ে যে স্বদেশভক্তির আগুন প্রোজ্জ্বলভাবে দীপ্তি পাইতেছিল তাহাই। ভারতীয় সেনাদলের সহস্র বিজয়ে ঐ দীপ্তি ভাস্বররূপে প্রবাহিত হইয়াছিল।

ভারতবাসী মুক্তি অভিযান ও তাহার অদ্বিতীয় অধিনায়কের প্রতি কী অকপট শ্রদ্ধার্ঘ্য একদা নির্যাতিত ওটেন সাহেব প্রদান করিয়াছেন! যে সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে সুভাষচন্দ্র ওটেনকে ধাক্কা মারিয়া ভূপাতিত করিয়াছিলেন সে সময় একজন উচ্চপদস্থ খাস ইংরাজের গায়ে প্রকাশ্যে হাত তোলা শাসক সম্প্রদায়ের পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক ছিল। সেই লাঞ্ছনা ও নির্যাতন ভোগ করা সত্ত্বেও ওটেন যে কবিতা রচনা করিতে পারিয়াছেন তাহা তাঁহার অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচায়ক। বোধহয় সুভাষচন্দ্রের অপূর্ব ত্যাগ, অনন্যসাধারণ সংগঠনী প্রতিভা ও অভূতপূর্ব সাহস ওটেনের ভাবরাশিকে উদ্বেল করিয়া কবিতার আকার পরিগ্রহ করিয়াছে।

মান্দালয় জেল।

দীর্ঘ কারাবাসকালে এখানে বসে গীতা-ভাষ্য লিখেছিলেন তিলক। লোকমান্য তিলক।

কণ্টকাসনে ধ্যানে বসেছিলেন পরাধীন ভারতের এক অগ্নিঋষি। সহস্র নিপীড়নে অনির্বাণ এক প্রাণশিখা। স্থির। অকম্পিত।

নিজের হাতে একটি লেবু গাছ পুঁতেছিলেন তিলক।

সুভাষকে যখন বন্দী করে আনা হ'লো, গাছে তখন ফুল ফুটেছে, ফল ধরেছে।

সুভাষের সঙ্গে আছে মহারাজ। বীর বিপ্লবী ত্রৈলোক্য মহারাজ।

মহারাজ সুভাষকে বলেন, আচ্ছা, এতোবড়ো ঘরের ছেলে আপনি, কতো সুখেই না দিন কাটিয়েছেন, জেলের এই কষ্ট সইছেন কি করে?

সুভাষ হাসিমুখে জবাব দেয়, আপনারা যেভাবে সইছেন, আমারও সেই ভাব। আমরা সবাই দেশের জন্যে।

দেশের জন্যে ভালবাসা। ভালবাসার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ। তাই এক পথ। এক শপথ।

সুভাষ তো সু-ভাষ। মুখের কথায় বুকের ভালবাসায় সে সবাইকে জয় করেছে। জেলের মধ্যেও সবাইকে। চাকর-বাকর সাধারণ কয়েদীদের পর্যন্ত।

টেনিস খেলতে গিয়ে মহারাজ পড়ে গেছে। হাঁটুতে ঘা। সুভাষ নিজের হাতে সেবা করছে। সযত্নে ঘা ধুইয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছে।

কোথায় কে কষ্ট পাচ্ছে, কার কি অসুখ, সেবাব্রতী সুভাষ আছে সকলের জন্যে। কী নিবিড় মমত্ববোধ। কী আশ্চর্য সমপ্রাণতা!

জেলের এক প্রকোষ্ঠে সুভাষ তৈরী করেছে তার ঠাকুরঘর। সেখানে ধ্যানাসনে বসে পূর্ণ করে তুলছে তার প্রাণশক্তির আধার।

সহবন্দীদের ডাক দিয়ে বললে সুভাষ, মহাশক্তির আরাধনা চাই। আসুন, আমরা এবার অসুরদলনী দুর্গার বোধন করি। হ্যাঁ, এখানে, এই জেলের মধ্যেই।

সবাইকে নাচিয়ে দিল সুভাষ। মাতিয়ে দিল।

জেল-সুপার মেজর ফিণ্ডলের কাছে রাজবন্দীদের আবেদন গেল—আমরা দুর্গাপূজা করবো, পূজার ব্যয় বাবদ টাকা মঞ্জুর করা হোক।

খ্রীষ্টান বন্দীদের ধর্মাচরণে জেলখানায় কোনো বিধিনিষেধ নেই, হিন্দু বন্দীরাই বা সে সুযোগ পাবে না কেন?

আবেদন মঞ্জুর করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্যে ফিণ্ডলে গভর্নমেণ্টের কাছে পাঠালো। কিন্তু গভর্নমেণ্ট না-মঞ্জুর করে ফিরিয়ে দিল সেই আবেদন।

ব্রিটিশ রাজশক্তির এই স্পর্ধায় রোষবহ্নি প্রজ্বলিত হ'লো মান্দালয় জেলে। না, আর আবেদন নয়—এবার সংগ্রাম। হয় দাবি পূরণ, নয় আমৃত্যু অনশন।

অনশনের হুমকিও সদম্ভে অগ্রাহ্য করলো গভর্নমেণ্ট।

শুরু হ'লো অনশন।

বাইরের জগতের সঙ্গে রাজবন্দীর সব রকম যোগাযোগ বন্ধ করা হ'লো। অনশনের খবর যাতে কারাপ্রাচীরের ওপারে না যেতে পারে—সেজন্যে চিঠিপত্র আটক করা হ'লো।

কিন্তু ধূর্ত শাসকের সতর্ক প্রহরাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কোন্ রন্ধ্রপথে চালান হয়ে গেল সে খবর। ফরোয়ার্ডে ছাপা হ'লো।

মান্দালয় জেলে রাজবন্দীদের অনশনের খবর তো আছেই, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়েছে আর একটি চাঞ্চল্যকর খবর।

রাজবন্দীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিয়েছিলেন জেল-ডাক্তার মুলভেনি। কিন্তু সে রিপোর্ট প্রত্যাহার করে একটা মিথ্যা

রিপোর্ট দেবার জন্য 'আই-জি'র পক্ষ থেকে বিশেষ চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। জেল-সংস্কাব-কমিটির কাছে ডাঃ মুলভেনি নিজেই একথা ফাঁস করে দিয়েছেন।

ফরোয়ার্ডে বেরিয়েছে দুটি খবর খবর তো নয়, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

দেশ জুড়ে শুরু হয়ে গেল আন্দোলন।

এসেম্বলিতে মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন স্বরাজী তুলসী গোস্বামী। মুলভেনির সত্য-ভাষণ ও মান্দালয় জেলের রাজবন্দীদের অনশনের জন্যে।

ব্রিটিশ সিংহ থাবা গুটিয়ে নতি স্বীকার করলো তখনকার মতো। রাজবন্দীদের পূজার দাবি মেনে নিল।

পনরো দিন পর অনশন ভঙ্গ করলো বন্দীরা।

সুভাষ এক চিঠিতে অনিলচন্দ্র বিশ্বাসকে লিখলে :

আমাদের অনশনব্রত একেবারে নিষ্ফল হয়নি। গভর্নমেণ্ট আমাদের ধর্মবিষয়ে দাবি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। এবং এর পর বাংলাদেশের রাজবন্দী পূজার খরচা বাবদ বছরে তিরিশ টাকা এলাউয়েন্স্ পাবে···যে প্রিন্সিপাল গভর্নমেণ্ট এতদিন স্বীকার করতে চায়নি তা যে এখন মেনে নিয়েছে এই আমাদের সবচেয়ে বড়ো লাভ।

···এই অভিজ্ঞতার ফলে আমি নিজেকে এখন আরো ভালভাবে চিনতে পেরেছি এবং নিজের উপরে আমার বিশ্বাস শতগুণে বেড়ে গেছে।

বাসন্তী দেবীকে লেখা একটি চিঠিতেও মান্দালয় জেলে দুর্গাপূজার কথা লিখেছে সুভাষ :

আজ মহাষ্টমী। আজ বাংলার ঘরে ঘরে মা এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে আজ জেলের মধ্যেও তিনি দেখা দিয়েছেন। আমরা এই বৎসর এইখানেই শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করিতেছি। মা বোধহয় আমাদের কথা ভোলেন নাই, তাই এখানে এসেও তাঁহার পূজা-

অর্চনা করা সম্ভবপর হয়েছে। পরশুদিন আবার আমাদের কাঁদিয়ে মা চলে যাবেন। জেলখানার অন্ধকারের মধ্যে নির্জীবতার মধ্যে—পূজার আলো, পূজার আনন্দ বিলীন হয়ে যাবে। এইরূপে কয় বৎসর কাটিবে জানি না। তবে মা যদি এসে বৎসরান্তে দেখা দিয়ে যান তবে—কারাবাস দুর্বিষহ হইবে না ভরসা করি।

বাংলার প্রিয় নেতা সুভাষ সুদূর মান্দালয় জেলে বন্দী। মুক্তি-পথের দিশারী সুভাষকে পেতে চায় বাংলাদেশের মানুষ।

বঙ্গীয় কাউন্সিলের নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে সুভাষকে দাঁড় করানো হ'লো। বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হ'লো সুভাষ।

জনপ্রতিনিধি সুভাষের মুক্তির দাবিতে তখন সোচ্চার হয়ে উঠলো দেশবাসী।

জেলের মধ্যে সুভাষের স্বাস্থ্য ভালো নেই। দিন দিন ভেঙে পড়ছে। প্রথমে নিমোনিয়া। তারপর ঘুসঘুসে জ্বর।

রেঙ্গুনের মেডিকেল বোর্ড সুভাষকে পরীক্ষা করে জানালো—অসুস্থতার কারণে বন্দীকে জেলের মধ্যে রাখা ঠিক হবে না।

কিন্তু ঠিক-বেঠিকের ধার ধারে না নির্দয় ব্রিটিশরাজ।

নতুন জেল-সুপারের সঙ্গে একদিন সুভাষের তীব্র বচসা হয়ে গেল। সুভাষকে পাঠানো হ'লো ইনসিন জেলে।

তখন ইনসিনের জেল-সুপার সেই মেজর ফিগুলে।

সুভাষকে দেখে ফিগুলে বললে, কী খারাপ হয়ে গেছে তোমার চেহারা, তবু এরা তোমাকে ছাড়েনি ?

ফিগুলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখলো—বন্দীর স্বাস্থ্যের অবস্থা খুবই খারাপ।

গভর্নমেণ্ট শর্তসাপেক্ষে বন্দীকে নিজ ব্যয়ে সুইজারল্যাণ্ড যাবার অনুমতি দিল। কিন্তু তাকে যেতে হবে রেঙ্গুন থেকে। কলকাতা হয়ে নয়।

এ প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলো সুভাষ।

এবার তাকে আলমোড়ায় স্থানান্তরের নির্দেশ এলো।

সুভাষকে জাহাজে ডায়মণ্ডহারবার আনা হ'লো। গভর্নরের লঞ্চে মেডিকেল বোর্ড প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। সেই লঞ্চে সুভাষকে নামানো হ'লো। মেডিকেল বোর্ডে ছিলেন স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, কর্নেল স্যাণ্ডন আর মেজর হিংসটন।

বোর্ড সুভাষকে পরীক্ষা করে তারযোগে গভর্নরকে সিদ্ধান্ত জানালেন। গভর্নর তখন শৈলাবাসে।

গভর্নরের লঞ্চেই একটা দিন সুভাষকে রাখা হ'লো।

১৯২৭-এর ১৬ই মে। দার্জিলিং থেকে গভর্নরের আদেশ এলো ঃ সুভাষকে মুক্তি দাও।

আলিপুর সেন্‌ট্রাল জেলে সুভাষচন্দ্র

গৌরী রক্ষিত

আলিপুর সেন্‌ট্রাল জেলে আর জায়গা নেই। নিত্য-নতুন সত্যাগ্রহীদল এসে ভরে ফেলেছে জেলখানা।

মিলিটারি মেজাজে তর্জন-গর্জন করে বেড়াচ্ছে জবরদস্ত জেল-সুপার মেজর সোমদত্ত। সত্যাগ্রহীদের সামলাতে তার দিনে নেই শান্তি, রাতে নেই ঘুম।

নিত্য-নতুন সমস্যা। সি-ক্লাসে থাকতে চায় না নবাগত সত্যাগ্রহী বন্দীরা। সাধারণ কয়েদীদের মতো হাঁটু-তোলা জাঙ্গিয়া তারা পরবে না। কিছুতেই না।

সত্যাগ্রহীদের ক'জনকে ঢোকানো হ'লো ম্যাজিস্ট্রেট সেলে—শাস্তি কামরায়। জোর-জবরদস্তি করে। চললো অমানুষিক অত্যাচার, নিষ্ঠুর পীড়ন। সোমদত্তের নির্দেশে ওয়ার্ডাররা লাঠি চালিয়ে জখম করলো বন্দীদের।

এই খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো জেলের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে। প্রতিবাদে অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীরা দলে দলে বাইরে বেরিয়ে এলো।

সমবেত বন্দীর দল মিলিত কণ্ঠে আওয়াজ তুললো: বন্দেমাতরম। সে আওয়াজে কারাপ্রাচীর কেঁপে কেঁপে উঠলো।

ভীত-সন্ত্রস্ত সোমদত্ত পাগলা-ঘন্টি বাজাবার আদেশ দিলো।

সুভাষ, যতীন্দ্রমোহন, কিরণশঙ্কর ও আরও অনেক জননেতা তখন আলিপুর জেলে ছিলেন। তাঁরাও বেরিয়ে এলেন।

বিপদ-সংকেত পেয়ে সেপাইরা ছুটে এলো লাঠি-বন্দুক নিয়ে। যেভাবেই হোক অবাধ্য বন্দীদের ঘরে ঢোকাতে হবে। তালাবন্দী করতে হবে।

পাগলা-ঘন্টি বাজা মাত্রই কয়েদীদের তালাবন্দী হতে হবে এই আইন। সে আইন অমান্য করতে চায়, এ কী দুঃসাহস রাজবন্দীদের!

জোর করে ওদের ঘরে ঢোকাও।—ক্ষিপ্ত সোমদত্ত চীৎকার করে উঠলো।

শুরু হ'লো সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ। হাতাহাতি। ধস্তাধস্তি।

মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন সুভাষ। স্থির। নির্বাক। সংকল্পের দৃঢ় প্রতিমূর্তি।

সুভাষকে সেখান থেকে সরায় সাধ্য কার?

সোমদত্ত আর একবার গর্জে উঠলো—জলদি ঢোকাও।

কিন্তু সেই সমুন্নত মূর্তির দিকে তাকিয়ে সেপাই-পল্টন সব যেন স্থাণু হয়ে গেল। ক্রোধে উন্মত্ত সুপার হিংস্র হুংকারে ফেটে পড়লো—গুলি করো।

ধীর অকম্পিত কণ্ঠে সুভাষ বললেন—বেশ, তাই। করো গুলি।

সুভাষ বুক পেতে দিলেন।

একটি স্তব্ধ মুহূর্ত। বন্দুক হাতে হাবিলদার যমুনা সিং মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সে পাষাণ মূর্তির মতো স্থির।

গুলি করো।—আবার গর্জালো সোমদত্ত।

যমুনা সিং সোমদত্তকে স্পষ্ট জানিয়ে দিল—লিখিত আদেশ ছাড়া সে গুলি করতে পারবে না।

সোমদত্ত হকচকিয়ে গেল। রিট্‌ন্ অর্ডার? না, রিট্‌ন্ অর্ডার দেবার মতো বুকের পাটা তার নেই। নিরুপায় হয়ে বাঁশি বাজালো সোমদত্ত।

ছুটে এলো আর একদল সেপাই। লাঠি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো তারা। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো আহত সুভাষ—দেশবরেণ্য নেতা সুভাষচন্দ্র বসু।

অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়লো এই খবর।

বাংলার প্রিয় নেতা সুভাষের গায়ে হাত তুলেছে ইংরেজের পদলেহী একটা নরপশু! জেলের মধ্যে সুভাষ গুরুতর আহত!

জেল গেটে জড়ো হ'লো হাজার হাজার মানুষ।

সোমদত্তের বিচারে তদন্ত কমিটি বসাতে বাধ্য হ'লো গভর্নমেণ্ট।

সুভাষ, কিরণশঙ্কর, পূর্ণ দাস ও আরও অনেক রাজবন্দী অনশন শুরু করলেন, তাঁদের দাবি মেনে নিলেন সরকার।

সোমদত্তের বদলির আদেশ হ'লো।

এদিকে বিপ্লবীরা তলে তলে তৈরি হ'লো—পাষণ্ড সোমদত্তকে শুধু বাংলা থেকেই নয়, এই পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেবার জন্যে।

সোমদত্ত মালব্যের কাছে গিয়ে ভেঙে পড়লো—আমাকে বাঁচান।

মালব্য বললেন—স্কাউনড্রেল, তুমি জানো না কার গায়ে হাত তুলেছ!

'মহাজাতি সদন'

রণজিৎকুমার সেন

সুভাষচন্দ্রকে আমি প্রথম দেখি ১৯২৭-২৮ সালে। আমি তখন ফরিদপুর ঈশান ইনষ্টিটিউশনের নিচু ক্লাসের ছাত্র। কি এক ঘটনাসূত্রে সুভাষচন্দ্র এলেন স্কুল-পরিদর্শনে। ক্লাসে ক্লাসে ঘুরে ছাত্রদের উদ্দেশে ছোট করে সুন্দর সুন্দর কথা বললেন। কী অদ্ভুত সুন্দর লোভনীয় স্বাস্থ্য আর চেহারা! সৌম্য, শান্ত, উজ্জ্বলবর্ণ মানুষটি। প্রথম দর্শনেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় সারা মন নুয়ে পড়েছিল। বললেন: 'শিক্ষার পথে তোমরা তোমাদের ছাত্রশক্তিকে জাগিয়ে তোলো, সেই শক্তিই হবে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের প্রধান মন্ত্র।'—সেই মন্ত্রে আমরা সেদিন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলাম।

এর পর নানা ঘটনাপারম্পর্যে একে একে দশটা বছর কেটে গেল। ১৯৩৮ সালে স্থায়ীভাবে এলাম কলকাতায়। ধীরে ধীরে পা বাড়াচ্ছি সাহিত্যজগতে। ইতিমধ্যে কর্পোরেশনের ইলেক্‌শন এলো অল্ডারম্যানশিপের। সুভাষচন্দ্রকে ভোট দিতে আমরা গিয়ে জড়ো হলাম কালীঘাট পার্কে। সারাদিন কী হই-হুল্লোড়, খাওয়া-দাওয়া আর উন্মাদনা! ভোটপর্ব শেষ করে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরলাম।

সুভাষচন্দ্র বিজয়ী হলেন। কর্পোরেশনে এই তাঁর শেষ ইলেক্‌শন।

তৃতীয়বার তাঁর দর্শন পেলাম ১৩৪৬ সালের ২রা ভাদ্র। তাঁর পরিকল্পিত 'মহাজাতি সদন'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে বিরাট ভূমিখণ্ডকে কেন্দ্র করে চারদিকে সাময়িক দেয়াল রচনা হয়েছে। গেটে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনার কাজে ও জনতানিয়ন্ত্রণে ব্যাপৃত রয়েছেন সুভাষচন্দ্র। বাইরে জনতার চাপে চিত্তরঞ্জন এভেন্যু দিয়ে যান-চলাচল গতিরুদ্ধ হয়েছে। ভিতরে ফিল্ম-কোম্পানীর লোক ক্যামেরা

আর সাউণ্ড-রেকর্ড নিয়ে ব্যস্ত। জনতা ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে, নিজে থেকে তখন গেটের দরজা উন্মুক্ত করে দিলেন সুভাষচন্দ্র। বাইরের মুখর জনতা তখন ভিতরে গিয়ে শান্ত। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন রবীন্দ্রনাথ। শান্ত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়িয়ে একবার লক্ষ্য করছিলাম রবীন্দ্রনাথকে আর একবার সুভাষচন্দ্রকে। রবীন্দ্রনাথকে বরণ করে তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বললেন :

"বহুদিনকার এক স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করবার প্রথম প্রচেষ্টা উপলক্ষে আজ আমরা সকলে একত্রিত হয়েছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা এবং সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার ও নির্যাতন ভোগ করে আসছেন, তাঁরা অনেকদিন থেকে একটা অভাব বোধ করে আসছেন; সে অভাব একটা গৃহের, যেখানে তাঁদের যাবতীয় সেবাকার্য আশ্রয় পেতে পারে এবং যেটা তাঁদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও আদর্শের একটা বাহ্য প্রতীকস্বরূপ হতে পারে। ইতিপূর্বে আমাদের জাতীয় নিকেতন নির্মাণের চেষ্টা একাধিকবার করা হয়েছে, কিন্তু কৃতকার্য হয়নি। পরিশেষে আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা 'মহাজাতি সদনের' ভিত্তিস্থাপনা আজ করা হবে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা আজ আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়েছি এবং আপনার দ্বারা সেই বীজ আজ বপন করতে পারছি, যার ফলের দ্বারা আমরা একদিন ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট ও সুসমৃদ্ধ করে তুলতে পারবো।

"আজকের এই শুভ অনুষ্ঠানে আমাদের অতীত ও ভবিষ্যতের কথা আপনা-আপনি মনে আসছে। এই ভূমিতেই সেই আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল যার দ্বারা আমাদের ধর্ম ও কৃষ্টি সংস্কারের ভিতর দিয়ে পুনর্জীবন লাভ করেছে। এই আন্দোলন প্রাদেশিকতার গণ্ডি মানেনি, —এমন কি, জাতীয়তার গণ্ডিও অতিক্রম করেছিল। রামমোহন ও রামকৃষ্ণ যে বাণী দিয়েছিলেন, তা কি বিশ্বমানবের জন্য নয়? তাঁদের ভিতর দিয়ে কি সুপ্তোত্থিত, নবজাগ্রত ভারত আত্মপ্রকাশ

লাভ করেনি? আমরা জানি যে, আমরা তাঁদেরই কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী।

"নবজাগরণের ফলে প্রবুদ্ধ ভারতের মুক্তআত্মা যখন 'বহু'র মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাইলেন, তখন দেখলেন যে, একদিকে রাষ্ট্র এবং অপরদিকে সমাজ তাকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। তারপর আরম্ভ হ'লো রাষ্ট্রবিপ্লব এবং সমাজবিপ্লব। সেই বিপ্লবের সূচনাও এই ভূমিতে—যেখানে একদিন ধর্মবিপ্লবের ও কৃষ্টিবিপ্লবের আবির্ভাব হয়েছিল।

"১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের (বা নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার) জন্ম হয়। কুড়ি বৎসর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পর আমাদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে এক নূতন যুগ আরম্ভ হয়,—সেটা স্বাবলম্বনের যুগ, স্বদেশীর ও বিদেশী বর্জনের যুগ। তারপর একদিকে বঙ্গভঙ্গ এবং অপরদিকে আমলাতন্ত্রের দমননীতি এমন একটা বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করলে যে দেশের তরুণ সম্প্রদায় উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে, আত্মসংযম হারিয়ে, ইতিহাসের চিরপরিচিত পন্থা – সশস্ত্র বিদ্রোহের পন্থা অবলম্বন করলে। দশ বছর অতীত হতে-না-হতে আমরা পুনরায় আমাদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ে প্রবেশ করলাম—'অহিংস অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের' অধ্যায়।

"আজ ভারতের রাষ্ট্রীয় গগন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। আমরাও ইতিহাসের এমন এক চৌমাথায় গিয়ে পড়েছি যেখান থেকে বিভিন্ন দিকে পথ বেরিয়ে গেছে। এখন আমাদের সম্মুখে সমস্যা এই, যে-নিয়মতান্ত্রিকতার পথ আমরা ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বর্জন করেছিলাম, পুনরায় কি সেই পথে ফিরে যাবো? অথবা, আমরা কি গণ-আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়ে গণ-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবো? এখানে তর্ক-বিতর্ক আমি শুরু করবো না—আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে, নবজাগ্রত ভারতীয় মহাজাতি স্বাবলম্বন, গণ-আন্দোলন এবং গণ-সংগ্রামের পন্থা কিছুতেই পরিত্যাগ করবে না। এই পন্থার

দ্বারাই তারা অনেকটা সাফল্যলাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও বেশী সাফল্য লাভ করবে বলে বিশ্বাস করে। সর্বোপরি, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের সহিত একটা তুচ্ছ আপস করে তারা কিছুতেই তাদের জন্মগত অধিকার—স্বাধীনতা—হেলায় ছেড়ে দেবে না।

"যে স্বপ্ন দেখে আমরা বিভোর হয়েছি, তা শুধু স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নয়। আমরা চাই ন্যায় ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র—আমরা চাই এক নূতন সমাজ ও এক নূতন রাষ্ট্র, যার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠবে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতার আদর্শগুলি। গুরুদেব! আপনি বিশ্বমানবের শাশ্বতকণ্ঠে আমাদের সুপ্তোত্থিত জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছেন। আপনি চিরকাল মৃত্যুঞ্জয়ী যৌবনশক্তির বাণী শুনিয়ে আসছেন। আপনি শুধু কাব্যের বা শিল্পকলার রচয়িতা নন। আপনার জীবনে কাব্য এবং শিল্পকলা রূপ পরিগ্রহ করেছে। আপনি শুধু ভারতের কবি নন—আপনি বিশ্বকবি। আমাদের স্বপ্ন মূর্ত হতে চলেছে দেখে যে সমস্ত কথা, যে সমস্ত চিন্তা, যে সমস্ত ভাব আজ আমাদের অন্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে—তা আপনি যেমন উপলব্ধি করবেন, তেমন আর কে করবে? যে শুভ অনুষ্ঠানের জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, তার হোতা আপনি ব্যতীত আর কে হতে পারবে? গুরুদেব! আজকাল এই জাতীয় যজ্ঞে আমরা আপনাকে পৌরোহিত্যের পদে বরণ করে ধন্য হচ্ছি। আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা 'মহাজাতি সদনের' ভিত্তিস্থাপন করুন। যে সমস্ত কল্যাণ-প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্তজীবনের আস্বাদ পাবে এবং ব্যক্তির ও জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হবে—এই গৃহ তারই জীবনকেন্দ্র হয়ে 'মহাজাতি সদন' নাম সার্থক করে তুলুক—এই আশীর্বাদ আপনি করুন। এই আশীর্বাদ করুন যেন আমরা অবিরাম গতিতে আমাদের সংগ্রামপথে অগ্রসর হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করি এবং আমাদের মহাজাতির সাধনাকে সকল রকমে সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত করে তুলি।"

চারদিক করতালিধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলো। বৃটিশ-ভারতের প্রজাদের সে কী উৎফুল্ল প্রাণাবেগ! নবীন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এক নবীন উদ্বোধন। 'মহাজাতি সদন'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হ'লো। এবারে মাইকের সামনে ঝুঁকে বসে ভাষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বললেন: "এখান থেকে এই প্রার্থনা-মন্ত্র যুগে যুগে উচ্ছ্বসিত হতে থাক—

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান!
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই-বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান!

সেইসঙ্গে এই কথা যোগ করা হোক—বাঙালীর বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক, বাঙালীর বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক, ভারতের মুক্তিসাধনায় বাঙালারা স্বৈরবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন কারণেই নিজেকে অকৃতার্থ যেন না করে।"

আশাহত বাঙালীর কাছে আশাবাদের বিজয়-নির্ঘোষ, বিক্ষিপ্ত বিভক্ত বাঙালীর কাছে নব-মিলনের ঐক্যমন্ত্র। সারা ভারতবর্ষে নতুন করে আবার বাঙালীর নবজন্ম হ'লো এই দিনে।

এর পর সুভাষচন্দ্রের জীবনে ত্রিপুরী ও হরিপুরা কংগ্রেস। উভয় কংগ্রেসেরই অবিসংবাদী নেতা তিনি। হরিপুরায় তাঁর বিরুদ্ধে গান্ধীজীর আশীর্বাদ নিয়ে দাঁড়িয়েছেন সীতারামাইয়া। কিন্তু তিনি বহু ভোটে হেরে যান—যার ফলে গান্ধীজী প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন: Sitaramala's defeat is my defeat. গান্ধীজীর একথা বাঙালী মানসিকতাকে সেদিন প্রবল ধাক্কা দিয়েছিল।

এই সময়ে কংগ্রেস ত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র গড়ে তুললেন 'ফরোয়ার্ড ব্লক'। ইউরোপে তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে। ভারতবর্ষের দিকে ক্রমে এগিয়ে আসছে তার বিষাক্ত নিশ্বাস। এ সময়ে ফরোয়ার্ড

ব্লকের এক বৃহত্তম অধিবেশন ডাকলেন সুভাষচন্দ্র শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। কামাথ, বাটলিওয়ালা প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতারা এসে যোগ দিলেন সেই অধিবেশনে। তাকিয়ে তাকিয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছিলাম সবাইকে। চারদিকে শ্রোতাদের মাথা ভিন্ন আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না। ভাষণ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বললেন : 'আজ এই মুহূর্তে যদি ইংরেজ এদেশ ছেড়ে চলে যায়, তবে হরির-লুট দিয়ে সবাইকে আমি বাতাসা খাওয়াবো।' চারদিকে তখন করতালি শব্দে কান বধির হবার মতো অবস্থা।

এ সময়ে ডালহৌসী থেকে 'অন্ধকূপ' অপসারণ সুভাষচন্দ্রের এক মহৎ কৃতিত্ব। তারপর তাঁর কারাবাস, অনশনজনিত স্বাস্থ্যহীনতা, পুলিশের দৃষ্টিবন্দী হয়ে এলগিন রোডের গৃহে অন্তরীণ জীবন এবং সর্বশেষে গৃহ থেকে তাঁর অন্তর্ধান এবং জাপানে গিয়ে আজাদ হিন্দ সংগঠনের সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ। তার পরের ইতিহাস স্বর্ণোজ্জ্বল ও বেদনামথিত। সে ইতিহাস আজ সবার কাছে স্পষ্ট।

যদি তিনি বাইরে থেকে আক্রমণ করে ইংরেজ সরকারকে বিপর্যস্ত করে না তুলতেন, তবে শুধু গান্ধীজীর 'কুইট ইণ্ডিয়া' শ্লোগানেই এদেশ থেকে ইংরেজ তার জমিদারি গুটিয়ে নিতো কি না সন্দেহ। দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র সেদিন থেকে হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। দেশবন্ধুর পর বাংলাদেশের তিনিই ছিলেন সর্বশেষ অবিসংবাদী দেশ-নেতা। আজ শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁরই জন্য প্রতীক্ষারত।

...প্রত্যেক অফিসার, সৈনিক ও স্বেচ্ছাসেবক স্ব-ইচ্ছায় নিজের স্বাধীন সম্মতিতে ইহাতে [আজাদ হিন্দ ফৌজে] যোগদান করিয়াছেন। এই সংগঠনে কোন প্রাদেশিকতা বা সংকীর্ণ ধর্মভাব পর্যন্ত এতটুকু ছিল না। এই সংগঠনে ব্যক্তিগত উন্নতির মানদণ্ড ছিল, শুধু তাহার কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা—সে যে-কোন প্রদেশেরই হউক বা যে-কোন ধর্মাবলম্বীই হউক না কেন।

সিঙ্গাপুরে যখন একবার টাকা তুলিবার কথা হয়, তখন সেখানকার চেট্টিয়ার সম্প্রদায় নেতাজীকে বলিয়া পাঠাইলেন—তাঁহারা টাকা দিতে রাজী আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মন্দিরে গিয়া সেজন্য নেতাজীকে বলিতে হইবে।

তখন নেতাজী বলিলেন—যে-কোন ধর্মাবলম্বীই হউন, মানুষ ভগবানকে ডাকিতে পারে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যাপারে, দেশের ব্যাপারে ধর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। তিনি মন্দিরে যাইতে রাজী আছেন, যদি তাঁহারা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শিখ নির্বিশেষে সকলকে তাঁহাদের মন্দিরে যাইতে অনুমতি দেন। তাহা যদি না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদের টাকা চাহেন না।

তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন—যাহাকে খুশি তাহাকে লইয়া নেতাজী তাঁহাদের মন্দিরে যাইতে পাবেন—তাঁহারা কোন রকম আপত্তি করিবেন না।

সেদিন নেতাজীর সঙ্গে মুসলমান, হিন্দু, খ্রীষ্টান, শিখ সব জাতীয় অফিসার ও সৈনিক চেট্টিয়ার মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিল।

সিঙ্গাপুরের ইতিহাসে ইহা তিনি প্রথম প্রবর্তন করেন। তাহার আগে সে মন্দিরে হিন্দু ছাড়া কেহ ঢুকে নাই এবং ব্রাহ্মণ ছাড়া কেহ মন্দিরের ভিতর যাইতে পারে নাই।

শুধু তাহাই নহে, মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ আসিয়া সকলের কপালে বিভূতি আঁকিয়া দিয়াছিল, মায় মুসলমান ও খ্রীষ্টান অফিসার পর্যন্ত

…একদিন একটি সরস্বতী পূজার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রকে কিভাবে জড়াইয়া পড়িতে হইয়াছিল, তাহাই এইখানে বলিতে ইচ্ছা করিতেছি।

কলিকাতার সিটি কলেজটি ব্রাহ্ম সমাজের সমাজপতিগণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, ইহা বোধহয় সকলেই জানেন। একবার সিটি কলেজের ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ সরস্বতী পূজার উদ্যোগ-আয়োজনে মাতিয়া উঠিল। কর্তৃপক্ষের অনুমতি মিলিল না। কর্তৃপক্ষ পুতুল-পূজার বিরোধী, অনুমতি পাওয়া যাইবে না জানিয়াও ছাত্রগণ নিরস্ত হইল না। পিতার বিরুদ্ধে পুত্র, শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্র, অভিভাবকের বিরুদ্ধে নাবালক, গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে জনসাধারণ—দেশের প্রায় সকল স্তরেই এই ভাব কঠোর হইয়া উঠিয়াছে তখনকার দিনে। সিটি কলেজের ছাত্রাবাসও কর্তৃপক্ষের মতের বিরুদ্ধে প্রতিমা-পূজায় দৃঢ়সঙ্কল্প। সুভাষচন্দ্রের সমর্থন ও সহানুভূতি ছাত্রবর্গের পানে প্রধাবিত। সংঘর্ষ প্রচণ্ডরূপ ধারণ করিল।

ব্রাহ্ম সমাজপতিগণ বলেন, অপরের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানা হইতেছে।

সুভাষচন্দ্র বলেন, ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ করা হইতেছে। পুলিসে ও বিদ্যায়তন পরিচালকে পার্থক্য নাই।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেও এই আবর্তে আসিতে হইয়াছিল।

সাধারণত কবি সম্প্রদায়গত ধর্ম বা বিশ্বাসের বিতর্কে অবতীর্ণ হইতেন না এবং ভেদবুদ্ধির বিকাশ যেখানে হইত, সেখান হইতে সযত্নে দূরে অবস্থান করাই ছিল তাঁহার অভ্যাস। কিন্তু এই বিরোধে তাঁহাকে অংশ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। হয়ত ব্রাহ্ম সমাজের শিরোমণিদের আকুল আহ্বান উপেক্ষা করিবার মত দৃঢ়তা

তাঁহার ছিল না। হয়ত বা ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের প্রভাব অতিক্রম করাও সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি বিদ্বজ্জনগণ কবির বন্ধুগণ মধ্যে পরিগণিত, ইহা বোধহয় না বলিলেও চলিতে পারে। কিন্তু তাহাতেও সুভাষচন্দ্রকে বিচলিত করিতে পারে নাই; তরুণ ছাত্রসমাজ তাঁহার হৃদয়ের আসনে অধিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথকেও সে সঙ্কল্প হইতে চ্যুত করিতে পারেন নাই। তাঁহার বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল প্রভাবও ব্যক্তি-স্বাধীনতার সঙ্কোচের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হইতে সুভাষচন্দ্রকে নিরস্ত কবিতে পারে নাই।

সিটি কলেজ তদবধি সুভাষচন্দ্রকে বর্জন করিয়াছিল। কলেজের ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছাত্রগণের চেষ্টাতেই হউক, অথবা কর্তৃপক্ষের প্ররোচনাতেই হউক, ঠিক মনে নাই, তবে মনে আছে, সুভাষ-বর্জনেব প্রস্তাব কলেজে অথবা ছাত্রসভায় গৃহীত হইয়াছিল।

এই ঘটনাটি একটি বিশেষ কারণে আমার মনে আছে। তাহাই বলিব। ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছেন এবং সমগ্র ভারতের ছাত্রসমাজ আনন্দে—সমুদ্রমন্থনকালে সমুদ্রের মতো উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। সুভাষের নির্বাচন তরুণের জয় সূচিত করিতেছে। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে তরুণের দল তরুণের রাজাধিরাজ সুভাষকে অভিনন্দিত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ও অধীর হইয়া উঠিয়াছে এবং এই সকল সমারোহে সুভাষের অরুচিও নাই, আলস্যও নাই। যে যেখানে আহ্বান করে, সেখানেই যান; মাল্যের স্তূপ জমে; অভিনন্দনপত্রের পর্বত রচিত হয়। আমাদের এই কলিকাতা শহরে এমন স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী, ব্যায়াম-সমিতি, খেলার মাঠ ছিল না, যেখানে না তাঁহার সাদর আহ্বান আসিয়াছিল; যেখানে না সেই উচ্চাসনটিতে তাঁহাকে বসিতে হইয়াছিল, যেখানে না মাল্য ধারণ করিতে হইয়াছিল; অভিনন্দন কুড়াইতে না হইয়াছিল; বক্তৃতা দিতে না হইয়াছিল। হয়ত কর্পোরেশনের সভায় যোগ দিতে পারেন

নাই, হয়ত রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে অনুপস্থিত থাকিতে হইয়াছে, কিন্তু তরুণের আহ্বান কদাচ উপেক্ষিত হয় নাই। এক কথায় সুভাষ ছিলেন চির-তরুণ এবং দেশের তরুণ ছিল তাঁহার চিরদিনের সহচর।

কলিকাতা শহরে আমার যতদূর মনে আছে, একমাত্র সিটি কলেজই রাষ্ট্রপতির প্রাপ্য সুভাষচন্দ্রের ন্যায্য সম্মান দানে বিরত ছিল। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ কর্তৃপক্ষ সুভাষের উপর সন্তুষ্ট না থাকিলেও ছাত্র সম্প্রদায়কে নিরস্ত করিতে পারেন নাই, সেণ্ট জেভিয়ার্সও রাষ্ট্রপতির সম্বর্ধনা করিয়াছিল। সিটি তাহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে।

একদিন মধ্যাহ্নে এলগিন রোডে গিয়াছি, একতলের বসিবার ঘরটি জনাকীর্ণ। সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে চিনিতেন, কাজেই ওয়েটিং রুমে লোকারণ্যের মধ্যে বসিয়া দর্শন-প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতে হইল না, দ্বিতলে প্রেরিত হইলাম। আহারান্তে সুভাষচন্দ্র বিশ্রাম করিতেছিলেন। কথা আরম্ভ করিয়াছি, ক্ষুদ্র একখণ্ড কাগজ আসিল।

টেবিলের উপর ঐরূপ কাগজখণ্ড অনেকগুলি জমিয়াছিল।

সুভাষচন্দ্র একবার মাত্র দেখিয়া, কাগজগুলি কাগজ-চাপা দিয়া রাখিয়া দিতেছেন। কিন্তু এই টুকরাটুকু দেখিবামাত্র বলিলেন, নিয়ে এসো। বলিয়া কাগজটুকরাটিকে গাদায় না রাখিয়া আলাদা করিয়া রাখিলেন।...কাগজখণ্ডটুকু তিনি গোপন করেন নাই, আমার দৃষ্টি না পড়িয়া পারে না। নামটি মনে নাই; তবে পদাধিকার স্মরণ আছে।

'সেক্রেটারী, সিটি কলেজ ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশন।'

একটু পরে একটি সুকুমার সুদর্শন যুবক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতে, সুভাষচন্দ্র নিকটস্থ চেয়ারে বসিতে বলিলেন।

যুবাপুরুষটি মুখস্থ পড়া বলার মতো এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেলেন,

সিটি কলেজে আপনার প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সম্প্রতি সাধারণ সভা ডাকিয়া আমি বিপুল ভোটাধিক্যে সেই 'ব্যান্' অপসারিত করিয়াছি এবং আপনাকে একদিন আসিতে হইবে। কবে আপনার সুবিধা হইবে বলুন ?···

দিনক্ষণ বিচারের অবসর ছিল না। সুভাষচন্দ্র সাগ্রহে সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। যুবক একটা দিন ও সময় ধার্য করিয়া নমস্কার করিয়া বিদায় লইলেন। পরে এই যুবকের পরিচয় পাইয়াছিলাম, যুধাজিৎ চক্রবর্তী। আরও পরে আরও জানিয়াছিলাম, যুধাজিৎ সুপণ্ডিত অজিতকুমার চক্রবর্তীর আত্মজ। অজিতবাবুরাও ব্রাহ্ম এবং রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতম। তাহা সত্ত্বেও যুধাজিৎ যাহা করিয়াছেন, তাহাতে ব্রাহ্ম সমাজ ও সমাজের সুহৃদ্বর্গের মনঃক্ষুণ্ণ হইবার কারণ থাকিলেও তরুণের অন্তরের অনুভূতির এই প্রত্যক্ষ প্রকাশ অভিনন্দিত হইবার যোগ্য।

এখন শিয়ালদহের কাছে যেখানে সরস্বতী প্রেস অবস্থিত—একদা সেইখানে ছিল—'ফরোয়ার্ড পাবলিশিং হাউস'। সেখান থেকে সেই সময় দেশবন্ধুর পরিকল্পনায় ও সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায়—ইংরেজী দৈনিক 'ফরোয়ার্ড', বাঙ্‌লা দৈনিক 'বাঙ্‌লার কথা' এবং বাঙ্‌লা সাপ্তাহিক প্রথমে 'আত্মশক্তি' পরে 'নবশক্তি' প্রকাশিত হ'ত। এই 'বাঙ্‌লার কথা' কাগজেই আমার সাংবাদিক জীবনের হাতেখড়ি হয়। 'বাঙ্‌লার কথা'র সম্পাদক ছিলেন বন্ধুবর গোপাললাল সান্যাল। বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত তখন এই কাগজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একদল তরুণ সাহিত্যিক সেই সময় 'বাঙ্‌লার কথা' কাগজের সঙ্গে যুক্ত হন। এইসঙ্গে আমি এখানে যোগদান করি—গোপালবাবুর আহ্বানে।

সুভাষচন্দ্র মাঝে মাঝে ধূমকেতুর মত এই ফরোয়ার্ড পাবলিশিং হাউসে এসে হাজির হতেন। সম্পাদকীয় বিভাগে নীতি (Policy) সম্পর্কে কখনো কখনো আলোচনা করতেন। কিন্তু কারো লেখায় বা কাজে কখনো হস্তক্ষেপ করতেন না। যে যার বিভাগ নিয়ে চিন্তা করতেন এবং সেই বিভাগটি নানা দিক দিয়ে আরো জনপ্রিয় করবার চেষ্টা করতেন।

এই সময় প্রতি সন্ধ্যাবেলায় এখানে বহু জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ হ'ত। যতদূর মনে পড়ে বহু তরুণ সাহিত্যিক এখানে এসে নানা বিষয় সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতেন। সরোজ রায়চৌধুরী, নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং প্রবোধ সান্যাল—কোনো-না-কোনো কাগজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বেশ কিছুকাল 'নবশক্তি' কাগজের সম্পাদনা করেছেন। তখন এই বিভাগে বহু সাহিত্যিকের সমাগম হ'ত।

সুভাষচন্দ্র কাগজের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে কিম্বা সম্পাদকের লেখা নির্বাচনের কাজে কখনো হস্তক্ষেপ করতেন না। তিনি চেয়েছিলেন, প্রতিটি প্রগতিধর্মী তরুণ সাহিত্যিককে নিয়ে একটি 'মধুচক্র' গড়ে তুলতে। কিন্তু প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলনের চাপে সেটা হয়ত সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

কবি কাজী নজরুল এবং দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের একটা আত্মিক যোগ ছিল। অনেক সময়ে তিনি সগর্বে বলতেন, আমরা যখন ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধে অগ্রসর হবো, সেই সময় আমরা সবাই নজরুলের গান গেয়ে মার্চ করতে করতে এগিয়ে যাবো।

সেই কথা শুনে অনেক কাগজ তাঁকে বিদ্রূপ করেছে, এমন কি, কার্টুন পর্যন্ত ছেপে বের করেছে সুভাষচন্দ্রকে জনসমাজে খাটো করবার জন্যে।

সুভাষচন্দ্র দেশাত্মবোধক নাটক দেখতে খুব ভালবাসতেন। একদা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শিশিরকুমারকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, পৌর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তিনি কলকাতার বুকে জাতীয় রঙ্গালয় স্থাপন করবেন। এই ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের উৎসাহ ও উদ্দীপনাও বড় কম ছিল না।

পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি, নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা' এবং 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক দেখে সুভাষচন্দ্র প্রাণের আবেগে অশ্রুবিসর্জন করেছেন।

'বাঙ্‌লার কথা'র জনপ্রিয়তাকালে এক সময় শরৎচন্দ্রের একটি বিরাট সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। এই ব্যাপারে নেপথ্য থেকে সুভাষচন্দ্র ও 'বাঙ্‌লার কথা'র সাংবাদিকবৃন্দ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই সম্বর্ধনার কাজে নির্বাসিতের আত্মকথার লেখক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, দিলীপকুমার রায়, গোপাললাল সান্ন্যাল প্রভৃতি অসামান্য পরিশ্রম করেছিলেন। গোপালবাবুর অনুরোধে আমাকে এই সম্বর্ধনা সমিতির অন্যতম

সহঃ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। প্রবীণ সাহিত্যিক জলধর সেন, 'বিচিত্রা' সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কবি নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি সাহিত্যিকবৃন্দ নানা কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। এই ব্যাপারে সব কাজে পেছন থেকে প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। বহু লেখকের লেখা চয়ন করে একটি স্মারকগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল।

বেশ মনে আছে, শরৎচন্দ্রের এই সম্বর্ধনা-অন্তে বেহালার সুরেন রায় মশাই তাঁর প্রাসাদোপম গৃহে এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। তাতে গান গেয়ে আসর জমিয়েছিলেন দিলীপকুমার রায় এবং কাজী নজরুল ইসলাম। শরৎচন্দ্র মাঝখানে মধ্যমণির মতো বসেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র অগ্নিশিখার মতো কাজ করে চলেছেন তাঁর সারাটা জীবন ধরে। কখনো ময়দানে পুলিশের প্রহারে জর্জরিত হয়েছেন, কখনো ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে উল্কার মতো ছুটে বেড়িয়েছেন, কখনো বা কারাগারে রোগশয্যায় অন্ধকারে জীবন-যাপন করেছেন।

কখনো তাঁর দেখা পেয়েছি, কখনো তিনি অন্তরালেই থেকে গেছেন। কিন্তু বাঙ্‌লার তরুণ সমাজকে চিরকাল প্রেরণা সঞ্চার করে চলেছেন তিনি।

তাঁর শেষ দেখা চাক্ষুষভাবে পেয়েছি—যখন তিনি কুখ্যাত হলওয়েল মনুমেণ্ট ভাঙতে রাইটার্স বিল্ডিংসের সামনে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। অন্ধকূপহত্যার কাল্পনিক স্মৃতিস্তম্ভ ছিল এই হলওয়েল মনুমেণ্ট।

আমি তখন বাঙ্‌লা সরকারের প্রচার বিভাগে কিছুদিন কাজ করেছিলাম। ফজলুল হক আর নাজিমুদ্দিনের রাজত্ব চলেছে তখন এই বাংলাদেশে। সুভাষচন্দ্র মূর্তিমান অগ্নিশিখার মতো একদল তরুণকে নিয়ে এই হলওয়েল মনুমেণ্টকে ভাঙ্‌বার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর সেই তেজোদৃপ্ত মূর্তি এখনো চোখের সামনে ভাসছে।

তারপর সেই সব দিনগুলির কথা মনে পড়ে—

যখন কলকাতার বুকে খবর ছড়িয়ে পড়েছিল যে, সুভাষচন্দ্র নিজেকে তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে আবদ্ধ রেখেছেন। কারো সঙ্গে দেখা করছেন না তিনি, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত গিয়ে তাঁকে শাস্ত্রকথা শোনাচ্ছেন। পাশের ঘর থেকে মৌলভী সাহেব তাঁকে কোরানের সারমর্ম শোনাচ্ছেন, কখনো বা কীর্তন শুনছেন। আর নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গোপন রেখে তিনি সকল ধর্মকথা অনুধাবন করছেন। বিবেকানন্দের প্রকৃত অনুগামী ছিলেন সুভাষচন্দ্র। কাজেই এই সংবাদে সকলে বিচলিত হলেও বিস্মিত হননি। কেউ বলেন, সুভাষচন্দ্র রাজনীতি ছেড়ে দিলেন। কেউ মন্তব্য করলেন, এইবার সুভাষচন্দ্র সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের গোয়েন্দারা হয়ত নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

এর কিছুদিন পরে একদিন তড়িৎশিখার মতো ছড়িয়ে পড়ল সেই সংবাদ যে, সুভাষচন্দ্র কোন অজ্ঞাত পথে অন্তর্ধান করেছেন। সারা বৃটিশ সাম্রাজ্য তোলপাড় শুরু হ'ল, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সন্ধান মিলল না। অনেকে তাঁকে শিবাজীর সঙ্গে তুলনা করলেন। চতুর শিবাজী যেমন ঔরঙ্গজেবের চোখে ধূলি দিয়ে দিল্লী থেকে পালিয়ে-ছিলেন—ঠিক তেমনি সুভাষচন্দ্র অতি সাবধানী বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে বোকা বানিয়ে অন্তর্ধান করেছেন।

তারপর দীর্ঘকাল পরে জানা গেল সুভাষচন্দ্রের প্রকৃত সন্ধান—তাঁর নিজেরই কণ্ঠস্বরে—আমি সুভাষ বলছি–। এর পর জানা গেল আজাদ হিন্দ্ ফৌজের চাঞ্চল্যকর কাহিনী।

আরো বহুদিন পরের কথা বলছি।

সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুর কাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করতে চাইছেন না সেই গুজব। ভারতবাসী বলছেন, বৃটিশ সরকার এই মিথ্যা কাহিনী চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। নেতাজী আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসবেন।

১৯৫২-তে আমাকে যেতে হয়েছিল ইউরোপের অন্তর্গত ভিয়েনা শহরে। সেখানে 'আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সমিতি'র বিরাট সম্মেলন। পৃথিবীর ৬৪টা দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। ভারতের প্রতিনিধিরূপে আমরাও কয়েকজন আমন্ত্রিত হয়ে সেই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলাম।

আমি আগেই খবর সংগ্রহ করেছিলাম, নেতাজীর স্ত্রী ও কন্যা এমিলি সেঙ্কল ও অনিতা ভিয়েনা শহরেই অবস্থান করেন। শ্রীমতী এমিলি টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের একটা বিভাগে কাজ করেন এবং ছোট অনিতাকে মানুষ করে গড়ে তোলবার ব্রত গ্রহণ করেছেন।

ভিয়েনা শহরে পৌঁছে ফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করবার বাসনা প্রকাশ করলাম। তিনি আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিলেন এবং সামনের রবিবার আসতে বললেন।

আমি সারাটা রবিবার তাঁদের সঙ্গে কাটিয়েছিলাম।

তখন এই গৃহে ছিলেন নেতাজীর কন্যা অনিতা, নেতাজীর সহধর্মিণী শ্রীমতী এমিলি এবং তাঁর বৃদ্ধা মাতা। যে আন্তরিকতার সঙ্গে সেদিন তাঁরা আমাকে গ্রহণ করেছিলেন, তা ভোলবার নয়।

অন্যান্য অনেক কথার মধ্যে নেতাজীর স্ত্রীকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, কি করে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হ'ল।

তার উত্তরে তিনি আমায় জানালেন, ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারে একবার সুভাষচন্দ্র ভিয়েনাতে যান। সেই সময় শ্রীমতী এমিলির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। শ্রীমতী এমিলি অষ্ট্রিয়ার মেয়ে হলেও তিনি চমৎকার ইংরেজী জানেন এবং মাতৃভাষার মতোই ইংরেজীতে কথাবার্তা বলতে পারেন। এই ইংরেজী জানাটা সুভাষচন্দ্রের কাজের খুব সহায়ক হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র যেসব গোপন কাগজপত্র বৃটিশ সরকারের গোয়েন্দাদের জ্বালাতনে ভারতবর্ষে রাখতে পারতেন না, সেইগুলি শ্রীমতী এমিলির কাছে লুকিয়ে রেখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীমতী এমিলি সুভাষচন্দ্রের সেক্রেটারীর কাজ দীর্ঘকাল ধরে

করেছেন। তাঁর বহু গোপন কাগজপত্র শ্রীমতী টাইপ করে দিতেন। এইভাবে পরস্পরের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক নীরবে গড়ে উঠেছিল।

সুভাষচন্দ্র শেষ যে-বার বৃটিশ গোয়েন্দাদের চোখকে ফাঁকে দিয়ে ভারতের বাইরে চলে যান—সেই সময় কিছুকাল তিন ভিয়েনাতে গিয়ে শ্রীমতী এমিলির গৃহে অবস্থান করেন। শ্রীমতী এমিলি আমায় জানালেন, সেই সময়ই অতি গোপনে তাঁদের বিয়ে হয়।

শ্রীমতী এমিলির বৃদ্ধা মাতা ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু কথা আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সেই কথোপকথনে শ্রীমতী এমিলি দোভাষী-রূপে আমাদের সাহায্য করেছিলেন। আমি কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করি, তাঁর গৃহে নেতাজীর একটিও ফটো দেখছি না কেন? তিনি মৃদু হেসে উত্তব দিলেন, বহু বাজনৈতিক দল নানাভাবে তাঁকে বিরক্ত করে। সেইজন্য ইচ্ছে করেই তিনি 'বোসেব' কোনো ফটো ঘরে টাঙিযে বাখেননি। তখন তাঁব একমাত্র কাজ ছিল - মেযেটিকে মানুষ করে গড়ে তোলা। আমি প্রশ্ন করেছিলাম তিনি ভারতবর্ষে আসতে ইচ্ছুক কি না। তার জবাবে শ্রীমতী বলেছিলেন যে, তিনি ভাবতবর্ষে এলে বহু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তাঁকে দলে টানবাব জন্যে তাঁর ওপরে নানা চাপের সৃষ্টি করবে। সেটা তিনি আদৌ চান না। ভারতবর্ষের বাজনৈতিক ব্যাপারের আভ্যন্তরিক গোলযোগের সব খবরই তিনি রাখতেন। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা একদা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেছিলো কিছুই তাঁব অবিদিত ছিল না। তাই তিনি কোনো শর্তেই নিজেকে রাজনীতির সঙ্গে জড়াতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তবে তিনি কথা প্রসঙ্গে একথা আমায় জানিয়েছিলেন, অনিতা বড় হয়ে যদি তার পিতৃভুমি দেখতে চায় তবে তিনি বাধা দেবেন না।

আমি যখন ভিয়েনাতে যাই তখন নেতাজী-কন্যা অনিতার বয়স মাত্র নয় বছর। সে অত্যন্ত মিশুকে মেয়ে ছিল। অল্প সময়ের

মধ্যেই আপনার হয়ে গিয়েছিল। সে আমার কোলে উঠেছিল। আমাকে আদর করেছিল, এবং আমাকে নিজের হাতে লিখে তার একটি ছবির বই উপহার পর্যন্ত দিয়েছিল। আমি তার সুন্দর ব্যবহারে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমি অবাক হয়ে বার বার তাকিয়ে দেখলাম, তার মুখের আদল অনেকটা নেতাজীর মতো। সত্যি কথা বলতে কি, আমি একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। আমিও অনিতাকে একটি বই উপহার দিয়েছিলাম।

পরবর্তীকালে অনিতার বয়স যখন আঠারো বছরের বেশী হয়, সে একবার ভারতবর্ষে বেড়াতে এসেছিল। আমি সেই সময় শোভাবাজার রাজবাটীর বিরাট প্রাঙ্গণে তার এক সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলাম। শত শত ছেলে-মেয়ে সেই মধুর উৎসবে অংশ গ্রহণ করে তাকে উদ্দীপ্ত আর আনন্দিত করে তুলেছিল।

সেই সম্বর্ধনার খবর যথাসময়ে চিত্রশোভিত হয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্রীমতী এমিলির কাছ থেকে বিদায় গ্রহণের পূর্বে আমি একটি কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

আমার প্রশ্নটি ছিল,—নেতাজীর সর্বশেষ খবর আপনি কবে পেয়েছেন ?

আমার এই প্রশ্ন শুনে তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। তারপর উত্তর দিলেন, মিঃ বোস ১৯৪৫-এ জাপান থেকে একটি চিঠি আমাকে লেখেন। সেই চিঠিখানি নানা দেশ ঘুরে প্রায় এক বছর পরে ভিয়েনাতে আমার হাতে এসে পৌঁছায়। তারপর আমি আর আপনাদের নেতাজীর কোনো খবর পাইনি।

অনিতার দিদিমা সেদিন আমাকে খুব আদর-আপ্যায়ন করেছিলেন। ভারতবর্ষের মানুষ বলে—আমার সম্পর্কে তাঁর কৌতূহলের অন্ত ছিল না। তিনি আদর করে ভিয়েনার একরকম পিঠে সেদিন আমায় খাইয়েছিলেন। সে পিঠেটি অনেকটা আমাদের দেশের পাটিসাপ্টার মতো।

শ্রীমতী এমিলি সেই সময় ভারতের বিষ্ণুশর্মার ইংরেজী অনুবাদ পড়ছিলেন। একখানি মোটা বই এনে তিনি আমায় দেখালেন। হঠাৎ আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা 'গরুড়' মানে কি ? কি তার কাজ ?

প্রথমে আমি তাঁর প্রশ্ন শুনে হক্‌চকিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর ব্যাপারটা বুঝে নিলাম। আমার সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিতে যেটুকু কুলোয় সেইভাবে গরুড় যে 'নারায়ণের' বাহন সেই কথা তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম। বিষ্ণুশর্মার কাহিনী সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা হ'ল।

কলকাতায় ফিরে এসে আমার ভিয়েনার অভিজ্ঞতার কথা ধারাবাহিকভাবে 'যুগান্তরে' প্রকাশ করি। সেই সময় বহু প্রতিবাদ-পত্র আসে। কেউ কেউ লেখেন, আমি ইচ্ছে করে নেতাজীর চরিত্রকে বিকৃত কবছি। তিনি আদৌ বিয়ে করেননি। আবার অনেক প্রশংসাপত্রও পাই। কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এই রচনাটির প্রশংসা করে লেখেন,—নেতাজীর অনেক অজানা কথা তুমি জেনে এসে আমাদের পরিবেশন করেছ, সেজন্য অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই।

আজ যখন রাজনীতিক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব, কলহ, ঈর্ষা আর হানাহানি লেগেই আছে,—তখন কি মনে হয় না,—বিধাতার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করি,—নেতাজী, তুমি আবার ভারতে ফিরে এসো,—এই স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর, বুভুক্ষু, পঙ্কিল জাতিকে তুমি সকলরকমে কালিমা থেকে উদ্ধার করো। তাদের নতুন করে বাঁচবার অধিকার দাও—?

রবীন্দ্রনাথ কবি নজরুলের 'ধূমকেতু'কে যে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন,—তাই দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করতে ইচ্ছা জাগে—

"আয় চলে আয় রে ধূমকেতু—
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু—
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয়-কেতন।
অলক্ষণের তিলক-রেখা —
রাতের ভালে হোক না লেখা—
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে আছে যারা অর্ধচেতন ॥"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ নিজে কবিতা লিখতেন, 'নারায়ণ' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করতেন, স্বগৃহে সাহিত্য-বৈঠক বসাতেন। নবীন কবি সাহিত্যিকদের তিনি বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করতেন। দেশবন্ধুর মন্ত্রশিষ্য সুভাষচন্দ্র অতটা না হলেও তাঁর বৈচিত্র্যবহুল জীবনাভিযানেও যথেষ্ট সাহিত্যানুরাগের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর শেষ কর্মকাণ্ডের সময়টা ব্যতীত জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি সাহিত্য-রসিকদের সঙ্গে সুযোগ ঘটলেই ঘনিষ্ঠতা করেছিলেন, গান শুনেছিলেন, কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন, সাহিত্যিকদের গৃহে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে বৈঠকে বসে আলাপ-আলোচনাও করেছেন।

সুভাষচন্দ্রের সাহিত্যপ্রীতির মূলে আছেন তাঁর বন্ধু দিলীপকুমারের প্রভাব, চিরদিনই তিনি দিলীপকুমারের সঙ্গে সাহিত্য বিষয়ে মতামত বিনিময় করেছেন। দিলীপকুমারেব রচনারও তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

বস্তুত দিলীপকুমারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুভাষচন্দ্র যে শিল্পসঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হবেন সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রাখে না। দিলীপকুমার তাঁর তরুণ জীবনের বন্ধু। রাজনীতি-বিবর্জিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে অবাধ সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময়েরও বহুতর অবকাশ ঘটেছিল।

বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগের উন্মেষ ঘটেছিল দিলীপকুমারের কথায় জানা যায় বিবেকানন্দ ও দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাপাঠ থেকে। স্বদেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দীপ্ত নাটক ও সঙ্গীত প্রথম যুগে সুভাষচন্দ্রকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করত। তাঁর বিবেকানন্দের ত্যাগব্রত তো শুধু ধর্মানুরাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা ছিল জীবপ্রেমের মধ্যে উন্মুক্ত। সুভাষচন্দ্র তাঁর সেই অমর উক্তিকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে বলতেন—

দেশপ্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ॥

তরুণ সুভাষচন্দ্র সেই আমল থেকেই জগৎকে মুগ্ধ চোখে দেখতে শিখেছিলেন। তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত চিঠিপত্রগুলির ভাষা থেকেই এই অনুরাগের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।

সঙ্গীতকলাকুশলী দিলীপকুমারের সান্নিধ্যে এলে কেউ সুর-মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারে না, সুভাষচন্দ্রও টপ্পাভঙ্গিমার গানের ভক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের দুটি গান 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' এবং 'প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে এ বিশ্ব নিখিল তোমার প্রতিমা' তিনি গুন্‌গুন্ করে গাইতেন বলে জানা গিয়েছে।

সুভাষচন্দ্র যে নিয়মিত গীতাপাঠ করতেন তা সবারই জানা; গীতার একটি বঙ্গানুবাদ এক যুগে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকত।

আমার বাবার সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি যখনই শুনলেন বাবার লেখা গীতার একটি অনুবাদ আছে, তিনি সাগ্রহে তা চেয়ে নিয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের উপর বাংলা সাহিত্যের দু'জন শক্তিশালী কবি গ্রন্থ রচনা করেছেন—মোহিতলাল মজুমদারের 'জয়তু নেতাজী' এবং সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'জ্বলন্ত তরবারি'। আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁকে 'নবীন' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছেন। সুভাষচন্দ্রের প্রতি বাংলা সাহিত্যের এই হ'ল পরমতম শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কবি সাবিত্রীপ্রসন্নের বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমার স্মৃতিপটে সুভাষচন্দ্রের যে ছবি ভাস্বর হয়ে আছে, তাতে কবি সাবিত্রীপ্রসন্নও উপস্থিত ছিলেন।

একবার মনে আছে কবিবর যতীন্দ্রমোহন বাগচির গৃহে সুভাষচন্দ্রকে অত্যন্ত কাছে থেকে দেখেছিলাম। কবিবর যতীন্দ্রমোহন ছিলেন বড় মজলিশী লোক, সবাইকে অতি সহজে অত্যন্ত আপন করে নিতে পারতেন, গুণীর আদর করতেন, সবার খোঁজখবর নিতেন।

সুভাষচন্দ্র তখন কলকাতায়, যতীন্দ্রমোহন তাঁকে একদিন গৃহে আমন্ত্রণ করলেন। কর্মব্যস্ত সুভাষচন্দ্র বাংলার কবির ঐ আদরের ডাকে তখনই সাড়া দিলেন, বললেন—"আগামী রবিবার সন্ধ্যাবেলায় আপনার বাড়ি যাব।"

যতীন্দ্রমোহন তখনই তাঁর সতীর্থ কবিদের আহ্বান জানালেন, আমার পিতৃদেব কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু 'মিতা' যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও আরও কেউ কেউ। বাবার সঙ্গে আমিও সেদিন গিয়েছিলাম।

সেদিনের স্মৃতি আমার মানসপটে জ্বলজ্বল করছে—হিন্দুস্থান পার্কে ইলাবাসে কবির বৈঠকখানায় জাজিম পাতা, তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছেন ভারতের জনগণমন অধিনায়ক সুভাষচন্দ্র। যতীন্দ্রমোহন তাঁর পাশে বসে সাদরে তাঁর গায়ে পিঠে হাত বুলাচ্ছেন, কবিরা তাঁর চারপাশে ঘিরে বসে।

সাহিত্যিকদের বৈঠক, রাজনীতির কোনো কথাই উঠল না, কোনো বাকবিতণ্ডা ঘটল না। সুভাষচন্দ্রই হেসে বললেন—"দেশের এরূপ সংকটে আপনারা কি শুধু প্রেমের কবিতা লিখে কাটাবেন? আপনারা আরও কিছু কাজের ভার নিন।"

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর স্বভাবসুলভ শ্লেষের স্বরে বললেন—"ঠিকই বলেছেন, আমাদের এখন লাঠি হাতে বেরুতে হবে। বয়স তো হ'ল।"

বাবা বাধা দিয়ে বললেন—"না যতীন, সুভাষ বোধহয় সেকথা বলছেন না, তিনি আমাদের দেশপ্রেমের কবিতা লিখতে বলছেন।"

সুভাষচন্দ্র একটু বিব্রত হয়ে বললেন—"তা তো আপনারা লিখছেনই, তবে আমি বলছিলাম যুবকদের জাগানোর জন্যে একটি পত্রিকা 'তরুণের স্বপ্ন' বের করলে কেমন হয়?"

'তরুণের স্বপ্ন' কথাটি চিরকালই তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত সাহিত্যকৃতির একমাত্র নিদর্শনের নামও তাই 'তরুণের স্বপ্ন'।

যতীন্দ্রমোহন সাগ্রহে বললেন—'কিন্তু সুভাষ, আমরা কিভাবে তা করব ?"

সুভাষচন্দ্র সে সময়ে সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন, তিনি যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কাব্যে দুঃখবাদ নিয়ে দু-একটি কথা বললেন, তারপর বললেন, "নৈরাশ্যকে কেন আপনি কাব্যে প্রাধান্য দিচ্ছেন ? গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকেও বলে এসেছি—তাঁকে এবার বলিষ্ঠতার সুর আনতে হবে।"*

শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গ তুলে সুভাষচন্দ্র বললেন—"তাঁর 'পথের দাবি' নিষিদ্ধ হলেও আমার কাছে তা চিরকালই ছিল।"

সব্যসাচীর চরিত্রের বাস্তব নিষ্ঠার কথা তুলে বললেন—"এ ধরনের জীবন্ত চরিত্র আরও যদি বাংলা সাহিত্যে থাকত।"

রবীন্দ্রনাথের লেখাও তাঁর বেশ পড়া ছিল, তিনি 'ঘরে বাইরে'র সন্দীপের প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন—"মান্দালয়ের জেলে বসে আমি বাংলা বই অনেক পড়েছিলাম।"

মোহিতলাল মজুমদার নেতাজীর অকৃত্রিম অনুরাগী ছিলেন। সুভাষ-চন্দ্র সেদিন মোহিতলাল ও নজরুল ইসলামেরও খোঁজখবর নিয়েছিলেন।

এসব ঘটনা অনেকদিন আগের, আমার তখন বয়স অল্প, দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র তখনও নেতাজী হয়ে ওঠেননি, তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণাও তখন এত স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি, আজ তাই আপসোস লাগছে সেদিনের সব ঘটনা, ছবি কেন সংগ্রহ করে রাখিনি।

পরবর্তী সাক্ষাৎকার আমাদের গৃহে—একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমরা বাবার কাছে বসে পড়ছি। এমন সময়ে বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে থামল, মাথায় গান্ধী-টুপি, আমাদের ছেলেবেলার সেই সুপরিচিত ধুতি-চাদর-শোভিত সুভাষচন্দ্র এসে নামলেন, সঙ্গে কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন।

বাবা শুধুগায়ে একটা ময়লা কাপড় পরে বসে পরীক্ষার খাতা দেখছিলেন, ছুটে গেলেন। সাবিত্রীপ্রসন্ন বললেন—"দাদা, সুভাষ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

বাবা তাঁর হাত ধরে আমাদের ঘরের বৈঠকখানায় চৌকির উপর বসালেন। দেখতে দেখতে বাইরে বেশ ভিড় জমে গেল।

সুভাষচন্দ্র একটু লজ্জিত হয়ে বললেন—"সেদিন আপনার সঙ্গে বিশেষ কথা বলা হয়নি, তাই একবার এলাম। শরৎদা [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়] বলছিলেন তিনিও আসবেন, পরে আটকা পড়ে গেলেন। আমিও এত ব্যস্ত থাকি—"

তারপর বেশ থেমে থেমে বাবার 'বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতাটির কয়েকটি ছত্র সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন, বললেন—"এ আমার মনে গেঁথে আছে।"

বাবা তাঁর বইগুলি সুভাষচন্দ্রের হাতে দিলেন। বইগুলি কপালে ঠেকিয়ে সুভাষচন্দ্র বললেন—"শরৎদাই বলছিলেন আপনি গীতার একটি অনুবাদ করেছেন…।"

নানা কথার পর তিনি সখেদে বলেন—"দেশ স্বাধীন হলে দেখবেন আপনাদের হাতে কত দায়িত্ব আসবে, দেশের তরুণদের গড়ার গুরুদায়িত্ব তো আপনাদের হাতেই।"

উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"আজ একটা সভায় যেতে হবে, আর একদিন আসব দাদাকে [শরৎচন্দ্র বসু] সঙ্গে নিয়ে। তিনি বৈষ্ণব কবিতার বিশেষ ভক্ত, জমিয়ে বসে সেদিন কাব্যালোচনা করা যাবে।"

আর তিনি কোনদিন আসতে পারেননি।

মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানের আগে সুভাষচন্দ্র ঠিক করলেন সদনের ভিত্তিপ্রস্তর রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে বসাবেন। রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায় অসুস্থ অবস্থায়। এই বিশেষ উপলক্ষে তাঁর একটি গান রচনা করার কথা ছিল, কিন্তু তাঁকে সে অনুরোধ করতে সুভাষচন্দ্র দ্বিধা বোধ করেছিলেন।

বাবার কাছে একটা ছোট চিঠি তিনি পাঠিয়েছিলেন একটি গান লিখে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে। বাবা একটি গানও লিখে পাঠিয়েছিলেন। তবে জানি না গানটি গাওয়া হয়েছিল কি-না।

সঙ্গীত-প্রিয় সুভাষচন্দ্র

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বাংলা দেশের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস—সারাটা দিন বেজায় গুমট। আকাশ মেঘ-ভারাক্রান্ত কিন্তু বর্ষা ঠিক তখনও নামে নাই। মাঝে মাঝে মেঘের আড়ম্বর আছে কিন্তু বর্ষা রীতিমত আরম্ভ হয় নাই। আকাশের একদিকে খানিকটা কালো মেঘ জমাট হইয়া আছে—দেখিলে আশঙ্কা হয় হয়ত সন্ধ্যা নাগাদ বৃষ্টি নামিতে পারে।

অনেকটা দূর কাঁচা রাস্তা হাঁটিয়া সুভাষচন্দ্র নৌকায় চড়িয়া বসিলেন। সঙ্গে কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী।

পদ্মানদীর মাঝি,—বয়স হইয়াছে কিন্তু দেখিলে মনে হয় এখনও বেশ শক্তই আছে; মুখে অনেক ঝড়-ঝাপ্‌টার চিহ্ন।

মাঝি বলে, 'কর্তা, একটু সবুর করে গেলে হয় না?—ছামোয় মেঘ।'

কর্তাটির সঙ্গে পূর্বপরিচয় থাকিলে মাঝি কখনই এমন অবান্তর প্রশ্ন করিয়া বসিত না।

সুভাষচন্দ্র হাসিয়া উত্তর দেন, 'কেন হে, ভয় লাগে নাকি?'

মাঝি বলে, 'না কর্তা, আমাদের কাজই ত এই; তুফানের সঙ্গে লড়াই করে আমরা নদী পার হই, ভয় আমাদের লাগে না,—ফুর্তিই লাগে। তবে আপনারা যাবেন কিনা, তাই। আমার আর কি?'

সুভাষচন্দ্র বলেন, 'তুফান? বেশ ত। তুমি নিশ্চয়ই তুফানে নৌকা বেয়েছ?'

মাঝি উত্তর দেয়, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, কর্তা!'

'কখনও নৌকাডুবি হয়েছে?'—জিজ্ঞাসা করেন সুভাষচন্দ্র।

'কম হলেও দু'তিনবার, কর্তা।'—উত্তর দেয় পদ্মানদীর মাঝি।

নৌকা তখন কূল ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছে।

মাঝি বলে, 'একবার,—হেই আল্লা!' মাঝির মুখ দিয়ে আর কথা বাহির হয় না। মাথা নীচু করিয়া সে দাঁড় টানিয়া চলে।

সুভাষচন্দ্র বিস্মিত হইয়া মাঝির মুখের দিয়ে চাহিয়া থাকেন।

মাঝি বলে, 'জোয়ান ছেলেটাকে এই পদ্মার বুকেই দিয়েছি কর্তা।'

সুভাষচন্দ্রের চোখ দু'টি আর্দ্র হইয়া আসে। সেই মেঘলা দিনের অস্পষ্ট আলোকে সুভাষচন্দ্রের আরক্তিম মুখের বিষণ্ণ ছায়া চোখে পড়ে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর তিনি প্রসঙ্গান্তরে আসিবার চেষ্টা করেন।

'যেতে আমাদের কতক্ষণ লাগবে মিঞা?'—প্রশ্ন করেন সুভাষচন্দ্র।

মাঝি বলে, 'আন্দাজ তিন চার ঘণ্টা।'

'তাহলে বৃষ্টি নামার আগেই আমরা পৌঁছে যাব;—কি বলো?'—বলেন সুভাষচন্দ্র।

মাঝি ততক্ষণে বোধহয় পুত্রবিয়োগের কথাটা ভুলিয়া গিয়াছে। সে একটু হাসিয়া বলে, 'হুই যে গোপালতলীর ঘাট, ওই ঘাটে নেমে যেতে হয় আমার শ্বশুরবাড়ি।'

নৌকা তখন হেলিয়া দুলিয়া পদ্মানদীর খর তরঙ্গের উপর দিয়া ভাসিয়া চলিদাছে। তরঙ্গ ভঙ্গ তাহাকে না বলা গেলেও ভঙ্গীটা তাহার যে বেশ শান্ত, একথা বলা যায় না। ঝড় উঠিলে ঢেউএর মাতন আরম্ভ হইতে বিলম্ব ঘটিবে না, ইহা বেশ বুঝা যায়।

আরোহীদের একজন জিজ্ঞাসা করে, 'মাঝি, তুমি সারিগান জান?'

'জানতাম বাবু, কিন্তু বয়স হয়েছে—এখন গলায় আর থৈ পাই না।'—উত্তর দেয় মাঝি।

মাঝি চুপ করিয়া থাকে। কথা বলে না। সুভাষচন্দ্রের গম্ভীর চেহারা দেখিয়া হয়ত সে সমীহ করে।

সেটা সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায় না। তিনি বলেন, 'লজ্জা কি হে, গাও না? আমি গান খুব ভালবাসি।'

মাঝি প্রাণে ভরসা পায়।

গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া গাহিতে আরম্ভ করে—

'নদীর মর্ম জানতে হলে
গহীন জলে নামতে হয় ;
নিতলে তুই ডুববি যদি
তুফানে তোর কিসের ভয়।
নদী যদি দুকূল ভাঙ্গে
বান ডাকে তোর মরা গাঙে
দূরের পাল্লা দিতে হলে
কভু উজান বাইতে হয়।'

অবিরাম নৌকা চলিয়াছে। মাঝির গান কখন যে শেষ হইয়া গিয়াছে কাহারও সে খেয়াল নাই। চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু শোনা যায় দাঁড় ফেলার শব্দ—ছপ্ ছপ্ ছপ্।

ঢেউগুলি নৌকার দুইধারে আছড়াইয়া পড়িতেছে—তাহারই শব্দে সৃষ্টি হইতেছে একটি একটানা শব্দ—ছলাৎ ছল্—ছলাৎ ছল্।

পিছনের গ্রামগুলি ছোটো, দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ আরও ছোটো হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। বাংলার শ্যাম বনশ্রীতে দিগন্তব্যাপী একটা স্বপ্নের মোহ নামিয়া আসে।

নিস্পন্দ দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র চাহিয়া আছেন সম্মুখের দিকে। কোথায় তাঁহার লক্ষ্য? দূরে, বহুদূরে, নদীর পরপারে, গ্রামের সীমারেখা ছাড়াইয়া কোথায় কোন চরম লক্ষ্যের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ? প্রস্তর-কঠিন নিশ্চল মূর্তি, দৃষ্টি উদাস, কিন্তু মন যেন উদাসীন নয়—কি যেন তিনি একাগ্রচিত্তে ভাবিতেছেন। এমন মানুষের সান্নিধ্য লাভ করা সত্যই লোভনীয়। তাঁহার আত্মস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বে অভিভূত হইয়া পড়িবার একটা বিশিষ্ট আনন্দ আছে।

মেঘ তখন বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে। কালো মিশমিশে মেঘের রঙে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে পদ্মানদীর অগণিত তরঙ্গমালা; 'সাপ খেলানো বাঁশী'র সম্মুখে অসংখ্য অজগরের মতো।

সুভাষচন্দ্র নৌকার সেই অসহনীয় স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, 'তোমরা কেউ শ্যামাসঙ্গীত জানো ?'

সকলের হইয়া একজন উত্তর দিলো, 'না।'

'জানলেও তোমরা কেউ গাইবে না, সে আমি জানি। এমনি মেঘের আলোড়নের মধ্যে শ্যামাসঙ্গীত খুব ভালো লাগে আমার। তোমরা যখন কেউ গাইবে না, তখন আমাকেই গাইতে হবে।'

গুন্‌গুন্ করিয়া সুভাষচন্দ্র গান ধরেন।

সকলে বিস্মিত হইয়া পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

সুভাষচন্দ্র ততক্ষণে গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন—

'কবে আবার নাচবি শ্যামা
মুণ্ডমালা দুলিয়ে গলে,
ওই কালো মেঘের অন্ধকারে
তোর হাতের খড়্গ উঠুক জ্বলে।
মা তোর ত্রিনয়নের বহ্নিশিখায়
ছাই করে দে মনের কালি,
আমি ভয়ঙ্করে করবো না ভয়
তুই অভয়মন্ত্র দে মা কালী।
ওমা, বারে বারে ডাকবো তোমায়
মা হয়ে পালাবি কোথায়,
এবার রাঙা জবার অর্ঘ্যমালা
দিব মা তোর চরণ-তলে।'

নৌকা গ্রামের ঘাটে লাগিতেই দেখা গেল—বহুলোক সেখানে সুভাষচন্দ্রের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। বর্ধিষ্ণু গ্রাম, গ্রামের প্রধান পক্ষেরা এবং জনসাধারণ সুভাষচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানাইয়া গ্রামের মধ্যে লইয়া গেলেন।

সুভাষচন্দ্রের মুখে কোনও কথা নাই।

অবস্থাপন্ন গৃহস্থের আদর অভ্যর্থনা ও অতিথি সৎকারের

আয়োজনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একজন দরিদ্র মুসলমান কংগ্রেসকর্মীর আটচালা ঘরে তিনি উপযাচক হইয়া অতিথি হইলেন।

সকালে গ্রাম্য স্কুলের সংলগ্ন মাঠে সভা বসিয়াছে।

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নর-নারী ও শিশু ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমনই প্রিয়দর্শন যুবক সুভাষচন্দ্র—তাঁহাকে দেখিলে চোখ ফিরাইতে পারা যায় না। এমন ধীর স্থির মিষ্ট কথাও তাহারা জীবনে বোধহয় শুনে নাই।

স্কুলের ভাঙা বেঞ্চগুলি সাজাইয়া সভা বসিয়াছে।

সভাপতি সুভাষচন্দ্র।

তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হয় তিনি যেন আজ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্র রচনা করিতে বসিয়াছেন।

অতি সামান্য বস্তুকে সুভাষচন্দ্র এমনি নিষ্ঠা ও অনুরাগের সহিত গ্রহণ করিতেন—অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারকেও মহৎ সম্ভাবনার কল্পনায় তিনি এমনি বড করিয়া দেখিতেন।

গ্রাম সংগঠন, পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা, কুটির-শিল্প উন্নয়ন, স্ত্রী-শিক্ষা, ব্যায়াম, স্বাস্থ্যরক্ষা কোনও বিষয়ই তাঁহার বক্তৃতায় বাদ পড়িল না।

তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতার সারকথা ভারতের মুক্তির জন্য অবিরাম আপসহীন সংগ্রামের উদ্যোগ। অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লীর ক্ষুদ্র সভায় তিনি সেদিন যে বাণী শুনাইয়াছিলেন—মুক্তি-সংগ্রামের বৃহত্তম পরিবেশেও সেই কথাই বার বার তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে।

পূর্ব-এশিয়ার ঘুম তাহাতে ভাঙিয়াছিল।

ভারতের ঘুমও এতদিনে ভাঙিয়াছে।

কিন্তু সেই ঘুম-ভাঙানো মন-জাগানো যাদুকরের দেখা কি আমরা আর পাইব না?

নেতা আমার নেতাজী — নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী

১৯৩১-এর ২৬শে জানুয়ারি।

মুক্তি-ব্রতের বাৎসরিক সংকল্প গ্রহণের দিন।

সারা কলকাতায় ইংরেজ সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেছে। সভা হতে দেবে না। মিছিল বন্ধ রাখতে হবে।

বে-আইনী কংগ্রেসের গোপন কাজ চলছিল এ্যাক্শন কমিটির মারফৎ। কমিটির বৈঠক হচ্ছিল এক-একদিন এক-একজনের বাড়িতে। সেদিনেরটা হয়েছিল উড্‌বার্ন পার্কেই।

ইংরেজ পণ করেছে অনুষ্ঠান রুখতে হবে। দেশবাসীর পণ ব্রত পালন করতে হবে। জীবনের বিনিময়েও করতে হবে। আশা আর নিরাশা তোলপাড় করে বুকের ভেতর। বেশি লোক কি সাড়া দেবে? উদ্ধত ইংরেজের পাশবিক শক্তি মাংসাশী দন্ত বের করে দাঁড়িয়েছে। রক্তলোলুপ ওর জিহ্বা। ধারালো নখর তীক্ষ্ণ করে তুলেছে অস্থির পদক্ষেপে। কপিশ চক্ষু-কোণে রক্ত উঁকি মারে। মনে কি ভয় জাগল? জাগল মৃত্যুভীতি?

দেড়শো বছরের নাগপাশ। অমনি করেই ও ভয় দেখিয়েছে চিরকাল। আর এই ভীতির ওপর গড়ে তুলেছে বিরাট সাম্রাজ্য। ভয়কে ভয় দেখাবার সময় এসেছে। এ-মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয় জাল। ওদের শিকল পরেই ছিঁড়তে হবে লোহার শিকল খান্ খান্ করে। পাশ-জর্জর জাতি আর কতকাল বইবে এই কলঙ্ক জিঞ্জিরের গুরুভার?

এ্যাক্শন কমিটির গোপন বৈঠকে নেতা আলোচনা করেছিলেন পরিস্থিতি। সত্যাগ্রহের উদ্বেল জোয়ার মন্থর হয়ে এসেছে। চারদিক থেকে ভেসে আসছে চাপা গুঞ্জন। গান্ধীজী নাকি ইংরেজের সঙ্গে

রফা করতে চাইছেন। আবার সেই আপসের অভিনয়। দর কষাকষি। বিবৃতি আর পালটা জবাব। সত্যিই কি গান্ধীজী আপসে রাজী হবেন? সমগ্র জাতিকে সংগ্রামে নামিয়ে দিয়ে থেমে যাবেন?

১৯২২-এর কথা ওঠে। সেদিনও ঘুমন্ত জাতির জাগরণ মুহূর্তে আবার তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হ'লো। নেতিয়ে পড়লো সমগ্র জাতি। এক বছরে স্বরাজ হবে! কী দুর্বার কল্পনার মুক্তধারা জাতিকে পাগল করে তুলেছিল!

রণোন্মাদ জাতির কানে বেজে উঠলো তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ 'নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ।' ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা বাতাসে উড়ছে না? বার বার কি এমনি করেই ভাগ্য তার জীবন আর অদৃষ্ট নিয়ে পরিহাস করবে?

ঘুম-ভাঙা জাতি, মনের বুকের আগুন সে রাখবে কোথায়? কী দিয়ে চাপা দেবে? আর চাপতে চাইলেই কি চাপা যায়?

সংগ্রামের গতি রুদ্ধ করে কীই-বা পাওয়া গেল? বিশাল ভারতবর্ষের কোন এক কোণে তুচ্ছ একটা অনাচার,—কি, সগ্রাম থামিয়েই কি অনাচার আচার হয়ে উঠলো?

বাংলার শ্যামল বুকে লাল আর উষ্ণ রক্তের যে স্রোত বইলো, ধুলোয় লুটিয়ে পড়লো সোনার চাঁদ ছেলের দল, তার দায়িত্ব বহন করবে কে?

তাছাড়া স্বাধীনতা আর পরাধীনতার ভেতর রফার কথা, আপসের কথা কীই-বা থাকতে পারে? বিদেশী ইংরেজকে তাড়িয়ে দিয়ে দেশকে স্বাধীন করতে হবে। এক বছরে হোক, আর শতবর্ষে হোক। আমি না পারি, আমার পুত্র, পৌত্র, পরবর্তী বংশধর এ-সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। ক্লৈব্য আর অক্ষমতার কলঙ্ক স্বীকার করবার শক্তি যদি আমার না-ই থাকে, জাতির ভবিষ্যতের বুকে এমন করে পাষাণ চাপা দেবার অধিকার আমায় কে দিলো?

কিরণশঙ্কর রায় বললেন, "কিন্তু প্যাক্‌টের শুভ দিক কি কিছুই নেই?"

"কী আছে আপনিই বলুন?" বললেন নেতা।

"এই সর্বপ্রথম ইংরেজ কংগ্রেসকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করে নিতে চাইছে।"

"না।" বললাম আমি। "জাতীয় প্রতিষ্ঠান নয়, শক্তিমান একটা প্রতিষ্ঠান বলে। জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে কংগ্রেসকে স্বীকার করলে ইংরেজের কূটনীতির সবটাই বানচাল হয়ে যাবে।"

"ওটা ছাড়াও আরও একটা কথা আছে। প্যাক্‌টই হয়তো শেষ কথা নয়। এর পর গান্ধীজীকে ওরা রাউণ্ড টেব্‌ল কনফারেন্সে ডাকবেই।" শেষ করলেন কিরণবাবু।

একটু স্মিত হাসি ফুটে উঠলো নেতার মুখে। এর মধ্যেই ফল ফলতে শুরু করেছে। এখনও প্যাক্‌ট হয়নি। হবে আর সেই আশায় নিজের দরদী বন্ধুদের অন্তরেও পূর্বাহ্নেই দোলা লাগতে লেগেছে। একেই কি বলে সংক্রামকতা?

নেতা কিরণবাবুর দিকে ক্ষণকাল চেয়ে রইলেন। পরে বললেন, "ওটা অনুমানের কথা নয় কিরণবাবু ওটা পরিণতি। আর প্যাক্‌টের ওটাও হবে একটা শর্ত।" একটু থামলেন নেতা। হাতের কলমটা দু'হাতে চেপে ধরে আবারও বললেন, "ঐখানেই আমার আপত্তি।"

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর জাতি সংগ্রামমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে। বার বার এমনি করে এর গতি ব্যাহত করলে পরিণাম কি শুভ হবে? ব্যর্থ হতাশা দেখা দেবে না? জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে পড়বে না? বহু সাধনায় পরাধীন জাতির ঘুম ভাঙে। জাগবার পর-মুহূর্তেই ঘুম পাড়িয়ে দিলে তাকে কি আর সহজে জাগানো যাবে? তাছাড়াও, যে পরম বিশ্বাস নিয়ে জাতি অনন্ত দুঃখ আর ত্যাগের কৃচ্ছ্রতা বরণ করে নিতে উৎসুক হয়ে উঠেছে, সে বিশ্বাস কি অটুটই থাকবে?

গভীর রাত্রে সভার কাজ শেষ হ'লো। সিদ্ধান্ত হলো, মনুমেন্টের

দেবীর ওপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। কলকাতার সর্বত্রই এ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হবে কিন্তু মূল মিছিল পরিচালনা করবেন নেতা…

গভীর রাত্রি। উড্‌বার্ন পার্কের প্রকোষ্ঠে আমরা বসে, সুভাষ-গোষ্ঠীর অন্তরঙ্গতা। সামনের রাস্তায় পুলিশের আনাগোনা জানতে বাকি থাকে না। মাঝে মাঝে মোটর সাইকেলের উগ্র ভট্ ভট্ আওয়াজ। তীক্ষ্ণ হর্ন। সার্জেন্ট দেখে যায় পাহারাদারদের। নজর রাখে সামনের ঘরখানার ওপর। নেতার বসবার ঘর। কিন্তু সে ঘর অন্ধকারে ঢাকা। শূন্য। আমরা বসেছিলাম পূর্ব দিকের ঘরে। ছোট একটা আলো জ্বলছিল।

কিরণবাবু ও পূর্ণবাবু নেতার সঙ্গে থাকবেন মিছিলে। আর থাকবেন শৈলেন ঘোষাল ও ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু ওরা কি সত্যিই মিছিল বের করতে দেবে? তার আগেই যদি সবাইকে বন্দী করে?

"রাতটা খুবই সতর্ক থাকতে হবে।" হাসতে হাসতে নেতা বলেছিলেন। 'আমাকে ওরা আটকাতে পারবে না। মিছিল বের করতেই হবে।"

আজ মনে পড়ে, এই কথা কয়টির প্রতিধ্বনি আর একদিন ঐ মুখ থেকেই বের হয়ে এসেছিল। অনেক পরের কথা। কিন্তু এমনি সাবলীল। এমনি বজ্রগর্ভ।

"ইংরেজ সর্বশক্তি দিয়েও ভারতের বাইরে আসা আমার আটকাতে পারেনি। আর যেদিন আমি ভারতবর্ষে প্রবেশ করবো, সেদিনও রুখতে পারবে না।"

কিন্তু আমি? নিশ্বাস রুদ্ধ করে আমি অপেক্ষা করছিলাম।

ললিতবাবুর (ললিতমোহন দাশগুপ্ত। সুভাষ-গোষ্ঠীর পিতামহ ভীষ্ম) দিকে তাকিয়ে নেতা বললেন, "আপনি কিন্তু বাড়িতেই থাকবেন।"

"কেন ? বৃদ্ধ বলে অনুকম্পা হচ্ছে ? বললেন ললিতবাবু।

"না, না।" একটু থেকে নেতা বললেন, যৌবনের দাবি মানবেন না ?" অস্বস্তিতে মন বুক ভরে উঠেছে। কণ্ঠ ঠেলে একটা প্রবল ধিক্কার বেরিয়ে আসতে চাইলো। অমনি একজোড়া শান্ত দৃষ্টি এসে পড়লো আমার মুখের ওপর। বললেন, "তুমি যাবে না।"

কেন ? অযোগ্য বলে ? অভিমানে আমি ভেঙে পড়লাম। আর কোন কথা আমার মুখ থেকে বেরোলো না। শুধু বললাম, "যাবো না ?"

"না।"

আমি পাথর হয়ে গেলাম।

একজন একজন করে সন্তর্পণে বেরিয়ে গেলেন উড্ বার্ন পার্ক থেকে। রাত কত খেয়াল নেই। নেতা বেরিয়ে এলেন আমার হাত ধরে। ল্যান্সডাউন রোড ধরে চলতে চলতে ট্যাক্সি ডেকে আমরা চেপে বসলাম। গাড়ি চললো আমার বাসার দিকে। রিচি রোডে।

বাকি রাতটুকু আর ঘুমোইনি। আমার ঘরখানায় সামনেই ছিল মস্তবড় ছাদ। ছাদের আল্‌সে ধরে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

গাড়িতে উঠেই নেতা বলেছিলেন, "তুমি মনে কিছু করো না। সবাই একসঙ্গে গেলে এর পরের ব্যবস্থা চলবে কেমন করে ?"

পরের ব্যবস্থার জন্য আর কাউকেই কি পাওয়া গেল না ? এই বিরাট যজ্ঞের কোনও অংশই নেবার আমার থাকলো না ? কিন্তু নেতার আদেশ। নিরুত্তরে সে আদেশ মেনে নেওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তরও রইলো না।

যাবার সময় একটা ফাইল হাতে দিয়ে নেতা আমাকে বলেছিলেন, "এর ভেতর সব পাবে। পর পর সাজানো আছে। আগুন যেন না নেভে। চলি। কেমন ?"

ঘরে ঢুকে ফাইলটা খুলতে প্রথমেই চোখে পড়লো—"আমরা সবাই যদি বন্দী হই, এর পর আমাদের পার্টির তরফ থেকে এ্যাক্‌শন কমিটির নেতৃত্ব করবেন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী।"

নেতার নিজের হাতের লেখা।

সকাল হ'লো। শীতের সকাল। ছাদেই আমি পায়চারি করছিলাম। কে একজন এসে কাগজ দিয়ে গেলো। কাগজে বড় বড় হরফে বেরিয়েছে, কিরণবাবু আর পূর্ণবাবুকে পুলিশ তাঁদের গৃহেই আটকে রেখেছে ; বাড়ি ঘেরাও করে। নেতার বাড়ির সামনেও অনেক পুলিশ মোতায়েন। হয়তো তাঁকেও বেরোতে দেবে না।

নিদারুণ পরাজয়ের কালি-কলঙ্ক চোখের সম্মুখে ফুটে উঠলো। ব্যর্থ হয়ে গেলো। এতো বড় আয়োজনের এই হ'লো পরিণাম ? আর তাও এমন শোচনীয়ভাবে ?

ইংরেজও হয়তো ভাবতে পারেনি যে, এতো সহজে কার্যোদ্ধার হবে। মনে বুকে পাথরের বোঝা। পরাজয়ের কালির পোঁচ মুখে লেপা। বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম বাইরে।

ম্যাডক্ স্কোয়ার পেরিয়ে সবে ল্যান্সডাউনে পড়েছি। দূর থেকে দেখলাম হন্ হন্ করে ছুটে আসছে কুমুদ। কুমুদ ভট্টাচার্য। সেদিনের ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা। সুদর্শন যুবক। প্রাণবান। কুমুদ মারা গেছে। সামনে থমকে দাঁড়িয়েই কুমুদ বলে উঠলো, "কিচ্ছু ভাববার নেই। মিছিল হবেই। নেতাকে ওরা আটকাতেই পারেনি।"

"তিনি কোথায় ?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"কর্পোরেশনে।" বলেই কুমুদ হেসে ফেললো। হাসতে হাসতেই বললো, "কেউ বুঝতে পারেনি। ওরা ভাবছে, উনি বাড়িতেই আছেন। একগাদা পুলিশ বাড়ি পাহারা দিচ্ছে—হো-হো-হো..."

কুমুদের হাসি আর থামেই না।

উত্তাল উত্তেজনার ঝড় বইছে বুকে। জাতির শক্তি পরীক্ষার দিন। আহত সিংহ ক্ষেপে উঠেছে ওর পরিপূর্ণ হিংস্রতা নিয়ে। ঝাঁপিয়ে পড়বে জাতির বুকে। তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা বসিয়ে দেবে জাতির হৃৎপিণ্ডে। রক্ত ঝরবে। সে রক্ত উষ্ণ, গাঢ়, টকটকে লাল।

দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম। হাজার ছেলে যোগাড় করতে হবে। যারা ভয়ে পালাবে না। মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়াবে বুক ফুলিয়ে।

কুমুদ বললো, "চারদিকেই সংবাদ গেছে। সবাই যোগ দেবে। নেতা হাজার চেয়েছেন। অনেক বেশি এসে পড়বে।"

আনন্দে গর্বে দেহ-মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। জীবনের ভুল ও ভ্রান্তির বোঝা সব একত্র করেও যে প্রাপ্তির পর্যাপ্তি ভারী হয়ে উঠতে চায়। জীবনের ক্ষয় আর অপচয়ের হিসাবই তো সব নয়। সহস্র ব্যর্থতার অপমৃত্যু যে বৃহৎ পাওয়া সৌরভে আর সুষমায় অপরূপ করে সাজিয়ে দিলো তা কি একান্তই তুচ্ছ করবার মতো? দুর্জয় হিমাচলের মতো নেতা। যাঁর গর্বোন্নত মাথা নোয়াতে পারলো না কেউ কোনোদিন। সেই নেতা নির্বাচনে তো ভুল করিনি। এ কি কম প্রাপ্তি?

বাড়ি ফিরলাম বেলা দুটোয়।

খাওয়ার কথা মনেও এলো না। উৎকর্ণ হয়ে থাকলাম। ময়দানের আওয়াজ শোনা যায় না? চাপা গুমগুম ধ্বনি? না। মোটর চলে গেলো। চারতলার ছাদ। অনেক দূর দেখা যায়। দেখা যায় হাইকোর্টের চূড়া। তার পাশে মনুমেণ্ট। আশে-পাশে জনতা না? পিঁপড়ের সারির মতো চলেছে। চলেছে কাতারে কাতারে। হাজারে হাজারে।

ছুটে বেরিয়ে এলাম বাড়ি ছেড়ে। নেতার আদেশ অমান্য করা যাবে না। কিন্তু দেখবোও না? এই বিরাট দৃশ্য, এই আশ্চর্য ইতিহাস, এই নবসৃষ্টির অপরিমেয় অবদান? না দেখে থাকবো কেমন করে?

সারা কলকাতা কি ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে? এতো মানুষও ছিলো! ট্রামের গুমটি থেকে ও পাশের পুকুরধার,—সবটা মানুষ ভর্তি। ঠাসা। এদিক থেকে এগোবার উপায় নেই। লিনড্সে স্ট্রীট ঘুরে যেতে হবে।

লেড্‌ল্যার বাড়ির সামনে। নীরেট পাঁচিল। মানুষের পাঁচিল।

হৈ হৈ করে পুলিশের বহর ছুটছে। হাঁকড়াচ্ছে। হাতের লাঠি আস্ফালন করছে। বড় বড় লাঠি দু'জনায় ধরে মানুষ ঠেলে দিচ্ছে। পাঁচিল ভেঙে যায়। মুহূর্তের জন্য পুলিশ সরে যায়। পাঁচিল জোড়া লাগে। ওরই ফাঁকে এগিয়ে গেলাম। গেলাম ওপারে।

মনুমেণ্টের চারদিকে অগুনতি পুলিশ। লালমুখো সার্জেন্ট। হাতে ওদের মোটা লাঠি। পেছনে কাতার বাঁধা ঘোড়সওয়ার। মাথায় ওদের পাগড়ি। পাশে ঝোলানো লাঠি।

সহসা আকাশ ফেটে পড়লো। বাজের আওয়াজ। সহস্র কণ্ঠের বন্দেমাতরম্, তড়িৎপ্রবাহ বয়ে গেলো জনতার হৃদয়ে হৃদয়ে। বাসুকি কি কেঁপে উঠলো? দেখা দিল ঝাণ্ডার মাথা।

ভাস্বরের মতো জ্যোতির্ময় নেতা সকলের পুরোভাগে। হাতে পতাকা। নগ্ন পা। গায়ে উত্তরীয়। (নেতার একজন জ্ঞাতি এই সময়ে লোকান্তরিত হন। নেতা অশৌচ পালন করছিলেন)। দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন। কোনও দিকে চোখ নেই। আগে সম্মুখে, সুদূর আকাশের গায়ে একজোড়া স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ। বিজয়ীর দীপ্ত ভঙ্গী ওঁর সারা অঙ্গে। একটানা হুঙ্কার বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে—বন্দেমাতরম্। দু'পাশে ক্ষিতীশ আর শৈলেন।

আগে চলো! আগে চলো! উন্মাদ জনতা। মিছিলের সম্মুখ ভাগ ট্রাম লাইন পেরিয়ে গেলো। ঝাঁপিয়ে পড়লো হিংস্র হায়েনার দল। ইংরেজের পোষা হায়েনা। শিকারী হায়েনা।

বৃষ্টির ধারার মতো লাঠি পড়ছে নেতার ওপর। ডাইনে পড়ছে। পড়ছে বাঁয়ে। দৃক্‌পাত নেই। এগিয়ে চলো! আগে চলো!

লালমুখো সার্জেন্ট একটা ঝাণ্ডা ধরে ফেলে। বজ্রমুষ্টি নেতার। কাড়তে পারে না। শৈলেন পাশ থেকে ছিটকে পড়ে। ক্ষিতীশ লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। দৃপ্ত সিংহ দু'হাতে পতাকার দণ্ড ধরে ঠেলতে থাকে পুলিশের পাঁচিল।

দলে দলে ছেলের দল মাটিতে ঢলে পড়ে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত

ছোটে। লাল রক্তে রাজপথ ভিজে ওঠে। কলকাতার রাজপথ। এলোপাথাড়ি অনর্গল লাঠি পড়ে নেতার মুখে, মাথায়, দেহের ওপর। সামনে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী উন্মাদিনীর মতো চেঁচিয়ে ওঠেন, "উনি কলকাতার মেয়র। ওঁকে অমন করে মেরো না।"

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছি নেতার। আমার সবল দুই বাহু প্রসারিত করে দিলাম ওদিকে। নেতার দুটো পাশ আর পিঠের দিকটা ঢেকে। ডানপাশ থেকে ছুটে আসে আরেকটা ফিরিঙ্গী সার্জেণ্ট। হাতে তার বড় লাঠি। আরক্ত নয়ন থেকে নগ্ন হিংস্রতা ঝড়ে পড়ে। লাঠি তুলে নেয় মাথার ওপর। সবলে নেতার মাথা লক্ষ্য করে চালিয়ে দেয় লাঠি।

ধাক্কা মেরে নেতাকে সরিয়ে দিলাম বাঁ দিকে। লাঠি পড়লো। পড়লো আমার ব্রহ্মতালুর ওপর। খুলি ফেটে গেলো। চোখ-মুখ ভেসে গেলো রক্তের স্রোতে। অন্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম। ততক্ষণে নেতা এগিয়ে গেছেন আরও খানিকটা।

পতনোন্মুখ দেহটা আমার জড়িয়ে ধরলেন অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী। আমাদের এ্যাম্বুলেন্স বাহিনীর অধিকর্তা। গাড়িতে তুলে নিলেন আমার অবসন্ন দেহটা। পাশে বসলেন রাজকুমারবাবু। গাড়ি ছুটে চললো মেডিকেল কলেজের দিকে।

দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র

মণি বাগচি

"I have found my leader and I mean to follow him."
—এই হ'লো দেশবন্ধু সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের প্রথম উক্তি। আর সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে দেশবন্ধুর প্রথম উক্তিটি ছিল এই: "I have given Subhas to the country." একজন পেলেন তাঁর অন্বেষিত নেতাকে আর অন্যজন পেলেন একজন যোগ্য কর্মীকে। নেতা ও কর্মী এই মিলন পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে কী অঘটন ঘটিয়েছিল তা আজ ইতিহাস হয়ে উঠেছে। বস্তুত সুভাষচন্দ্রকে তাঁর পাশে না পেলে দেশবন্ধুর নেতৃত্ব যেমন সার্থক হয়ে উঠতে পারত না, তেমন দেশবন্ধুর মতো একজন সর্বত্যাগী নেতার অধীনে কাজ করবার সুযোগ না পেলে সুভাষচন্দ্রের সংগঠনী প্রতিভাও বিকশিত হয়ে উঠতে পারতো না। এই শতকের তৃতীয় দশকের সূচনায় এক শক্তিশালী নেতার সঙ্গে প্রতিভাবান এক কর্মীর মিলন—ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে ঠিক এইরকম যোগাযোগ এর আগে বা পরে দেখা যায়নি বললেই হয়। এই যেন সেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সব্যসাচী অর্জুনের যোগাযোগের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই অসাধারণ যোগাযোগটা ছিল মাত্র স্বল্পকালস্থায়ী। যদি দেশবন্ধুর অকালমৃত্যু না ঘটত এবং সুভাষচন্দ্র যদি অন্তরীণাবদ্ধ না হতেন, তাহলে আমাদের বিশ্বাস গান্ধীযুগের রাজনৈতিক সংগ্রাম অন্য রূপ নিতো। কংগ্রেস আরো সংগ্রামমুখী হতে পারতো—কারণ দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন, আপস-আলোচনায় নয়। এঁদের কেউই শাসকজাতির সদিচ্ছায় আস্থাবান ছিলেন না।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সদ্য উত্তীর্ণ সুভাষচন্দ্র কেমব্রিজ থেকেই

একখানি চিঠি লিখেছিলেন দেশবন্ধুকে। নাগপুরে কংগ্রেস থেকে ফিরে এসে সর্বস্ব ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে ব্যারিস্টার সি. আর. দাশ তখন 'দেশবন্ধু' হয়েছেন এবং দেশব্যাপী এক বিরাট কর্মযজ্ঞের সূচনা করেছেন। বিলাতে এসে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সেই খবর জানতে পেরে সিবিলিয়ান সুভাষচন্দ্র তাঁর কর্তব্য স্থির করলেন। না—সিভিল সার্ভিসের সোনার পিঞ্জরে তিনি আবদ্ধ হতে চান না—তিনি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। সেই যে ছাত্রজীবনে বায়রনের কবিতায় পড়েছিলেন : 'Eternal spoits of the chaimbers mind, Liberty than art'—সেই ভাবটা তাঁর তরুণ মনে যেন সেই বয়সেই গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। আজ দেশবন্ধুর দেশোদ্ধারের প্রয়াসের সংবাদ পেয়ে শৃঙ্খলমুক্ত মন নিয়ে তিনি স্বাধীনতার বেদীমূলে নিজেকে নিবেদন করতে চাইলেন। দেশবন্ধুকে লেখা সুভাষচন্দ্রের প্রথম চিঠিখানির তারিখ ছিল ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২১। তখন দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। সুদীর্ঘ সেই পত্রের ছত্রে ছত্রে অনুরণিত হয়েছে দেশমাতৃকার বেদীমূলে আত্মনিবেদনের সুর, দেশসেবার অকপট আকাঙ্ক্ষা। সুভাষচন্দ্র বাংলাতেই চিঠিখানা লিখেছিলেন ও ডাকযোগে না পাঠিয়ে তাঁর এক বন্ধুর হাত দিয়ে সেটি তিনি দেশবন্ধুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। সে চিঠি পড়ে দেশবন্ধু মুগ্ধ হলেন। তিনি অনুভব করলেন তাঁর মধ্যে যৌবনোচিত উৎসাহ আর একটি তরুণ হৃদয়ের স্বদেশপ্রেম। তরুণ তাঁর অপরিচিত নয়। বসু-পরিবারের সঙ্গে, বিশেষ করে সুভাষচন্দ্রের পিতৃদেব জানকীনাথ বসু ও মধ্যম অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুকে তিনি জানতেন। শরৎচন্দ্র তখন হাইকোর্টের একজন উদীয়মান ব্যারিস্টার।

সুভাষচন্দ্র তাঁর সেই চিঠিতে লিখেছিলেন : "আপনি আজ বাংলাদেশে স্বদেশ-সেবা যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক—তাই আপনার নিকট এই পত্র লিখিতেছি। আপনারা ভারতবর্ষে যে আন্দোলনের বন্যা তুলিয়াছেন তাহার তরঙ্গ চিঠি ও খবরের কাগজের ভিতর দিয়া

এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখানেও তাই মাতৃভূমির আহ্বান শোনা গিয়াছে। কেম্‌ব্রিজে অসহযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা খুব বেশি রকমই চলিতেছে। আপনি আমাদের বাংলাদেশে সেবাযজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক—তাই আপনার নিকট আমি আজ উপস্থিত হইয়াছি—আমার যৎসামান্য বিদ্যাবুদ্ধি, শক্তি ও উৎসাহ লইয়া। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার আমার বিশেষ কিছুই নাই—আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীর। ...আমি আজ প্রস্তুত, আপনি শুধু কর্মের আদেশ দিন।"

তারপর ২রা মার্চের আর একখানি পত্রে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুকে জানালেন যে, দেশের কাজে নামতে তিনি বদ্ধপরিকর। দেশবন্ধু বরণ করে নিলেন এই তরুণকে সাদরে দেশসেবার মহাযজ্ঞে—তুলে নিলেন বুকে। যজ্ঞের সমিধরূপে সেদিন তিনি যাঁকে লাভ করেছিলেন, যজ্ঞের অনলেই তিনি নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন—সুভাষচন্দ্রের দেশচর্চার মধ্যে কোন ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। দেশবন্ধুর বিরাট ত্যাগের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের এই মহৎ আত্মত্যাগ মিলিত হয়ে এই দেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে সেদিন সত্যিই একটি নতুন অধ্যায় রচনা করেছিল। তাইতো পরবর্তীকালে বহুবার প্রকাশ্যে দেশবন্ধু গর্বের সঙ্গে বলতেন: "আর কিছু না পারি, দেশের কাজ আমি সুভাষকে দিয়েছি।" এখানে উল্লেখ্য যে, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার সময় যখন ওটেন-সংক্রান্ত ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন তখন তিনি চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর পরামর্শ চেয়েছিলেন। শোনা যায়, চিত্তরঞ্জন তাঁকে পড়াশুনা করতেই বলেছিলেন। দেখা গেল, আজো তাঁর কর্মজীবনের প্রারম্ভে সুভাষচন্দ্র কেম্‌ব্রিজ থেকে চিঠি লিখে দেশবন্ধুরই পরামর্শ চাইলেন। গুরু-শিষ্যের সম্পর্কটা তাহলে ১৯২১ সালের ব্যাপার নয়, তারো অনেক আগে থেকেই। ইতিহাস বিধাতাপুরুষ বুঝি সকলের অগোচরে এইরকম অত্যাশ্চর্য যোগাযোগ ঘটিয়ে থাকেন।

ইতিহাসের খাতিরে এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, একা সুভাষচন্দ্র নয়, আরো দু'তিনজন যোগ্য তরুণ কর্মীকে দেশবন্ধু চেয়েছিলেন তাঁর কাজে। এঁদের মধ্যে তিনটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; যথা—কিরণশঙ্কর রায় (ব্যারিস্টার), বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (ব্যারিস্টার) এবং হেমন্তকুমার সরকার (অধ্যাপক)। এই তিনজনের মধ্যে আবার হেমন্তকুমার ও সুভাষচন্দ্র ছিলেন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এঁরা একই বছরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং এঁরা দু'জন যথাক্রমে দেশবন্ধুর দক্ষিণ ও বামহস্তরূপে ছিলেন। কিরণবাবুর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের হৃদ্যতা বিলাতে থাকতেই হয়েছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্বেই স্কুল-কলেজ থেকে বেরিয়ে আসা ছাত্রদের জন্য দেশবন্ধু জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র তখনো বিলাত থেকে এসে পৌঁছননি। স্কুলের নাম দেওয়া হয়েছিল বিদ্যাপীঠ। গোড়ার দিকে উপযুক্ত ব্যক্তির অভাবে বিদ্যাপীঠে নানারকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 'ফোরবেস ম্যানসন' নামে একটা তিনতলা বাড়িতে এই বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয়। এর একতলায় ছিল কংগ্রেস অফিস। বাড়িটার ভাড়া ছিল মাসিক এক হাজার টাকা। দেশবন্ধুর রসা রোডের বাড়িতে একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিদ্যাপীঠের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়। সুভাষচন্দ্র ও কিরণশঙ্কর দু'জনেই উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার পর স্থির হয় যে, সুভাষচন্দ্র হবেন বিদ্যাপীঠের নতুন অধ্যক্ষ আর কিরণশঙ্কর এর নতুন সম্পাদক। তখন থেকেই দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের প্রচার-সচিবের কাজের দায়িত্বও দিয়েছিলেন। হেমন্তকুমার সরকারকে বিদ্যাপীঠের অন্যতম অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন দেশবন্ধু। কিরণশঙ্কর ও সুভাষচন্দ্রও ক্লাস নিতেন। সুভাষচন্দ্র পড়াতেন ইংরেজি, ভূগোল ও দর্শন।

বিদ্যাপীঠের কাজে গা ঢেলে দিলেন সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্রের আকর্ষণে ক্রমে অনেকেই এসে অধ্যাপকমণ্ডলীতে যোগদান করলেন। বিশৃঙ্খলার জন্য ইতিমধ্যে নিরাশ হয়ে যে-সব ছাত্র ফিরে গিয়েছিল, সুভাষচন্দ্র অধ্যক্ষ হওয়ার পর থেকে তারা আবার এসে বিদ্যাপীঠে যোগদান করল। বিদ্যাপীঠ আবার জমে উঠল। জাতীয় শিক্ষাবিস্তারের জন্য তখন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, দেশবন্ধু তাকে রূপায়িত করার জন্য শুধু কলকাতায় একটি বিদ্যাপীঠ স্থাপন করে ক্ষান্ত হননি। অনুরূপ শিক্ষায়তন তখন বাংলাদেশের বহু জেলায় স্থাপিত হয়েছিল। সেগুলির তত্ত্বাবধানের ভারও সুভাষচন্দ্রের উপর অর্পিত হয়েছিল—কলকাতায় বসেই তিনি পত্রযোগে এই কাজ করতেন এবং এজন্য নির্দিষ্ট সময়ের পর সবাই চলে গেলেও অধিক রাত্রি পর্যন্ত অধ্যক্ষকে 'ফোরবেস ম্যানসন'-এর দোতলার ঘরে বসে কাজ করতে দেখা যেত। সুভাষচন্দ্রের কাজের ধরনই ছিল এইরকম—আন্তরিকতায় ভাস্বর। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, সেদিন সুভাষচন্দ্রের আকর্ষণে বাংলার দু'জন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক ও কবি—শরৎচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—বিদ্যাপীঠে নিয়মিত আসতেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হৃদ্যতা সুভাষচন্দ্রের এখানেই প্রায় গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে লেখক শরৎচন্দ্রকে অনেকবার বলতে শুনেছেন—"সুভাষ ছিল বলেই না দেশবন্ধুর বিদ্যাপীঠ রক্ষা পেয়েছিল। কী অক্লান্ত পরিশ্রমই তাকে করতে দেখেছি এই বিদ্যায়তনটির জন্য।"

শরৎচন্দ্র তখন হাওড়া জিলা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বিদ্যাপীঠ কিন্তু বেশিদিন চলেনি। কারণ অসহযোগ আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের কাজে বেশি করে মনোনিবেশ করতে হয়। এই সময় জেলে যাওয়ার আগে দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রের উপর একটা বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিয়ে যান। সেটি হ'লো যুবরাজ সম্বর্ধনা বয়কট। ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারত পরিদর্শনে আসেন। কংগ্রেস থেকে

ঠিক হয় যে, যুবরাজের কোন সম্বর্ধনা-সভায় কংগ্রেসের কোন লোক ত অংশগ্রহণ করবেই না—বরং সম্বর্ধনা যাতে না হতে পারে তার জন্য চেষ্টা করবে। ডিসেম্বরে যুবরাজ কলকাতায় এলেন। দেশবন্ধু তার আগেই গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেছেন। কাজেই সম্বর্ধনা বয়কট করার আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রকেই অগ্রণী হতে হ'লো। ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র কলকাতাতেই সুভাষচন্দ্রের সংগঠনী প্রতিভার জন্য এই বয়কট অনুষ্ঠান যেভাবে সফল হয়েছিল তা শ্বেতাঙ্গ-সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'স্টেটসম্যান' কাগজ পর্যন্ত স্বীকার করেছিল। সেদিন শহরে যে ব্যাপক হরতাল হয়েছিল তার কথা লিখতে গিয়ে স্টেটসম্যান সংবাদপত্রকে 'Remarkably Successful' এই কথা ব্যবহার করতে হয়েছিল। দেশবন্ধুর ইঙ্গিতে ও সুভাষচন্দ্রের সাংগঠনিক প্রয়াসের ফল প্রকাশের জন্য মহানগরীর প্রাণস্পন্দন থেমে গিয়েছিল।

এর পরেই সুভাষচন্দ্র ধৃত হন ও ছয় মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই ছয় মাস গুরু-শিষ্য একত্রে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে অতিবাহিত করেন। এই সময়েই সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনে ও পরিচালনায় এই সময়ে সুভাষচন্দ্র যে সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তা সরকারকে বিচলিত করে তুলেছিল। তাই তাঁরা তাঁকে কার্যক্ষেত্র থেকে অপসৃত করার জন্য সংশোধিত ফৌজদারী আইনের বলে তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। দেশবন্ধুকেও এই একই আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁর অন্যান্য সুযোগ্য কর্মীদেরও এই সময় গ্রেপ্তার করা হয়। সুভাষচন্দ্র ও কিরণশঙ্কর গ্রেপ্তার হওয়ার পরই বিদ্যাপীঠ বন্ধ হয়ে যায়।

১৯২২। সুভাষচন্দ্র কারামুক্ত হলেন। উত্তরবঙ্গে তখন ভীষণ বন্যা। দেশবন্ধু সেই বন্যাত্রাণের কাজের দায়িত্ব দিলেন সুভাষচন্দ্রের উপর। সুভাষচন্দ্রের শরীর তখন সুস্থ নয়, তবুও তিনি রিলিফের কাজ এমনভাবে পরিচালনা করেন যে, সারা বাংলাদেশে তাঁর সুনাম

ছড়িয়ে পড়ে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাই বলতেন, "সুভাষের সংগঠন কাজে কোনখানে ফাঁক থাকত না।" রিলিফের সকল বিভাগের কাজ সুভাষচন্দ্র নিজে দেখতেন। বন্যার কাজ শেষ হয়ে গেল, দেশবন্ধুর নির্দেশে সুভাষচন্দ্র 'বাংলার কথা' প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, বন্যার কাজ সেরে সুভাষচন্দ্র যখন কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেন তখন বিদ্যাপীঠেব ছাত্ররা সুভাষচন্দ্রকে প্রকাশ্যে সম্বর্ধিত করেন। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনে সেই প্রথম সম্বর্ধনা। সেদিন অভিনন্দনের উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "আমি যে দেশমাতৃকার আহ্বানে আমার সামান্য শক্তি দিয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি—তার প্রথম প্রেরণা যুগিয়েছেন দেশবন্ধু; তাঁর নেতৃত্বাধীনে কাজ করা আমার জীবনে পরম সৌভাগ্য। আর আপনাদের কাছ থেকে পেয়েছি উৎসাহ।"

১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে গয়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন দেশবন্ধু। এখানে তাঁর ভাষণে তিনি তাঁর নতুন কর্মপন্থার কথা 'কাউন্সিল প্রবন্ধ'-এ ঘোষণা করেন। দেশে তখন কোন আন্দোলন নেই—গান্ধী সব আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তিনিও তখন জেলে। এই কংগ্রেসের পর কংগ্রেসের মধ্যে দুটি দল দেখা দিল—নো-চেঞ্জার ও প্রো-চেঞ্জার। দেশবন্ধু দ্বিতীয় দলেব নেতা হিসাবে কংগ্রেসের মধ্যে মতিলাল নেহরুর সহায়তায় একটি নতুন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি করেন—তার নাম স্বরাজ্য দল। এই দলের মুখপত্র হিসাবে ১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে ১২৮নং ধর্মতলা স্ট্রীটে স্থাপিত হয় নতুন ইংরেজি দৈনিকপত্র 'ফরোয়ার্ড'। দেশবন্ধুই ছিলেন এর প্রধান সম্পাদক। কিন্তু কাগজ চালানর সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয় সুভাষচন্দ্রের উপর। বলা বাহুল্য, তাঁর পরিচালনাগুণেই অল্পদিনের মধ্যে সর্ব ভারতীয় সংবাদপত্র জগতে 'ফরোয়ার্ড' শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। ফরোয়ার্ডের তিনি শুধু কর্মসচিবই ছিলেন না, মাঝে মাঝে সম্পাদকীয় প্রবন্ধও লিখতেন। স্বরাজ্য পার্টি যে নির্বাচনে

জয়লাভ করতে পেরেছিল তার মূলে ছিল ফরোয়ার্ড পত্রিকা। একজন প্রবীণ সাংবাদিক লিখেছেন: "সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড পত্রিকায় যে নানাবিধ নূতনত্ব প্রবর্তন করেছিলেন তার জন্য আমাদের দেশের সংবাদপত্র বিশেষভাবে ঋণী।" নির্বাচনে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের পরাজয়ের পর 'Bureaucracy is burried four fathers deep' —এই নাম দিয়ে সুভাষচন্দ্র যে সম্পাদকীয়টি রচনা করেছিলেন তা আজো অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

১৯২৪ সাল পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড পত্রিকার কর্মসচিব ছিলেন। এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বরাজ্য দল কলকাতা পৌরসভা দখল করে ও দেশবন্ধু এর প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন। দেশবন্ধু পৌরসভার প্রধান কর্মকর্তার পদে সুভাষচন্দ্রকে নিযুক্ত করলেন—কারণ এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য তাঁর চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর কাউকে তিনি পাননি। এই বছরের এপ্রিল মাসে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর নির্দেশক্রমে কর্পোরেশনের নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভ্য নির্বাচিত হলেন। অতঃপর কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তারূপে তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দেন তা দেখে সবাই চমৎকৃত হয়—কিন্তু আতঙ্কিত হয় শাসকবর্গ। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, সুভাষচন্দ্রের প্রেরণাতেই পৌরসভার মুখপত্র হিসাবে 'ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট' প্রকাশিত হয়। স্বনামধন্য সাংবাদিক অমল হোম এর প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের বলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ব্রহ্মদেশের কারাগারে তিনি যখন বন্দীজীবন যাপন করছেন তখন একদিন (১৯২৫, ১৬ই জুন) তিনি আচম্বিতে শুনলেন দেশবন্ধু আর নেই। গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে রাজবন্দী সুভাষচন্দ্রের চিন্তা কাঁটার মতো বিঁধেছিল দিবারাত্রি দেশবন্ধুর প্রাণে। নেতার আকস্মিক মৃত্যুতে মর্মাহতচিত্তে কারাগার থেকে সুভাষচন্দ্র লিখলেন: "হায়—রাগ করিবার, অভিমান করিবার জায়গাও আজ আমাদের ঘুচিয়া গেল।"

সবার প্রিয় সুভাষ

হেমন্তকুমার সরকার

সুভাষচন্দ্রের নাম আজ জগদ্বিখ্যাত। ত্যাগের প্রাচুর্যে, চরিত্রের গরিমায় এবং কর্মকুশলতায় সুভাষচন্দ্রের খ্যাতি দিগদিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।...এত শ্রদ্ধা ও খ্যাতি ভারতে আর কেহ অর্জন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

কিন্তু যেদিন সুভাষচন্দ্র বাড়ির বাহিরে পর্যন্ত যাইতেন না—তাঁহার মহত্ব ফুলের কুঁড়ির মধ্যে আবদ্ধ সৌরভের ন্যায় ছিল, সেদিন আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল এই মহাপুরুষের মহিমাকে প্রমাণ করিয়া স্বীকার করা। এখন হয়তো সুভাষের বিরাট জীবনে আমার স্থান কোথায় জানি না, এবং আমার রাজনৈতিক শত্রুগণের মিথ্যা প্রচারে সাধারণের মনে আমার সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভুল ধারণা জন্মিয়া থাকিতে পারে—কিন্তু সুভাষ এবং অন্তর্যামীই শুধু জানেন আমাদের সম্বন্ধটা কি। আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে আমরা বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বাল্যকাল হইতে একত্রে কাটাইয়াছি—এবং সেই সময়কার সমস্ত স্বপ্নগুলি সুভাষের জীবনে বাস্তব হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া আজ কত না আনন্দ লাভ করিতেছি।

এমন দিন গিয়াছে যখন একদিনের জন্যও তফাতে থাকিলে সুভাষ আমায় পত্র দিত। সুভাষের তিন-চার শত চিঠি আমার কাছে ছিল।...

সুভাষচন্দ্রের পৈতৃক নিবাস ২৪ পরগনার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে। তাঁহার পিতা রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসু শৈশবে ও যৌবনে নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া নিজের উন্নতি সাধন করেন। তিনি বহুদিন কটকের গবর্নমেণ্ট প্লীডারের কাজ বিশেষ যোগ্যতার সহিত করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি 'রায় বাহাদুর'

সুভাষচন্দ্রের রাশিচক্র

জন্মক্ষণ

শকাব্দ ১৮১৮। সন ১৩০৩

ইংরেজী ১৮৯৭। ২৩শে জানুয়ারি।

১১ই মাঘ শনিবার আন্দাজ ১২-১৫ মিনিট, দং ১৩।৩৭।৩০

কন্যারাশি—

উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র—

নরগণ—

বৈশ্যবর্ণ—

[হেমন্তকুমার সরকার লিখিত 'সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত]

উপাধি লাভ করেন। জানকীবাবু কটক মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। সন্তানগণের শিক্ষার জন্য তিনি গোড়া হইতেই বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁহার আট ছেলে ও ছয় মেয়ে সকলেই যথাযোগ্য শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ছেলেরা কটকে ইউরোপীয় ইস্কুলে বাল্যকালে শিক্ষালাভ করেন এবং পরে প্রায় সকলেই ইউরোপে গিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু ব্যারিস্টার এবং নেতা হিসাবে সকলের নিকট সুপরিচিত। ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসুর নামও অনেকে জানেন। সুভাষচন্দ্রের পরের ভাইটি শৈলেশ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া জেলে পর্যন্ত গিয়াছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের মাতা অতি পুণ্যশীলা রমণী। তাঁহার ধর্মভাব সুভাষের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সন্তানগণ উপযুক্ত হইলে জানকীবাবু কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সস্ত্রীক পুরীতে বাস করিয়াছেন। কলিকাতার এলগিন রোডের বাড়ি ছেলেদের জন্য জানকীবাবুই প্রস্তুত করেন। কটক হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িবার জন্য ১৯১৩ অব্দে সুভাষচন্দ্র এই বাসায় আসেন।

সুভাষচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই ধর্মপ্রাণ, এবং বড়লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও অতি সাদাসিধা রকমে চলেন। ছাত্রজীবনেই তাঁহার ভবিষ্যৎ-জীবনের মহত্বের অঙ্কুর সমস্তগুলিই দেখা গিয়াছিল। পিতা-মাতার তিনি মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। সুভাষ প্রথমবার জেলে গেলে তাঁহার পিতা লিখিয়াছিলেন—We are proud of Subhash।—এমন পিতা না হইলে এমন সন্তান হয় না।

সুভাষচন্দ্রের পিতা মাতা-ভাই-বোন সকলেই অশেষ গুণের আধার। এরূপ আকরেই মণিরত্নের জন্ম সম্ভব। সন ১৩০৩ সনের ১১ই মাঘ তারিখে সুভাষ কটকে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে কটকের ইউরোপীয় স্কুলে সুভাষ শিক্ষালাভ করেন। তারপর ইংরেজী ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে কটকের কলেজিয়েট স্কুলে প্রবেশ করেন। তাঁহার মত মেধাবী

এবং বহুগুণশালীছাত্র বিদ্যালয়ের গৌরব স্বরূপ ছিলেন। সেকেণ্ড-ক্লাসে পড়ার সময় শ্রীযুত বেণীমাধব দাস মহাশয় প্রধান শিক্ষক হইয়া আসেন। বেণীবাবুর আদর্শ দেবচরিত্র সুভাষকে মুগ্ধ করে। এই বেণীবাবু বদলি হইয়া অন্যত্র গেলে তাঁহারই চেষ্টায় তাঁহার একটি ছাত্রের সঙ্গে সুভাষের পরিচয় ঘটে এবং উভয়ে গভীর সৌহৃদ্যে বদ্ধ হন। এই সময় হইতে সুভাষের চরিত্রের অদ্ভুত বিকাশ আরম্ভ হয়। ইতিপূর্বে সুভাষ রামকৃষ্ণকথামৃত পড়িয়াছেন, ধ্যান-ধারণা অভ্যাস করিতেন এবং ধর্মপ্রাণা মাতৃদেবীর সহিত ধর্মবিষয়ে আলোচনা করিতেন। কিন্তু এখন যেন তাঁহার মনের সব বাঁধ ভাঙিয়া গেল। পরীক্ষার পড়ায় আর মন বসে না—পীড়িতের সেবা, দরিদ্রের দুঃখমোচন ইত্যাদি কর্মেই সুভাষচন্দ্রের সময় কাটিতে লাগিল। তবুও ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেন এবং ইংরেজী এত ভাল করিয়াছিলেন যে, পরীক্ষক স্বীকার করিয়াছিলেন—তিনিও ঐরূপ পারিতেন না।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত গণিত ও লজিক নিয়ে আই-এ-ক্লাসে ভর্তি হন। এই সময়ে ডাঃ সুরেশ বাঁড়ুয্যে মহাশয় ৩নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মেডিকেল মেসে একটি দল করিয়াছিলেন। এই দলে অনেক ভাল ভাল ছেলে ছিলেন। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল বিবাহ না করে দেশের সেবা করে ধর্মজীবন গ্রহণ করা। সুরেশবাবু অভয় আশ্রমের সভাপতিরূপে এখন সেই আদর্শ কার্যে পরিণত করিয়াছেন। বন্ধুর সহিত সুভাষচন্দ্র এই দলে যোগ দেন। পরে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি আরও অনেকে আসেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বন্ধুর সঙ্গে হরিদ্বার গিয়া গুরুর সন্ধানে হিমালয় যান। দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, গয়া প্রভৃতি স্থানে এই উপলক্ষে ঘুরিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। আগ্রাতে প্রেমানন্দ বাবাজী নামে এক সন্ন্যাসীর সহিত পরিচয় হয়। ইনি গ্রাজুয়েট, বড় ভদ্রলোক। গৃহস্থাশ্রমীদের মত থাকিতেন বলিয়া

তাঁহার সহিত বনিবনাও হইল না। বৃন্দাবনে এলে কুসুম সরোবরে ৺রাজর্ষি বনমালী রায় সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুর জন্য বৈষ্ণবশাস্ত্র পাঠের বন্দোবস্ত করেন। পরম সাধু রামকৃষ্ণ দাস বাবাজী কিন্তু তাঁহাদের মানসী, ধীশক্তি এবং মনোগত ভাব দেখিয়া কাশীতে গিয়া জ্ঞানমার্গের চর্চা করিতে উপদেশ দেন। বারানসীতে তাঁহারা কিছুদিন রামকৃষ্ণ মিশনের ৺ব্রহ্মানন্দ স্বামী ওরফে রাখাল মহারাজের নিকট থাকেন। তিনি বলেন: বাপ-মাকে না বলে পালিয়ে এসেছ—বাড়ি ফিরে যাও।

তাই কাশী থেকে রওনা হইয়া সুভাষচন্দ্র বন্ধুর সহিত বোধ-গয়া আসেন। বোধ-গয়ায় কিছুদিন থেকে মোহন্ত মহারাজের বিলাসিতাব বহর এবং সন্ন্যাসধর্মের দুরবস্থা দেখিয়া বাড়ি ফেরাই সঙ্গত মনে করেন।...

নানা অনিয়মে অত্যাচারে সুভাষের শরীর খারাপ হয়। অবিলম্বে টাইফয়েড জ্বরে সুভাষচন্দ্র বহুদিন শয্যাগত থাকেন। পূজার সময় কার্সিয়াংএ চেঞ্জে গিয়া শরীরটা একটু ভাল হয় এবং ১৯১৫ অব্দেই তিনি ২।৪ দিন পড়িয়া আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন—প্রথম শ্রেণীর উপর দিকেই তাঁহার নাম ছিল।

আই-এ পাস করার পর প্রেসিডেন্সি কলেজেই তিনি দর্শনে অনার্স নিয়ে পড়িতে থাকেন এবং নিজের চরিত্র ও কর্মক্ষমতা গুণে ছাত্রগণের নেতাব স্থান অধিকার করেন।

এই সময় অধ্যাপক ওটেন একটি ছেলেকে গালি দেওয়ায় ছাত্রদের মধ্যে গোলযোগ হয় এবং কলেজে ধর্মঘট করা ও ওটেন সাহেবকে মারার অপরাধে সুভাষচন্দ্র 'রাসটিকেটেড' হন। তাঁহার সহকর্মী শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন দাস অন্তরীণ হন—সুভাষচন্দ্রও কটকে প্রায় তদবস্থায় বছর দুই থাকেন। তারপর স্যার আশুতোষের চেষ্টায় পুনরায় পড়ার অনুমতি পাইয়া স্কটিশচার্চ কলেজে আবার বি-এ তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে দর্শনে অনার্স নিয়া ভর্তি হন। এই সময়ে

তিনি ইউনিভারসিটি সৈন্যদলে যোগদান করেন। বি-এ পরীক্ষায় দর্শনে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

তারপর ১৯১৯ অব্দে ইউনিভারসিটি Experimental Psychology—এম-এ ক্লাসে ভর্তি হন। এবং মাস দুইয়ের মধ্যেই পিতার প্রস্তাবমত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আই-সি-এস পড়িতে বিলাত যাত্রা করেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, যে অল্প সময় ছিল তাহার মধ্যে আই-সি-এস পাস করিতে পারিবেন না এবং কেম্ব্রিজের ডিগ্রি লইয়া শিক্ষাদান-ব্রত গ্রহণ করিয়া জীবন কাটাইবেন। পরীক্ষায় পাস করিয়া তিনি তাঁহার বন্ধুকে চিঠি লেখেন—"তুমি শুনে দুঃখিত হবে যে, আমি আই সি-এস পাস করে ফেলেছি এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করেছি। এখন উপায়।"

পূর্ব হতেই বন্ধুর সঙ্গে তাঁর কথা ছিল, যদি পাস করিতে পারেন তাহা হইলে I. C S. ছাড়িয়া চাকরি রোগগ্রস্ত বাঙালীদের সামনে এক নতুন আদর্শ স্থাপন করিবেন। আই-সি-এস-এ তিনি ইংরেজী রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২১ অব্দের মে মাসে কেম্ব্রিজের বি-এ ডিগ্রী নিয়া আই সি-এস ছাড়িয়া অসহযোগ আন্দোলনের কাজে দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্তরূপে যোগ দেন। আই সি-এস ছাড়ার আগে দেশবন্ধুকে তিনি পত্র দিয়া কি কাজ পাইবেন, জানিতে চাহিয়াছিলেন। দেশবন্ধু ন্যাশনাল কলেজ ও কাগজের ভার তাঁকে দিবেন বলিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। সেক্রেটারি অব ষ্টেটের অনেক অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র আই-সি এস পদ ত্যাগ করেন। এই ঘটনায় বিলাতের অনেকে আই-সি-এস না হওয়ার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। সুভাষচন্দ্রের অনুসরণেই শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় ব্যারিস্টারি না করিয়া দেশবন্ধুর সহিত যোগ দেন।

ন্যাশনাল কলেজে অধ্যক্ষপদে থাকার সময় ভলান্টিয়ার আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং সুভাষচন্দ্র এই আন্দোলনের নেতাপদে নিযুক্ত হন। ১৯২১ অব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি ১৭ (বি) ধারায় দেশবন্ধুর সঙ্গে গ্রেপ্তার হন এবং প্রায় তিন মাস হাজতে থাকার পর ছয়

মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দণ্ডাদেশ শুনিয়া সুভাষচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"Have I robbed a fowl?"—"আমি কি মুর্গী-চোর যে, অত কম দণ্ড হল?"

সুভাষচন্দ্র জেলে থাকিতে দেশবন্ধুর রন্ধন কার্যে নিযুক্ত থাকতেন। জেল থেকে খালাস পাইয়া কিছুদিন পরে তিনি উত্তরবঙ্গ জলপ্লাবন রিলিফ কমিটির ভার নিয়া অদ্ভুত কর্মকুশলতা প্রদর্শন করেন।

উত্তরবঙ্গ হইতে ফিরিয়া সুভাষচন্দ্র দৈনিক "বাংলার কথা" চালান। ১৯২২ অব্দের ডিসেম্বর মাসে গয়া কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর সহকারীরূপে যান। সেখানে স্বরাজ্য দল গঠিত হয় এবং সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর প্রধান সহকারীরূপে এই দলের বাংলাদেশে সাফল্য সম্পাদন করেন। ফরওয়ার্ড পত্র পরিচালন ও কাউন্সিল নির্বাচন উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র অদ্ভুত পরিশ্রম করেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হন। তিনি নিজে কাউন্সিলে দাঁড়াননি; কারণ বাহিরে কাজ যথেষ্ট ছিল, আবার ভোটারের তালিকায় তাঁহার নামও ছিল না।

১৯২১ অব্দে সুভাষচন্দ্র Young Bengal Party নামে একটি দল গঠনের পরিকল্পনা করেন। সেই দলের অনুষ্ঠানপত্র হইতে দেখা যায় সুভাষচন্দ্র ভারতে পূর্ণ স্বাধীনসূচক স্বরাজ লাভই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন। ধর্ম, সমাজ এবং মতামত বিষয়ে তিনি সকলের যথাসম্ভব স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন। শ্রমিক এবং কৃষকগণের স্বার্থের সহিত এই দলের একীকরণ তাঁর ঈপ্সিত ছিল।

শ্রমিকগণকে যাহাতে অতিরিক্ত খাটিতে না হয়, বেতনের একটা নিম্নতম হার থাকে, অসুখের সময় বেতন না কাটা যায়, বৃদ্ধকালে পেন্সন দুর্ঘটনাস্থলে ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি পায়, সে বিষয়ে চেষ্টা করা এই দলের অভিপ্রেত ছিল।

কৃষকগণকে অন্ততঃ নিম্নলিখিত অধিকার দেওয়া সুভাষচন্দ্রের মত ছিল:

(১) অন্যায় এবং বাজে আদায় বন্ধ করা।

(২) সুদের একটা চরম হার নির্ধারণ।

(৩) গাছ কাটা, ইহারা পুকুর কাটা এবং দালান ইমারত করার অবাধ অধিকার।

(৪) হস্তান্তরের অবাধ ক্ষমতা।

(৫) কৃষকের ভূমিতে স্বত্বলাভ।

১৯২৪ অব্দে কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন, কিন্তু ২৪শে এপ্রিল তারিখে তিনি এক্সিকিউটিভ অফিসারের পদে বরিত হন। তিন হাজারের স্থলে সুভাষচন্দ্র অনাবশ্যক বিধায় মাত্র দেড় হাজার টাকা বেতনের বেশি গ্রহণ করেন নাই। যে অল্প কয়েক মাস তিনি কাজ করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেরই তিনি প্রশংসার পাত্র হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আমলাতন্ত্রের এতটা সহ্য হইল না—সুভাষচন্দ্র ১৯২৪ অব্দের ২১শে অক্টোবর তারিখে বিনা বিচারে বন্দী হইলেন। আলিপুর জেলে থাকিতে তিনি কিছুদিন কর্পোরেশনের কাজ চালাইতেন, কিন্তু কর্তারা তাঁহাকে বহরমপুর চালান দিলেন এবং কিছুদিন পরে সেখান হইতে একেবারে ব্রহ্মদেশে মান্দালয় জেলে পাঠাইলেন।

মান্দালয়ে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে—রাত্রে ঘুম হয় না—পিঠে বেদনা—অজীর্ণ রোগে ওজন প্রায় ত্রিশ সের কমিয়া যায়। পরে তাঁহাকে ইনসিন জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখান হইতে সুইজারল্যাণ্ডে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার্থ পাঠাইবার জন্য গবর্নমেণ্ট প্রস্তাব করেন। সুভাষচন্দ্র সে প্রস্তাবে রাজী হন না। অতঃপর আলমোড়া পাঠাইবার জন্য তাঁকে কলিকাতা আনা হয়। তথায় ডাক্তারের পরামর্শে বাংলার নূতন গবর্নর ষ্ট্যান্‌লী জ্যাকসন তাঁহাকে ১৫ই মে, ১৯২৭ তারিখে বিনা শর্তে মুক্তিদান করেন।…

মুক্তির সংবাদ অতি অল্পকালমধ্যে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং ইহাতে সকল স্থানেই অতিশয় আনন্দ ও উল্লাস লক্ষিত হয়। বেলা

প্রায় একটার সময় কলিকাতার দৈনিক 'ফরোয়ার্ড' ও 'ইংলিশম্যান' মুক্তি-সংবাদ বহন করিয়া দুইখানি বিশেষ সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং তাহা সন্ধ্যার মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়। কলিকাতা ও হাওড়া কর্পোরেশনের কার্যালয় ও কলিকাতার বহুবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট ও চিৎপুরের বহু দোকানপাট মুক্তি-সংবাদ পাইবামাত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কেহ কেহ তাঁহাদের গৃহ দীপালোকে সজ্জিত করেন। বস্তুতঃ সুভাষবাবুর মুক্তি-সংবাদে শহরে যেরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, বহুদিন এরূপ আর হয় নাই।

এই রচনায় সুভাষচন্দ্রের বন্ধুরূপে উল্লিখিত মানুষটি স্বর্গীয় হেমন্তকুমার সরকার স্বয়ং।

তুমি তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নও, তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ—তাই তো দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়!

তাই তো দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড়-পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়!—কোন বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য তো প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার তো শুধু তোমাকে মনে করিয়াই নির্মিত হইয়াছিল, সেই তো তোমার গৌরব।

তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার?

এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে তো কেবল তোমারই জন্য!

দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই তো ভগবান এতো বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন।

মুক্তিপথের অগ্রদূত, হে পরাধীন দেশের রাজবিদ্রোহী, তোমাকে শতকোটি নমস্কার!

মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় প্রেমে—এই প্রেম যত বড়, মানুষ তত বড়। সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেম—তাহার কি তুলনা আছে? তেমন প্রেম পৃথিবীর ইতিহাসে আর কাহারও মধ্যে ঠিক সেই মাত্রায় ও সেই রূপে প্রকাশ পাইয়াছে? এ প্রেম—আত্মার আত্মোৎসর্গের যে আনন্দ, সেই আনন্দ-পিপাসা। স্বামী বিবেকানন্দ ইহাকে জ্ঞানে কর্মে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, সুভাষচন্দ্র ইহাকে জ্ঞানে নয়, ধ্যানেও নয়—তাঁহার নিঃশ্বাসবায়ুরূপে পাইয়াছিলেন। এই প্রেম ভাব-সাধনার প্রেম নয়…ইহা শক্তিমান শাক্তের প্রেম, ইহা প্রীতি-মন্দাকিনী নিষ্কলুষ কর্মধারায় অহরহ বেগবান; ইহা আপনার মধ্যে আপনি আত্মমুগ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না—শক্তির জগতে নিজেকে প্রসারিত করিয়া, জীবনের অগ্নিক্ষেত্রে পুরুষ-যজ্ঞের বলিরূপে আপনাকে আহুতি দিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে চায়। সুভাষচন্দ্র যে-দেশে, যে-যুগে, যে-জাতির মধ্যে জন্মিয়াছিলেন তাহাতে সেই অগ্নিক্ষেত্র ও যজ্ঞবেদিকা পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। তিনি ছিলেন শাক্ত—বাঙালীর সন্তান, তাই সেই আত্মবলির জন্য একটি দেবীর প্রয়োজন ছিল; ধ্যানকল্পনা বা কবিত্বের দেবী নয়—একেবারে সাক্ষাৎ মৃন্ময়ী মূর্তি। সেই মূর্তিও গড়িয়া লইতে হয় নাই, পূর্বগামী সাধকগণ তাঁহার জন্য গড়িয়া রাখিয়াছিলেন। সেই মূর্তি—দেশমাতৃকার সেই ভূলুণ্ঠিত রাজরাজেশ্বরী মূর্তি তাঁহাকে পাগল করিয়াছিল। তাঁহারই প্রেমে তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেন—জীবন ও যৌবন তাহাকেই সমর্পণ করিলেন; এমন সর্বত্যাগ আর কেহ করে নাই। এমন একনিষ্ঠ প্রেম, এমন অনন্যময়তা বোধহয় আর কোন দেশোদ্ধারব্রতী ইতিহাসে প্রসিদ্ধ পুরুষের জীবনে লক্ষিত হইবে না।…সুভাষচন্দ্রের প্রেমে পাত্রভাগ

ছিল না, ঐ এক প্রেম ও এক পাত্র ভিন্ন তাঁহার জীবনে আর কিছুই ছিল না।

কিন্তু ঐ প্রেমও মূলে মানবাত্মারই এক গভীর চেতনা ও বেদনা-প্রসূত। মানুষ সুভাষচন্দ্রকে না দেখিলে এই প্রেমের সেই মূলটিকে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। একদিকে যেমন আত্মার আত্মসম্মানবোধ, অপরদিকে তেমনই সর্ব-অভিমান ত্যাগ করিয়া অতি দীন-হীন দুঃখী-জনকে বক্ষে আলিঙ্গন করিবার—সেবা করিবার সে কী আকিঞ্চন! শোনা যায়, পথের ধূলা হইতে রোগকাতর কাঙাল বালককে কুড়াইয়া বক্ষে বহিয়া গৃহে আনিতে তাঁহার বাধিত না; এ কাহিনী সুভাষচন্দ্রের পক্ষে আদৌ অসম্ভব নহে।

সুভাষচন্দ্র যখন অতিশয় স্বাস্থ্যভগ্ন অবস্থায় মাদ্রাজের জেলে কিছুদিন আবদ্ধ ছিলেন সেই সময়ে অপর একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বন্দী তথায় ভিন্ন কক্ষে বাস করিতেন। এই বন্দী লিখিয়াছেন, তখন সুভাষচন্দ্র পাকস্থলীর কঠিন ব্যাধিতে মরণাপন্ন, আহার্য পথ্য প্রায় কিছুই ছিল না, যাহা ছিল তাহাও তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু সেই অবস্থাতেই তিনি প্রত্যহ নিজহস্তে কিছু-না-কিছু খাদ্য পাক করিয়া জেলের তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদিগকে আহ্বান করিয়া খাওয়াইতেন, এবং সেই অবকাশে তাহাদিগকে মিষ্ট বাক্যে সদুপদেশ দিতেন—নিজে প্রায় অভুক্ত বলিলেও হয়। স্বহস্তে পাক করিতে তিনি ভালবাসিতেন, এবং তাহা অভ্যাস করিয়াছিলেন; তাঁহার মধ্যে যেন একটি মাতৃ-হৃদয় ছিল, এইরূপ পাক করিয়া পরকে খাওয়াইবার আগ্রহ—সেইরূপ স্নেহেরই অভিব্যক্তি। লেখক বলিতেছেন, এই মহাপ্রাণ পুরুষকে তিনি পূর্ব হইতেই পূজা করিতেন, এক্ষণে তাঁহার ঐ শারীরিক অবস্থা, এবং সেই অবস্থায় নিজের ঔষধ-পথ্য সম্বন্ধে ঔদাসীন্য, এবং তদুপরি এইরূপ সেবাকর্মের পরিশ্রম দেখিয়া তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না—নির্জনে কাঁদিতেন কিন্তু কিছুতেই সুভাষ-চন্দ্রকে আত্মরক্ষা বা আত্মকল্যাণ চিন্তায় অবহিত করিতে পারিতেন না।

উপরে ঐ যে কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছি, উহার মধ্যেই সুভাষ-চরিত্রের আদি-রূপ দেখিয়া লইতে হইবে। সুভাষের দেশপ্রেম একটা বড় সেন্টিমেণ্ট বা প্রবল হৃদয়াবেগ মাত্র ছিল না, তাহার মূলে ছিল অপার করুণা ; করুণা বলিতে দয়া নয়, ইহা সেই অনুকম্পা—যাহাতে দাতাও দানকালে ভিখারীর সমান হয়, সেও যেন যাজ্ঞা করে, যেন গ্রহণ কবিলে সে কৃতার্থ হয়। এই সুভাষচন্দ্র যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? এত বড় প্রেম যাঁহার, তাঁহার সেই যোদ্ধ্বেশের অন্তরালে কোন্ হৃদয় স্পন্দিত হইতেছিল ? সাক্ষাৎ আততায়ী তাঁহাকে বধ করিতে আসিয়া ধৃত হইয়াছে—তেমন ব্যক্তিকেও তিনি আলিঙ্গন করিয়া মুক্তি দিয়াছেন। কতবার যে সামরিক আইন অগ্রাহ্য করিয়া বিশ্বাসঘাতক সেনানীকে ক্ষমা করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়া আজাদ-হিন্দ-ফৌজের এক উচ্চ কর্মচারী পরে দুঃখ করিয়াছেন : তাহাতে অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্র যখন যুদ্ধক্ষেত্র পবিদর্শন করিতে যাইতেন তখন সেনানিবাসে পৌঁছিয়া তিনি সর্বাগ্রে নিম্নতম সৈনিকদের ভোজন-শালায় প্রবেশ করিতেন, এবং নিজে তাহাদের খাদ্য আস্বাদন করিয়া দেখিতেন, তাহা খাদ্য কি অখাদ্য। যুদ্ধশেষে রেঙ্গুন হইতে প্রত্যাবর্তন কালের একটি ঘটনাও উল্লেখযোগ্য ; তিনি নিজে 'ঝান্সীব রানী'—নারীসেনার কয়েকজনকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার গবর্নমেণ্ট তখন ব্যাঙ্কক শহরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। রক্ষীবেষ্টিত সামরিক যানে তথায় তাঁহার গমন করিবার কথা ; তিনিই সর্বাধিনায়ক, আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সর্বস্বধন, তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত। কিন্তু তিনি সে সকল কথা গ্রাহ্য করিলেন না ; ঐ কতিপয় নারী-সৈন্যকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য নিজেই মাথার উপরে শত্রুপক্ষের বিমান হইতে গোলা বর্ষণ, পথে সাঁতার দিয়া নদী পার, মাঝে মাঝে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ প্রভৃতি সর্বপ্রকার সঙ্কট ও দৈহিক কষ্ট তুচ্ছ করিয়া তাহাদিগকে বিপদমুক্ত অবস্থায় রাখিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।...

এ মানুষ কি শুধুই 'নেতাজী? এ যে মানবাত্মার এক নবতম পরিচয়! ভারতভূমি ভিন্ন আর কোন দেশে এহেন রূপ কখনও সম্ভব হইত না। আজাদ-হিন্দ সেনার প্রত্যেক নর-নারী এই রূপ দেখিয়াছে, দেখিয়া—'মুক্ত' হইয়া গিয়াছে। নহিলে, তাহারা অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারিত না, নিশ্চিত পরাজয়কে জয়ে পরিণত করিবার এমন বিশ্বাস হৃদয়মধ্যে লাভ করিত না; এবং অতিশয় দুরধিগম্য স্থানে প্রবেশ করিয়া যুবা ও বালক নির্বিশেষে তাহাদের পীড়িত উপবাসক্লিষ্ট দেহের শেষ রক্তবিন্দু ও শেষ নিঃশ্বাস, কেবল 'নেতাজী'—নাম উচ্চারণ করিয়া এমন হাসিমুখে উৎসর্গ কবিতে—এবং তাহাতেই চরম ও পবম শান্তিলাভ করিতে পারিত না। যে-পুরুষকে তাহারা 'নেতাজী' নাম দিয়াছিল, সে-পুরুষ সকল নামেব অতীত; সে প্রেমকে কেবল হৃদয়ে অনুভব করা যায় মুখে উচ্চারণ করা যায় না। তথাপি ঐ নামই তাহার নির্দেশক হইয়াছে, ঐ নামের গুণেই শুষ্কতরু মঞ্জুরিত হইতেছে—ঐ নামই এক মহাশক্তি-মন্ত্রের সমান হইযা উঠিয়াছে। তৎসত্ত্বেও একথা যেন আমবা বিস্মৃত না হই যে, ঐ নাম ভারতের মুক্তিদাতা এক মহাশক্তি-সাধকের নাম, প্রেমের এক অপূর্ব শক্তি ঐ পুরুষের রূপে মূর্তি-ধারণ করিয়াছিল। সেই শক্তি অমব, তাহার মৃত্যু নাই—তাই পরাজয় নাই; তাই কোন কালে কোন অবস্থায় 'জয়তু নেতাজী' বলিতে কোন ভারত-সন্তানের কিছু-মাত্র বাধিবে না।

তখন সুইটসারল্যাণ্ডে ছিলাম। লুগানো শহরে বা পল্লীতে। হঠাৎ সুভাষ বসুর টেলিগ্রাম পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে চিঠি। চিত্তরঞ্জনের "ফরোয়ার্ড" দৈনিক তখন সবে বেরিয়েছে বা বেরোয়-বেরোয় হয়েছে। ১৯২৩ সন।...

"ফরোয়ার্ড"-এর জন্য এই অধমকে "বিদেশী-সংবাদদাতা" বাহাল করা হয়েছিল। আমার উপর ভার ছিল ফরাসী, ইতালিয়ান আর জার্মান ভাষায় প্রচারিত বিশ্ব-সংবাদ টেলিগ্রাফে "ফরোয়ার্ড"-কে পাঠাবার। চিঠিতে লেখা ছিল—"রয়টারকে হারাতে হবে।"- এই কথাটায় খুব খুশী হয়েছিলাম।...

বুঝলাম, বাঙালীর বাচ্চারা এতদিনে সজ্ঞানে বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহারে ঝুঁকেছে। কম্-সে-কম্ সংবাদপত্র-সেবায় বাংলার যুগান্তর এসেছে বা আসছে। চিঠি পেয়েই লুগানোর তার অফিসে খবর নিলাম,— আমার দেওয়া খবর সাংবাদিকদের সস্তা হারে ফরোয়ার্ডে পাঠাবে কি না।

তক্ষুণি তারা লণ্ডনের সঙ্গে কথা কয়ে রাজী হ'লো। বললে, "কুছ পরোয়া নেই। ফরোয়ার্ডের জন্য খবর তোমার কাছ থেকে বিনা পয়সায় পাঠিয়ে দেবো। পয়সা আদায় করে নেবো কলকাতা থেকে লণ্ডনের মারফৎ।"...

প্রথম সংবাদটা ছিল তুর্কি সম্বন্ধে। সেই সময় সুলতানকে খেদিয়ে দেয় কামাল পাশা। ফরাসী-ইতালিয়ান-জার্মানে নানা মন্তব্য প্রচারিত হ'লো। সেই সবের চুম্বক তারে ছেড়ে দিলাম। মাত্র কয়েক লাইনেই দেখি লাগলো পঁচিশ টঙ্কা।

চক্ষু স্থির!...

বুঝলাম, অত টাকা খরচের ক্ষমতা বাঙালী মুরোদে জুটবে না।

তার জানালাম সুভাষকে, "ভায়া, এসব এলাহি কারখানা পোষাবে না, সন্দেহ হচ্ছে। হপ্তায় হপ্তায় চিঠি ছাড়া যাবে ডাকে। তাতেই যথেষ্ট। ক্বচিৎ কখনো তারাঘাতও চলতে পারে। কিন্তু তার-বিলাস বর্জনীয়, —নিত্যনৈমিত্তিকভাবে।"··

সুভাষ তখন জেলে। ফরোয়ার্ডের দপ্তর থেকে তার মামা বীরেন দত্তর জবাব এলো—"তাই সই।" তারপর থেকে ফী সপ্তাহে একটা করে চিঠি ছেড়েছি যতদিন বিদেশে ছিলাম।

১৯২৩ সনের নভেম্বর-ডিসেম্বর হতে ১৯২৫ সনের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাইশ-তেইশ মাস এই অধমের চিঠি নিয়মিত বেরিয়েছে ফরোয়ার্ডে।

সেই সব কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি শহরের নানা কাগজে উদ্ধৃতও হ'তো, সুতরাং বলতে বাধ্য যে, প্রায় বছর দুয়েক আমি পারিভাষিক হিসাবেও সাংবাদিক বা সংবাদপত্রসেবী ছিলাম।···

ফরোয়ার্ডই বোধহয় বাঙালী দৈনিকের ভেতর বাঙালীকে সর্বপ্রথম "বিদেশী সংবাদদাতা" বাহাল করেছে। বিদেশী লোকজন বাহাল করে সংবাদ আমদানি করা বোধহয় ফরোয়ার্ডের আগেও ঘটেছে। "বেঙ্গলী," "অমৃতবাজার পত্রিকা" ইত্যাদি দৈনিকের প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষকরা খাঁটি খবর দিতে পারবে। এই অধমই বোধহয় বাঙালী সাংবাদিকদের ভেতর কাল হিসাবে "সর্বপ্রথম" "বিদেশী-সংবাদদাতা"।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার রচিত "বিনয় সরকারের বৈঠক" (১ম ভাগ) গ্রন্থের অংশবিশেষ।

সেদিন রাত্রিতে আহারের পূর্বে বসিয়া বসিয়া নানা রকম কথাবার্তা বলিতেছিলাম। সুভাষবাবুকে বলিলাম—যদি কিছু মনে না করেন, তবে কলিকাতা হইতে আপনার পলায়নের কাহিনী আপনার নিজমুখে শুনিতে চাই।

সুভাষবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন—অনেকদিন ধরিয়াই ইচ্ছা ছিল মস্কোতে যাইব, কিন্তু ব্যবস্থা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। যাঁহারা বলিয়াছিলেন আমাকে মস্কোতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, তাঁহারা দুই মাস আগেই আমাকে গুপ্তভাবে ভারতের বাহিরে পাঠাইয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময় ভারত ছাড়িয়া আসা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। প্রথমতঃ, কলিকাতা কর্পোরেশন সম্পর্কে কতকগুলি জরুরী কাজ আমার হাতে ছিল। দ্বিতীয়তঃ, তখনও লম্বা দাড়ি রাখিতে পারি নাই। ছদ্মবেশের জন্য লম্বা দাড়ি খুবই কাজে লাগে। এই জন্যই সে সময়ে আমি ভারত ত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়াছিলাম। এখন বুঝিতে পারিতেছি, সে সময় যদি ভারত ত্যাগ করিতে পারিতাম, তবে কত সহজে মস্কো পৌঁছিতে পারিতাম। আমার সঙ্গে যাঁহার আসার কথা ছিল, রুশ দূতাবাসের লোকদের সঙ্গে তাঁহার খুব জানাশোনা ছিল। যখন আমি তাঁহার সঙ্গে যাইতে রাজী হইলাম না, তখন তিনি একাই চলিয়া গেলেন। এখন তিনি মস্কোতে আছেন।

এক খণ্ড জমি লইয়া (মহাজাতি সদন) কলিকাতা কর্পোপেশনের সহিত ঝগড়া চলিতেছিল। সেই কলহ কোনরকমে মিটাইয়া ফেলিলাম। তখন আমার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং

চিকিৎসকগণ আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়াছেন। এই অজুহাতে আমি বাড়ি হইতে বাহির হওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলাম। আমি কঠোর নির্দেশ দিলাম যে, কেহ যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে। যদি আমার কাছে কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহা হইলে সে যেন টেলিফোনে কথা বলে। কোন আগন্তুককেই আমার সম্মুখে আসিতে দিতাম না। পলায়নের কয়েকদিন আগে আমার আত্মীয়দের পর্যন্ত আমাদের ঘরে আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলাম। চাকরকেও আদেশ দিয়াছিলাম যে, সে যেন আমার খাবার ঘরের বাহিরের টেবিলের উপরে রাখিয়া চলিয়া যায়।

ইতিমধ্যে যাঁহারা আমার পলায়নের ব্যবস্থা করিতেছিলেন তাঁহা-দিগের নিকট আবশ্যকীয় সব খবর পাইলাম এবং পলায়নের একটা তারিখ স্থির করিলাম। আমার দাড়ি চল্লিশ দিনের মধ্যে কামাইলাম না। ১৫ই জানুয়ারি [১৯৪১] সমস্ত ব্যবস্থা এক রকম সম্পূর্ণ হইয়া গেল। রাত্রি ৮টার সময় মৌলভীর ছদ্মবেশে আমি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া একটি গাড়িতে উঠিলাম এবং সেই গাড়িতে করিয়া চল্লিশ মাইল দূরে এক রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছিলাম। (সুভাষবাবু স্টেশনের নামটি আমায় বলিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাহা আমার মনে নাই)। ঐ স্টেশনে পেশোয়ারের একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটিয়া ডাক গাড়িতে উঠিলাম। সমস্ত রাত্রিটা বেশ নিরাপদেই কাটিয়া গেল। পরদিন একজন শিখ যাত্রী আমার কামরায় উঠিলেন। আমরা পরস্পর মুখোমুখি হইয়া বসিলাম।

কথোপকথন প্রসঙ্গে ঐ শিখ ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথা হইতে আমি আসিয়াছি, কোথায় যাইতেছি, কি কাজে বাহির হইয়াছি।

আমি বললাম—আমার বাড়ি লক্ষ্ণৌতে, আমার নাম জিয়াউদ্দীন, আমি একজন ইন্সিওরেন্স অর্গানাইজার, যাইতেছি রাওয়ালপিণ্ডি।

ভদ্রলোক সারাদিন আমার সঙ্গে ট্রেনে ছিলেন। কোন স্টেশনে

ট্রেন থামিলেই আমি একখানা খবরের কাগজের আড়ালে মুখ ঢাকিয়া রাখিতাম।

আমার পরিধানে খুব আঁটাসাঁটা পায়জামা, একটা সেরওয়ানী এবং মাথায় একটি ফেজ ছিল। সে অবস্থায় আমাকে চিনিতে পারা যে কোন পাকা ডিটেকটিভের পক্ষেও কষ্টসাধ্য। বিশেষ করিয়া আমার ঐ লম্বা দাড়ি দেখিয়া আমাকে চিনিতে পারে কার সাধ্য! আমাকে একেবারে হুবহু মৌলভীর মত দেখাইতেছিল। পথটা নির্ঝঞ্ঝাটেই কাটিল। ১৭ই জানুয়ারি রাত্রি নয়টার সময় পেশোয়ার পৌছিলাম। স্টেশনে আমার জন্য একখানি মোটর গাড়ি প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে মোটরে চড়িয়া সোজা একটা পূর্ব-নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিলাম।

দুই দিন পেশোয়ারে কাটাইলাম। আমার বন্ধুগণ আমার কাবুল যাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, সেজন্য এ দুই দিন পেশোয়ারে অপেক্ষা করিতে হইল। আমাকে পেশোয়ারে নিরাপদ রাখিবার জন্য বন্ধুরা যে চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার আমি প্রশংসা না করিয়া পারি না। আমার পেশোয়ারে অবস্থিতির কথা কেহ বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারে নাই। ১৯শে জানুয়ারি তারিখে আমাকে পাঠানের পোশাক দেওয়া হয়। আমার বন্ধুরা মনে করিলেন যে, সংযুক্ত প্রদেশের মৌলভীর বেশ অপেক্ষা আফগানিস্থানের পাঠানের বেশই আমাকে মানাইবে ভাল। রহমৎ খাঁ এবং আর একজন বন্ধুসহ একটি মোটরে করিয়া পেশোয়ার হইতে বাহির হইলাম এবং জামরুদের রাস্তা ধরিলাম।

জামরুদ কিল্লার কিছু দূরেই একটা কাঁচা সড়ক বাহির হইয়া অন্য দিকে গিয়াছে। আমরা সেই কাঁচা সড়ক ধরিলাম। শেষকালে গার্হী নামে একটা ছোট গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। মোটরের রাস্তা সেখানেই শেষ, সুতরাং আমাদিগকে নামিতে হইল। রাত্রিটা গার্হীতেই কাটাইলাম। পরদিন রহমৎ খাঁ এবং আমি হাঁটিয়া কাবুলের

দিকে রওনা হইলাম। আমাদের সঙ্গে দুইজন বন্দুকধারী পাঠান চলিল। আমাদিগকে পথিমধ্যে রক্ষা করিবার জন্য এই দুইজন পাঠানের পূর্ব হইতেই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সঙ্গে যে বন্ধুটি আসিয়াছিলেন। তিনি মোটর লইয়া পেশোয়ারে ফিরিয়া গেলেন। ঠিক হইল এখন হইতে আমাকে বোবা-কালার অভিনয় করিতে হইবে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা ভারতের সীমা পার হইয়া গেলাম। ভারতের সীমারেখা আস্তে আস্তে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিছুদূর চলিয়া সীমান্তের খণ্ডজাতিসমূহের বাসভূমির একটা গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেই গ্রামে 'আড্ডা শরীফ' নামে একটি বিখ্যাত দরগা আছে। সেই দরগাতে একজন পীর বাস করেন। তিনি আমাদেব থাকিবার সব ব্যবস্থা ঠিক করিয়াছিলেন। পাহাড়ী বন্ধুর পথে চলিতে চলিতে আমরা মড়ার মত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। রাত্রিটা পীর সাহেবের মসজিদে কাটাইলাম।

গাহী হইতে যে দুইজন সশস্ত্র পাঠান আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা এবার বিদায় হইল। পরদিন আমাদের সঙ্গে অপর তিন-জনকে দেওয়া হইল। তাহাদের হাতেও বন্দুক ছিল। পথটা অতি দুর্গম। পথে ক্রমাগত বিশ্রাম করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হইল। রাত্রি নয়টার সময় লালপুরায় পৌঁছিলাম। এখানে আগে হইতে আমাদের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। রাতটা এখানে আরামেই কাটাইলাম। আমাদের অতিথি-সৎকারক ছিলেন এখানকার একজন প্রতিপত্তিশালী খান; বস্তুতঃ তিনিই এখানকার শাসনকর্তা। আফগান সরকারী মহলে তাঁহার খুব প্রতিপত্তি আছে।

এরই মধ্যে আমি গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার জন্য খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমাকে আশ্বাস দিয়া বলা হইল যে, আর মাত্র কয়েক মাইল গেলেই কাবুল নদের ধারে যাইয়া পৌঁছিব। কাবুল নদ পার হইতে পারিলেই মোটরের রাস্তা পাওয়া যাইবে। তারপর বাসে করিয়া যাইতে পারিব।

লালপুরা ছাড়িয়া যাইবার আগে আমাদের আশ্রয়দাতা একখানা পরিচয়পত্র দিলেন। যদি পথে আমাদিগকে কেহ সন্দেহ করে কিম্বা কোন রকম বিপদ ঘটে, তাহা হইলে ঐ পরিচয়পত্র দেখাইয়া আমরা নির্ঝঞ্ঝাটে চলিতে পারিব। তিনি একথাও আমাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, যদি এই পরিচয়পত্র সঙ্গে থাকে আমাদিগকে আফগানিস্থানের কেহ হয়রান করিবে না।

আমি নিজে লালপুরার খানের দেওয়া পরিচয়পত্রটি পাঠ করিলাম। উহা পারসিক ভাষায় লেখা ছিল। পরিচয়পত্রে বলা হইয়াছিল, 'রহমৎ খাঁ এবং জিয়াউদ্দীন লালপুরা অঞ্চলের লোক, তাঁহারা সাখি সাহেবের দরগায় যাইতেছেন। আমি নিজে তাঁহাদের আচরণের জন্য জামিন থাকিয়া এই পরিচয়পত্র লিখিয়া দিলাম। কেহ যেন তাঁহাদিগকে হয়রান না করে কিম্বা বিপদে না ফেলে।'

আমি বোসবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—যে সি আই. ডি. কনেষ্টবলটা আপনাদিগকে হয়রান করিতেছিল তাহাকে ঐ পরিচয়পত্র দেখাইলেন না কেন?

সুভাষবাবু বলিলেন দেখাইয়াছিলাম বই কি; তাহাতেই কোন রকমে আমরা তাহার কবল হইতে রেহাই পাইলাম। যেদিন ঘড়িটা দিয়া দিতে হইয়াছিল সেই দিনই ঐ পত্র দেখাইয়াছিলাম। তাহার আগে পর্যন্ত লোকটা আমাদিগকে পীড়ন করিতেছিল। পত্রটি দেখাইবার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা নরম হয়। তবে পরিচয়পত্র দেখিবার গরজ লোকটার তত ছিল না, সে ছিল টাকা আদায়ের ফিকিরে।

বোসবাবু বলিতে লাগিলেন—লালপুরা ছাড়িবার পর দুইজন সশস্ত্র লোক আমাদের চলনদার ছিল। কয়েক মাইল হাঁটার পর আমরা কাবুল নদের ধারে পৌঁছিলাম। কিন্তু পার হই এমন কোন নৌকা সেখানে পাইলাম না। এখানের লোকেরা ভিস্তিওয়ালাদের কতকগুলি চামড়ার থলে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া নৌকার মত একটা কিছু তৈয়ারী করে। উহার উপর উঠিতে প্রথমে আমার ভয়ই

করিতে লাগিল—কি জানি যদি ডুবিয়া যাই ; তারপর যখন দেখিলাম, সকলে কোন প্রকার ভয় না করিয়া অনায়াসে উহার উপর উঠিতেছে, তখন আর আমি কোন ভয় করিলাম না। মাছ ধরিবার একটা জাল ভিস্তিওয়ালার থলির উপর, তাহার উপর বসিলাম, এবং নদী পার হইলাম। এতক্ষণে আমরা আফগান অঞ্চলে পৌঁছিলাম। এখানে অস্ত্রসহ রাস্তা চলা নিষেধ। কাজেই আমাদের চলনদার দুইজনকে নদীব অপব পারে বিদায় দিতে হইল।

এভাবে অন্য রাস্তা দিয়া আসিয়া আমরা ডাকার ঘাঁটি এড়াইলাম। ডাকা পেশোয়ার হইতে ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। যাহারা কাবুল এবং পেশোযারের মধ্যে যাতায়াত করে তাহাদিগকে এখানে ছাড়পত্র দেখাইতে হয়। কেহ চুঙ্গিকর ফাঁকি দিতেছে কি না, তাহার জন্য এখানে সকলেব জিনিসপত্র খুঁজিয়া দেখা হয়। শুনিয়াছিলাম যে, শুধু পেশোয়াব এবং ডাকার মধ্যেই তিন জায়াগায় এইরূপ তিনবার ছাড়পত্র পরীক্ষা করা হয়। এই জন্যই এই পথটি এড়াইয়া আমরা অন্য পথ ধরিয়াছিলাম। সেই পথের দুর্গম রাস্তা পার হইয়া আসিতে তিন দিন সময় বেশী লাগে।

আমরা যেখানে আসিয়া পৌঁছিলাম, সেখানে রাস্তার কাছেই একটা জায়গা আছে। সেই জায়গাটাকে লোকেরা 'ঠাণ্ডী' বলে। এখানে অনেক বড় বড় গাছের ঝাড় আছে। একটা কুয়াও আছে। বাসের অপেক্ষায় আমি গাছের তলায় শুইয়া পড়িলাম। রহমৎ খাঁ দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলের দিকে কোন বাস দেখিলেই সে থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কোন বাসই তার কথা গ্রাহ্য করিল না। অবসাদে আমার তন্দ্রা পাইল। ঝিমাইতে ঝিমাইতে অনেক রাত হইয়া পড়িল। হয়ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, এমন সময় হঠাৎ রহমৎ খাঁ আমাকে জাগাইল। দেখিলাম আমার কাছে একটি লরী দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে কোনক্রমে এই লরীতে উঠিতে হইবে। কি করিয়া যে উঠিব, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

অনেক বাক্সে ও মালপত্রে লরীটা একেবার ভর্তি। বসিবার কোন জায়গাই নাই। লরীর চালক চিৎকার করিয়া বলিল—বাক্সের উপর উঠিয়া বস না কেন? কি আর করিব, উঠিয়া বাক্সের উপরই কোন-রকমে বসিলাম।

শীতের রাত, চারিদিকে অবিশ্রান্ত বরফ পড়িতেছে। চলিয়াছি একটা উন্মুক্ত মাঠের উপর দিয়া। এই দারুণ শীতের মধ্যে আত্মরক্ষা করার মত গরম কাপড় আমার কোথায়?

চক্ষু খুলিয়া রাখা পর্যন্ত কষ্টদায়ক। লরীর উপর উঁচু জায়গায় বসিয়া রহিয়াছি, রাস্তার দুই ধারে গাছ ও ডালের ধাক্কা লাগিয়া কখন পড়িয়া যাই সেই ভয়ে সন্ত্রস্ত। ডালের ধাক্কা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ক্রমাগত মাথা নোয়াইয়া নোয়াইয়া সমস্ত পথ চলিয়াছি। কী দুর্ভোগের রাত! রহমৎ খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আর কি কোন ভাল গাড়ি পাওয়া গেল না?

রহমৎ খাঁ বলিল—খুব কম পনরোটা লরীকে থামিবার জন্য হাতছানি দিয়াছি। এক ব্যাটাও থামে নাই। কেবল এই লরীটি দয়া করিয়া থামিয়াছে। যদি এটার উপর না উঠিতাম, তাহা হইলে রাত্রিতে আর একটা লরীও পাইতাম না। ঐ ঠাণ্ডাতেই বোধহয় রাস্তায় বরফে জমিয়া যাইতাম।

এই রকমভাবে সমস্তটা রাত বসেই লরীতে কাটাইতে হইল। পথে কয়েকবার চা খাইতে হইল। গরম থাকিবার জন্যই ইহা করিতে হইল।

পরদিন আমরা বাটঘাটে পৌঁছিলাম। এখানে ছাড়পত্র দেখা হয় এবং ঘুষও লওয়া হয়। আমরা কি উদ্দেশ্যে চলিতেছি তাহা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইল।

রহমৎ খাঁ আমার দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ইনি আমার বড় ভাই, বোবা-কালা। আমি ইহাকে সাখি সাহেবের দরগায় লইয়া যাইতেছি। স্বাধীন পার্বত্য অঞ্চলে আমাদের বাস

সে লালপুরার খানের দেওয়া পরিচয়পত্রটি দেখাইল।

উহা দেখিয়া প্রশ্নকর্তা একেবারে চুপ হইয়া গেলেন।

চা খাইয়া আবার লরীতে উঠিলাম। বিকাল চারিটা-পাঁচটার মধ্যে কাবুলে পৌঁছিলাম। পেশোয়ার হইতেই আফগানী টাকা ও নোট লইয়া আসিয়াছিলাম। লরীওয়ালার ভাড়া চুকাইয়া দিলাম। তারপর যাহা ঘটিয়াছে তাহা কালই আমার মুখে শুনিয়াছেন।

ইহা বলিয়া সুভাষবাবু তাঁহার কথা শেষ করিলেন।

ঠিক এই সময় আমার ছোট মেয়ে খাবার লইয়া আসিল।

আমরা রেডিও শুনিতে শুনিতে খাইতে লাগিলাম।

রেডিও শোনা শেষ হইলে আমি বলিলাম—রহমৎ খাঁ আমাকে বলিয়াছেন যে, আপনি এখানকার ইতালীয়দের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছেন। তবে কি আপনি আর মস্কো যাইতে চাহেন না? যদি মস্কো যাওয়ার ইচ্ছাই থাকে, তবে ইতালীয়দিগের শরণ লইলেন কেন?

সুভাষবাবু—মস্কো যাওয়ার ইচ্ছা আমি ছাড়ি নাই। বাধ্য হইয়াই ইতালীয়দিগের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছি। আমার বন্ধুরা আমাদের কাবুল আসা পর্যন্তই সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়াছিল। কিন্তু কাবুলে আমাদের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। কাবুলের কিছুই আমি জানি না, রহমৎ খাঁও তথৈবচ। সে পুস্তু জানে বটে, কিন্তু কাবুলে তাহা কোন কাজেই লাগে না। যাঁহারা তাহাকে আমার সহিত পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, এখানে রাশিয়ানদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনে আমাদের কোন অসুবিধা হইবে না। দেখা যাইতেছে যে, এখানকার দূতাবাসে যে কেহ সহজে প্রবেশ করিতে পারে না, একথাও তাঁহাদের জানা ছিল না। এ দূতাবাসের দুয়ার সব সময় বন্ধ থাকে, আফগান পুলিশ রাত-দিন দাঁড়াইয়া পাহারা দেয়। আমার বন্ধুদের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, আমার নাম এবং আমি যে এখানে আসিয়াছি

একথা রুশদূতের নিকট বলিবামাত্রই তিনি আমাকে মস্কো যাইবার জন্য একখানি বিমানের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

যেদিন আমরা কাবুলে আসিয়া পৌঁছি তাহার পরদিনই রুশ দূতাবাসের খোঁজে বাহির হই।

বলা বাহুল্য, রুশ দূতাবাস কোথায় তাহা আমরা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি নাই। আমরা শহরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইতালীয়ান, ইজিপ্সিয়ান, ইরানীয়ান এবং গ্রীক দূতাবাসগুলি দেখিতে পাইলাম এবং দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম যে, সর্বত্রই আফগান পুলিশ দ্বারদেশে কড়া পাহারা দিতেছে। ইউরোপের কোথাও কিন্তু এরূপ প্রথা দেখি নাই। অধিকন্তু, এখানকার প্রহরীরা যে কেহ দূতাবাসে প্রবেশ করিতে যায়, তাহারই পরিচয় জানিতে চাহে। ইউরোপে যে কোন দূতাবাসে সোজা ঢুকিয়া যাও, কেহ তোমাকে থামাইবে না।

রুশ দূতাবাস খুঁজিয়া পাইলাম না।

আর হাঁটিতেও পারিতেছিলাম না। একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। পেশোয়ারী চপ্পল পরিয়া বরফের উপর দিয়া হাঁটিতে বড়ই কষ্টবোধ হইতেছিল। সরাইতে ফিরিয়া আসিলাম। শরীর ও মন দুইই ক্লান্ত। তাই রাত্রিতে মড়ার মত ঘুমাইলাম।

অনেক বেলা হইয়া গেল ঘুম ভাঙিতে। প্রাতঃরাশ শেষ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম রুশ দূতাবাসের খোঁজে। যে অঞ্চলে অন্যান্য দূতাবাসগুলি রহিয়াছে সে অঞ্চলের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা ঘুরিয়া বেড়াইলাম কিন্তু সোভিয়েট দূতাবাসের খোঁজ পাইলাম না। তাহার পর শহরের অন্যান্য অঞ্চলে খুঁজিতে আরম্ভ করিলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ দেখিলাম, একটা বাড়ির উপর লাল ঝাণ্ডা (Red Flag) উড়িতেছে। নিশ্চিত বুঝিলাম যে, উহাই রুশ দূতাবাস।

বাড়িটির দুয়ার বন্ধ। যথারীতি আফগান পুলিশ দুয়ারে কড়া পাহারা দিতেছে।

বাড়িটির কিছু দূরে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম এখন কি করা যায়। পরিচয় না দিয়া দূতাবাসে প্রবেশ করা অসম্ভব। তার উপর আমরা যে রকম পোশাক পরিয়াছিলাম, তাহাতে আমাদিগকে যে দূতাবাসে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না, তাহা আমরা স্পষ্ট ধরিয়া লইয়াছিলাম।

বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, নিজেকে এবং যাঁহারা আমার পলায়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে মনে মনে গালি দিতে লাগিলাম। এমনভাবে এই অব্যবস্থার মধ্যে আমাকে এখানে পাঠানো আমার বন্ধুদের পক্ষে অতি অন্যায় কাজ হইয়াছিল। নানারকম বিপদ এড়াইয়া এতদূরে আসিয়া কি সবই বিফল হইবে? অন্ততঃ এমন একজন লোক আমার সঙ্গে দেওয়া উচিত ছিল, যাহার সহিত আগে হইতেই রুশ দূতাবাসের লোকদের জানাশোনা ছিল অথবা কি করিয়া রুশ দূতাবাসের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা যায়, তাহার হদিস জানা ছিল।

ক্ষুণ্ণমনে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে আবার সরাইতে ফিরিয়া আসিলাম। মনের দুশ্চিন্তায় ক্ষুধা পর্যন্ত পাইল না।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়ে থাকিয়া অতঃপর কি করা যায় সে-কথার আলোচনা করিলাম। অবশেষে একটা ফন্দি বাহির করিলাম। পরদিন আমরা রুশ দূতাবাসের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিব, যদি কখনও রুশ দূতের গাড়ি বাহিরে আসে তবে আমরা উহা কোনো রকমে থামাইয়া তাঁহার সহিত কথা বলিবার চেষ্টা করিব। এ ছাড়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের আর অন্য কোনও উপায় ছিল না।

তার পরদিন আবার বাহির হইলাম সোভিয়েট দূতাবাসের দিকে। কয়েকখানি গাড়ি ভিতরে ঢুকিল ও কয়েকখানি গাড়ি বাহির হইয়া গেল। কিন্তু কোনও গাড়ির মধ্যে কোনো রুশ আরোহী ছিল কি না, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। তখন বিকাল সাড়ে চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। আবার হতাশ হইয়া উঠিয়া আসিবার উপক্রম করিলাম।

অকস্মাৎ দূতাবাসের দুয়ার খুলিয়া গেল। ছোট্ট একটি লালঝাণ্ডা উড়াইয়া একটি গাড়ি বাহির হইয়া আসিল। গাড়ির আরোহীকে দেখিয়া মনে হইল তিনি নিশ্চয় রাশিয়ার দূত হইবেন। কেননা, গত তিন দিনে জানিতে পারিয়াছি যে, একমাত্র রাষ্ট্রদূতদের গাড়িতেই যার যার নিজ দেশের পতাকা উড়ানো থাকে।

গাড়িখানি যখন আমাদের পাশ দিয়া যাইতেছিল, তখন রহমৎ খাঁ হাতছানি দিল, গাড়িখানি থামিয়া গেল। ভাঙা ভাঙা পারসীতে রহমৎ খাঁ গাড়ির পিছনের আসনে উপবিষ্ট আরোহীর কাছে আমার সম্বন্ধে কি একটা কথা বলিল।

আমি গাড়ি হইতে একটু দূরে ছিলাম। আমি দেখিলাম রহমৎ খাঁ আমাকে দেখাইয়া কি বলিতেছে।

তারপর আরোহীর সঙ্গে কি কথাবার্তা হইল তাহা রহমৎ খাঁ আসিয়া আমাকে জানাইল।

রহমৎ খাঁ রুশ দূতকে বলিয়াছিল যে, সুভাষচন্দ্র বসুকে কাবুলে লইয়া আসিয়াছি। তিনি মস্কোতে যাইতে চাহেন। ও বিষয়ে রুশ দূত তাঁহাকে কোনো প্রকার সাহায্য করিতে পারেন কি না।

রুশ দূত জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোথায়?

রহমৎ আঙ্গুল দিয়া আমাকে দেখাইয়া দেয়।

রুশ দূত বলেন, ইনিই যে সুভাষচন্দ্র বসু, তাহা আমি নিঃসন্দেহে কি করিয়া জানিব? তাঁহার পরিচয়ের কোনো প্রমাণ না পাইলে আমি কি করিয়া সাহায্য করি?

তিনি রহমৎ খাঁর উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রহমৎ খাঁ কোনো উত্তর দিতে পারিল না।

রহমৎ খাঁর কথা শুনিয়া আমি বড়ই মুষড়িয়া গেলাম। মস্ত বড় একটা সুযোগ হাতছাড়া হইয়া গেল। ভাষার অসুবিধার দরুনই রহমৎ খাঁ সঙ্গে সঙ্গে রুশ দূতের প্রশ্নের জবাব দিতে পারিল না। এখানেই ছিল আমাদের আয়োজনের ত্রুটি।

নিরুপায় হইয়া সরাইয়ে ফিরিয়া আসিলাম।

রহমৎ খাঁ বলিল, পেশোয়ারে খবর পাঠানো যাক।* আমাদের বন্ধুরা হয়ত আমাদের অবস্থার কথা শুনিয়া রাশিয়ানদের সহিত পরিচয় আছে, এমন কোনো লোককে পাঠাইবেন। কিন্তু পেশোয়ারে আমাদের খবর লইয়া যাইতে পারে এমন বিশ্বাসযোগ্য লোক কোথায় পাওয়া যাইবে ?

আমি বলিলাম—যদি তাঁহার খবর পানও তাহা হইলেই বা কি করিতে পারিবেন ? যদি তাঁহারা কোনো ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আগে হইতেই নিশ্চয় ব্যবস্থা করিতেন। আমাদিগকে এই অচল অবস্থায় ফেলিতেন না।

যাহা হউক, একজন লরী ড্রাইভারের মারফৎ আমরা পেশোয়ারে একজন সহকর্মীর নিকট খবর পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম।

পরদিন রহমৎ খাঁ একখানি পত্র লইয়া লরী ড্রাইভারের কাছে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া সে খবর দিল যে, একজন বিশ্বস্ত লরী ড্রাইভারের মারফৎ পত্রটি পেশোয়ারে পাঠাইয়া দিয়া আসিয়াছি। ঐ যে সি আই. ডি কনেষ্টবলটার কথা পূর্বে বলিয়াছি, সেদিনও রহমৎ খাঁ আমার কাছে তাহার কথা বলিয়াছিল। জীবন দুর্বিষহ হইয়া আসিতেছিল, তাহার উপর আবার এই উপদ্রব।...

লেখকের 'সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান কাহিনী' গ্রন্থের অংশবিশেষ।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র আমাদের অনেকেরই কাছে আত্মীয়-স্বজনের মতো, তিনি আমাদের চিত্তের আপনতায় চিরপ্রতিষ্ঠ। দেশনায়করূপে তাঁর যে মহীয়ান্ মূর্তি সর্বভারতীয় মানসে প্রকাশ হয়েছে, তার ভূমিকা প্রধানতঃ বহির্দেশীয় এবং যুগসঙ্কটের বিদ্যুৎ অন্ধকারে দূর হতে ধ্যানদৃষ্টিগোচর। স্বদেশেও তিনি তাঁর নেতৃত্বশক্তি দ্বারা প্রতিভাত হন, সেই শক্তিই জয়বাহিনী সেনা সংগঠনের বহু সাম্প্রদায়িক একত্বে এবং দৃঢ়তায় শেষ উজ্জ্বলতমরূপে দেখা দিল। এই আশ্চর্য কাহিনী সকলের হৃদয়-মন অধিকার করে আছে। কিন্তু বাঙালীর ছেলে সুভাষচন্দ্র তাঁর শিক্ষার সৌকুমার্যে সামাজিকতায় একটি ঘনিষ্ঠ পরিচয় বহন করে আমাদের ঘরে ঘরে অনির্বাণ প্রীতি-প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন। তাঁর সেই পরিচয় আজ স্মরণ করি।

কটকে এবং কলকাতায় সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবনগত অধ্যায় আমরা পারিবারিক সংসর্গসূত্রে জানতাম। কৈশোরের প্রারম্ভেই তাঁর মধ্যে তাপসিক ভাব পরিস্ফুট হয়, নিভৃত বৈরাগ্যের ভাব তিনি তাঁর অনুভূতি-প্রবণ হৃদয়ে ধারণ করতেন। কটকে তাঁদের বাড়িতে বহু রাত্রি পর্যন্ত একাকী ছাদে জেগে থাকা এবং নিবিষ্ট অথচ প্রসন্ন ভাব নিয়ে একাকী বাইরে বেড়াবার অভ্যাস তাঁর ছিল। শিশুকাল হতে অধ্যয়নশীল ছিলেন বলে তাঁর আরো একটি একাকিত্বের অন্তর্লোক তৈরি হয়েছিল, যেখানে তিনি জ্ঞানের তন্ময় সাধনায় প্রবৃত্ত হতেন। বাড়িতে অজস্র প্রীতি উৎসাহের ধারায়, বন্ধুজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা-তর্কে তিনি যোগ দিতেন, কিন্তু নিজের এবং পারিবারিক অথবা সখ্যতার মণ্ডলী অতিক্রম করে তাঁর হৃদয়াবেগ জনসাধারণিক জীবনের দিকে সর্বদা উত্থ হয়ে থাকত। যেখানে সর্বজনের সুখদুঃখ-

সুখজনিত জীবিকার সংগ্রাম চলেছে তারই সঙ্গে এক হবার জন্যে তিনি ব্যাকুল হতেন। সেইখানেই তাঁর স্বাদেশিকতার ভিত্তি, ভৌগোলিক উপাসনায় নয়, অথবা ইতিহাসের তথাকথিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় নয়; মানবিক ভারতবর্ষ তাঁর কাছে খুব সত্য ছিল। ইতিহাসের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণের প্রধান কারণ এই যে তার মধ্য দিয়ে তিনি ভারতবর্ষের এবং অন্যান্য দেশীয় সমাজ ও রাষ্ট্রিক জীবনের যথাযথ রূপ দেখতে পেতেন, বর্তমানের ধারণা তাঁর কাছে স্পষ্টতম হয়ে উঠত। ভারতবর্ষের প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির সঙ্গে তাঁর যোগ রক্ষার কারণও ছিল সমগ্র ভারতীয় স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের চেষ্টা, বিশুদ্ধ শিল্পজ্ঞানের জন্য নয়। বিশেষভাবে গীতিকবিতা এবং গানের দিকে তাঁর গভীর প্রবণতার বিষয় অনেকেই জানেন—বৈষ্ণব-কাব্য এবং রামপ্রসাদী হতে রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা ও গান তাঁকে মুগ্ধ করত। বলা যেতে পারে শিল্পের মধ্যে গানেই তাঁর ছিল সবচেয়ে নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ, বাংলা গানে তিনি বাঙালী হৃদয়ের অব্যবহিত স্পর্শ পেতেন।)

(বাংলার লোকসাহিত্য একই কারণে সুভাষচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, চৈতন্যভাবিত বাংলা দেশের গ্রাম্য গাথা আখ্যান তিনি অন্তরে গ্রহণ করে জনজীবিকার গভীরতম সন্ধান পেতেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনা যে দিক সমাজচিত্রবহুল এবং বিবেকানন্দের বাণীতে যেখানে আধ্যাত্মদৃষ্টির সঙ্গে লৌকিক সেবায় যোগ বিশেষভাবে, তাতেই সুভাষচন্দ্র আকৃষ্ট হতেন।)

আমার মনে আছে, সুভাষচন্দ্র যখন শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের কাছে আসতেন, তখন রাষ্ট্রিক আলোচনাকে অতিক্রম করে বাংলার গ্রাম্যজনের সুখ-দুঃখের প্রশ্ন এবং ভারতীয় সমাজের চির-দৈনিক সমস্যাগুলিই বড়ো হয়ে উঠত। কঠোর বীর্যশীল নেতার অন্তরস্থিত কোমল স্বভাবের পরিচয় রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন, ত্যাগে কর্মে অচল বিধৃত তাঁর সেই হৃদয়বৃত্তিকে কবি কত বড়ো শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিয়ে

গেছেন। দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ গদ্য প্রশস্তি লিখে তাঁকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আহ্বান করার আয়োজন করেছিলেন, সেই রচনাটিতে স্নেহের শঙ্খ বেজে উঠেছে, বহুদিন পর্যন্ত তা বাঙালীর হৃদয়ে ধ্বনিত হবে। বাঙালীর তারুণ্যমণ্ডিত তার নূতন নেতাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনের মঙ্গলমাল্য পরিয়ে গেলেন তখনো সুভাষচন্দ্রের শিখগৌরব প্রকাশিত হয়নি।

সুভাষচন্দ্রের মহা ভারতীয় মূর্তি আজ আমাদের আর্দ্র দৃষ্টির সম্মুখে বিরাজমান, কিন্তু তাঁর সহজ প্রকাশের পূর্বতন অনুসঙ্গ আমাদের নানাভাবে মনে রাখা দরকার। যেখানে ভাইয়ের দাক্ষিণ্য, মায়ের ভগিনীদের সিঁদুর শঙ্খ মঙ্গলপ্রদীপের অনুপ্রেরণায় এবং অগণ্য সহকর্মীর কল্যাণ-বাণীতে তিনি দেশের প্রত্যেক পরিবারের একান্ত নিজের মানুষ, সেখানেও তিনি অমরাবতীর অধিকারী।

য়ুরোপে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ১৯৩৫-৩৬ সালে প্রায়ই আমার দেখা হয়েছে। তখন কার্লসবাদ ও প্রাগ্ শহরে স্বাস্থ্যের জন্য থাকতেন, প্রয়োজনমতো মধ্য-য়ুরোপের নানা কেন্দ্রে যাতায়াত করতেন। কত অবিস্মরণীয় তাঁর তখনকার এককী বীর্যমূর্তি। বিদেশে গিয়ে তাঁর প্রীতি আচরণেরও পূর্ণতর পরিচয় পেলাম। কার্লসবাদ শহরে যে হোটেলটিতে উঠেছিলাম, তার বাগান যখন গোলাপে পরিপূর্ণ, অপরাহ্নের স্বচ্ছ নীলাভ হাওয়ায় ফুলের ঐশ্বর্য দেখছি, এমন সময় খবর পেলাম Herr Burgomaster অর্থাৎ মেয়র, সুভাষচন্দ্র দেখা করতে চান। তাঁকে অনেকেই কলকাতার পূর্ববর্তী মেয়র এই পরিচয়েই অভিহিত করত যদিও মুক্তিবিপ্লবী ভারত নেতারূপেই তাঁর নাম য়ুরোপে সর্বত্র ছড়িয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় কেউ তাঁর শহরে এসে উপস্থিত জানলে তিনি তৎক্ষণাৎ খোঁজ না নিয়ে পারতেন না, শুধু অনুসন্ধান নয়, প্রবাসী বাঙালীর সব দায়িত্ব গ্রহণ না করে তিনি স্বস্তি পেতেন না।

হেসে বলেছিলাম, আপনি তো এখনো চেকোস্লোভাকিয়ার

প্রেসিডেন্ট নন, এই দেশে এলেই কি আপনার রাজ্যে আসা হয়, আতিথ্যের জবাবদিহি আপনারই ?

কিন্তু উপায় নেই, যত রকম সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া এবং শত রকমে গৃহস্বামিত্বের ভার নেওয়াই ছিল তাঁর স্বভাব। সামান্ত অতিথির জন্ম তিনি কী করলেন, তা বলতে গেলে সুভাষচন্দ্রের হৃদয়বান মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়া হয়।

পরদিন সকালে নগরীর পথে পথে তাঁর সঙ্গে চললাম, সুন্দর গাছ-ঘেরা পথ, হাওয়ায় আলোয় উজ্জ্বল মদিরা মেশানো। হাতে তাঁর একটি লম্বা কাচের গেলাস, নানা উৎস-ধারার যন্ত্রমুখ থেকে মিনেরাল ধাতব জল ভ'রে নেবেন, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেশের এবং য়ুরোপপ্রবাসী ভারতীয়ের বিষয়ে জানতে চান। মধ্যে ঈষৎ ইঙ্গিত করে বললেন, পথের জলপায়ীর দলে বিচিত্র য়ুরোপের ধনী-ধননী আছেন, কায়িক আয়তন কমানোই তাঁদের বিশেষ উদ্দেশ্য। দোকানে রহস্য চিত্রের মধ্যে প্রকটভাবে ঝোলানো লঘু-গুরুর নানাবিধ নকশা যেন জলপানের পূর্বের এবং পরের অবস্থা। তিনি যে কোনো দলেই নন, কেবল পেটের বেদনাটা যাচ্ছে না, এই বলেই নীরব হলেন। নিজের সম্বন্ধে আর একটিও কথা নয়।

শহর দেখানোর দায়িত্ব কোনোমতেই তাঁর নয় তা কিছুতেই বলে বোঝানো গেল না, অগত্যা চড়লাম তাঁর সঙ্গে ফ্যুনিকুলার অর্থাৎ পর্বতারোহী লিফ্‌ট যন্ত্রের বাক্সে· সেখানে উঁচুতে গিয়ে কাটা আকাশ, আশ্চর্য নীচুতে শ্যাম-শ্যামল দৃশ্য ; নদী, সৌধ, শৈল মেলানো চতুর্দিকে কারিগরি।

কফির ছোট টেবিল খাড়াই নীল আকাশের কার্নিসের কাছে পাতা, সেখানে বসা গেল, সুন্দর দেশ দেখিয়ে তাঁর তৃপ্তি।

বললেন, বাংলা দেশ কত সুন্দর কিন্তু এমন কবে হবে, মানুষের হাতের সঙ্গে এই রকম প্রকৃতির মিল। এর জন্য সাধনা চাই, কিন্তু সর্বোপরি চাই স্বাধীনতা। তা না হলে কিছুই হবে না।

এই বলে চেয়ে রইলেন—মনে হ'ল দশ-বারো হাজার মাইল আকাশদেশের পারে পরাধীন বাংলা দেশ তাঁর ব্যথিত হৃদয়ের অতি কাছে রয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যায় মৃদু শীতের চন্দ্রাতপতলে একটি বাগানে অবস্থিত রেস্তরাঁয় খেতে নিয়ে গেলেন, বললেন, এখানে বাজনাটাও ভালো।

সেদিন ধীরে ধীরে ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামের কথা কিন্তু বলেছিলেন। দেশোদ্ধারের দুই উপায়, কোনোটাই বাদ দেওয়া চলবে না। জন-শক্তির জাগরণ, এবং বহিঃশক্তির যোগে ভারতবাসীর ইংরেজের বিরুদ্ধে বাইরে থেকে অভিযান। গান্ধীজী জাগিয়েছেন জনশক্তিকে কিন্তু সংগঠনের কাজে কংগ্রেস সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেনি, আরো ভয়ানক একতা গড়তে হবে। সেই কাজেই তিনি নেমেছিলেন দেশে থাকবার সময়ে। কিন্তু চলে আসতে হ'ল। এখন বাইরে থেকে যা করবার সেই দ্বিতীয় পন্থায় তিনি রত। উপায় খুঁজছেন।

এই বলে চুপ করলেন।

পরে তাঁর কথায় বুঝলাম গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন তিনি মানেন কিন্তু চরমভাবে নয়, এখনকার অবস্থায় তা চলুক।

হেসে বলেছিলেন, দেখুন, অনেকে আমাকে টেররিষ্ট মনে করে কিন্তু সত্যি বলছি আমি মানুষ মারিনি। অন্যকে মারতেও বলিনি। তবে দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রশত্রু কেউ মরলে যে রোদন করেছি, তাও নয়।

কথা প্রসঙ্গে টেগার্টের নাম উল্লেখ করে বললেন, আমাকে বধ করবার চেষ্টা কেবলমাত্র একবার দু'বার হয়নি। মনুমেণ্টের কাছে ঘোড়সওয়ার সিধে আমার দিকেই চালিয়ে আমাকে মারবার চেষ্টা হ'ল—মস্ত জনারণ্য—ঠিক কারো বেশী লাগল না। গায়ে চোট লেগেছিল। কিন্তু এসব কেন? দেশকে বাঁচাতে চাই, সেই জন্য মৃত্যুদণ্ড? ওদের দেশে হলে কি ওরা স্বাধীনতা চাইত না? দেখুন, বৃটিশ সাম্রাজ্য চূর্ণ হবে, কিন্তু এমনিতে নয়।

প্রশ্ন করলাম, বাইরের আনুকূল্য শেষ পর্যন্ত কথা এবং ছাপানো-কথার চেয়ে বেশি দূর যাবে—কি না।

তখনও তিনি বিশ্বাস করতেন বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদীদের মর্মগত ঈর্ষা ও স্বার্থবিরোধই তাদের পক্ষে মৃত্যুশেল হবে; সুতরাং সাম্রাজ্য-বাদীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো দেশকে ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামে সহায়তা করানো চাই। যথার্থ আদর্শবাদী বড়ো সভ্যতা হয়তো বেশি কিছু করবে না। ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দিলেন, এমন কি, আধুনিক চেকোশ্লোভাকিয়া থেকেই; রাশিয়ায় পর্যন্ত মরণজীবন দ্বন্দ্বকালে এই রীতি অক্টোবর রেভল্যুশনের আগে পরে মানা হয়নি। একথা জোরের সঙ্গেই বললেন।

জওহরলালজীর সঙ্গে যখন সেই বৎসর সুভাষচন্দ্রের এ বিষয়ে কথা হ'ত, অমিল ঘটত শুধু ঐ এক জায়গায়। মুসোলিনী হিটলার এঁরা ভারতবর্ষের জন্য কিছুই করবে না, জওহরলালের ছিল সেই নির্ধারণ।

ডি ভ্যালেরার কাছে সুভাষচন্দ্র পরে যখন দেখা করেন, আইরিশ স্বাধীনতার প্রতীক তিনি সুভাষচন্দ্রকে এই ধরনের কথা বলেই নিরাশ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, শুনেছিলাম তিনি সুভাষচন্দ্রকে বলেন, ইংরেজের সঙ্গে তোমরা সম্মুখ সমরে নেমো না। তাতে পারবে না। আমরা ওদের কাকা ভাইপোর একই সম্বন্ধ, একই রকম দেখতে, ভাষায় ধর্মে প্রায় এক, তবু আমাদের যদৃচ্ছা বধ করতে তারা দ্বিধা করেনি। সেই ইতিহাস অক্ষরে অক্ষরে দেখা আছে। তোমরা জন-আন্দোলনের চাপে আদায়ের পরিমাপ ক্রমে দ্বিগুণ অগণ্য গুণ করো - সেই তোমাদের পথ। দেশের বাইরে থেকে নীতি-কথা ছাড়া অন্য সাহায্য পাবে না। কিন্তু যদিও মুসোলিনীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের অনেকবার দীর্ঘ আলোচনা হয়, কোনোদিনই তিনি ভাবেননি যে, ডিক্টেটরগুলি স্বার্থান্বেষী ব্যতীত আর কিছু। যদি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে তাঁদের যোগাযোগ এবং সাহচর্য পৃথিবীজোড়া আসন্ন অন্ধ

বিপ্লবের সময় ভারতবর্ষ লাভ করে, নেতাজীর ছিল এই চেষ্টা। হিটলার সে-বারে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখাই করলেন না। হের তখন ছিলেন জার্মান ভাগ্যহন্তা প্রাইভেট সেক্রেটারির মতো. তিনি দুঃখিত হয়ে সুভাষচন্দ্রকে জানালেন যে, তাঁদের ফ্যুরার ভারতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে উদাসীন, অতএব, ইত্যাদি।

...মহাযুদ্ধের সময় সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে হিটলারের মন বদলেছিল, কিন্তু হিটলারের সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের মনোভাব কোনোদিনই যে বদলায়নি, তাতে সন্দেহ নাই।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেশেও এই প্রসঙ্গে আজ পর্যন্ত অনেকে সুভাষচন্দ্রকে ভুল বুঝেছেন। কাঁটার কাছে অন্য কাঁটা তোলবার জন্য যাওয়ার অর্থ এ নয় যে, কণ্টককে ভুলে ভেবেছি পুষ্প। কাউকে ব্যবহার করা এবং তাঁকে যথার্থ গ্রহণ করা একই নীতি নয়। জাপানীদের ব্যবহারেও সম্পূর্ণ জানা গেল 'ব্যবহার' করবার নীতি কত ভয়ঙ্কর, সমূহ বিপদসঙ্কুল, কিন্তু প্রখরবুদ্ধি সুভাষচন্দ্র এ বিষয়ে চক্ষুষ্মান্ হয়েই ভুল করেছিলেন। একদিনের জন্যও তিনি হিটলার-মুসোলিনীর সমর্থক ছিলেন না। প্রথম হতেই নাৎসি-প্রবর্তিত ইহুদি-বিদ্বেষ, পরজাতিঘৃণাকে তিনি ঘৃণাই করেন।

সুভাষচন্দ্রের মত ছিল এই যে, সামরিক ব্যাপারে কোন পক্ষ কিভাবে সুবিধামতো শত্রু-মিত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করবে সেটা রাষ্ট্রিক কৌশলের অন্তর্গত। উদ্দেশ্য যেমন হোক ষ্টালিন-রিবেনট্রপ, ষ্টালিন-মাটসুকয়ার মৈত্রীস্থাপন পর্বগুলি সম্ভব হয়েছিল। জিৎ হ'ল বলেই জিৎ, যদি সোভিয়েটরা হারত তাহলে ঐ সকল 'ব্যবহারগত' নীতিকে লোকে নৈতিক শতকণ্ঠে দোষী করত। সুতরাং আর যারাই হোক আধুনিক কোনো দেশ, কোনো রাষ্ট্রদলেরই বলার অধিকার নেই যে, সুভাষচন্দ্রের নীতি নীতিবিরুদ্ধ।

জওহরলালজী সে-বারে মধ্য-য়ুরোপে ভ্রমণকালে যখন খুবই সশ্রদ্ধ অথচ দৃঢ়চিত্তে সুভাষচন্দ্রের কাছে অন্য নীতির সমর্থন করতেন, তখন

তিনি মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত নূতন রাষ্ট্রিক সংগ্রামপন্থার আনুগত্যেই তর্ক করেছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর পথ আজ অভাবিত উপায়ে ভারতবর্ষে জয়ী হ'ল। কিন্তু য়ুরোপায়.অথবা ভারতীয় যাঁরা সুভাষচন্দ্রের নীতির সমালোচনা করতে সাহসী হন, তাঁরা কি সকলে এই অভাবিত নূতন উপায়ের আন্তরিক সমর্থক ছিলেন?

সে-বার কার্লসবাদ থেকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার পূর্ণ সম্মতি নিয়ে অক্সফোর্ডে ফিরেছিলাম।

লতামণ্ডিত তাঁর বসবাস ঘরটিতে গিয়ে বিদায় নিলাম।

তিনি 'The Indlan Struggle' বইখানি লেখায় নিযুক্ত ছিলেন।

দরজার কাজে এসে শেষ কথা বললেন-কবে আমাদের ভারতবর্ষে দেখা হবে!

দেশে ফিরে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে লাহোরে ডাক্তার ধর্মবীরের বাড়িতে এবং পরে কলকাতায় বহুবার দেখা হয়েছিল।

আরেক পর্ব, তার কথা এখানে নয়।

কিন্তু একটি প্রসঙ্গ বলি।

একদিন টেলিফোনে আমাকে ডাক দিলেন; চৌরঙ্গী Y. M. C. A-তে তখন ঘর নিয়ে কিছুদিন ছিলেন।

তাঁর কণ্ঠস্বর উদ্বিগ্ন।

বললেন, আমি সুভাষচন্দ্র বসু, একবার আমার এখানে আসুন।

রবীন্দ্রনাথ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের কাছে যে টেলিগ্রাম পাঠান, সেই সম্বন্ধে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। পরদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে জোড়াসাঁকোয় দেখা করেন এবং সুভাষচন্দ্রের মনোভাব কবি সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য ছিল এই যে, যুদ্ধশান্তির জন্য আমেরিকা দুই পক্ষকে নিবৃত্ত হতে বলুক। রাশিয়া এবং আমেরিকা একত্র হয়ে যুদ্ধ রোধ করতে পারে—এই হ'ত রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত বাণী। রবীন্দ্রনাথের আহ্বান আমেরিকাকে যুদ্ধে নামানোর

আহ্বান হতে পারে না। টেলিগ্রামে তিনি তাঁর আপন বক্তব্য ঠিক প্রকাশ করেননি, কবির কাছে সেদিন শুনলাম।

টেলিগ্রাম পাঠিয়ে পরে রবীন্দ্রনাথ মনঃকষ্ট পান; ঐ সময়ে আমাকেও একটি দীর্ঘ পত্র লিখে জানান যে, তিনি যুদ্ধের কোনো পক্ষকেই সমর্থন করেন না। ঐতিহাসিক তথ্য রক্ষার জন্য এই ব্যাপারে উল্লেখ করলাম। কিছুদিন পরেই সুভাষচন্দ্রের উপর যবনিকা পতন হ'ল—তিনি নিরুদ্দেশ।

একথা এখন বলা যেতে পারে যে, সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান সম্বন্ধে ব্যাকুল হয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বস্তসূত্রে খবর নেন, এবং কয়েক দিনের মধ্যেই জানতে পারেন যে, নির্বিঘ্নে সুভাষচন্দ্র অন্য দেশে গিয়ে পৌঁছেছেন। আর কিছু রবীন্দ্রনাথ জানতে চাননি।

তার পর সুভাষচন্দ্রের পালা শেষ হয়ে নেতাজীর অভ্যুদয়। দিগন্তে অবিশ্বাস্য উজ্জ্বল তারা উঠল। দূর থেকেই আমরা দেখলাম। যাঁরা কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁদের কাহিনী ফুরোয় না, শুনেও তৃপ্তির শেষ নেই।

নেতাজীর জয়।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ঘরোয়া চেহারাও কোনোদিন ম্লান হবে না, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা তিনি চিরন্তন বাঙালী-ঘরের ছেলে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র পৃথিবী ছেড়ে গেছেন, আজ আর সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু গভীরতর অর্থে তিনি সমস্ত ভারতবর্ষের ভূমিতে বেঁচে রইলেন। 'জয় হিন্দ' মন্ত্র তিনিই উচ্চারণ করেছিলেন, সেই মন্ত্রের ধ্বনি আজ ভারতের কোটি-কণ্ঠের স্বাধীনতা-অভিনন্দনে জেগে উঠল। এই মন্ত্রের সঙ্গে প্রাণশক্তি অনন্তকালের মতো ভারতবর্ষে রয়ে গেল।

বিগত ৪০ বৎসর যাবৎ স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে অনুশীলন-সমিতির সভ্যগণ স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছেন। যখনই স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক আসিয়াছে, অনুশীলন-সমিতির সভ্যগণ তখনই সংগ্রামের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করার পর হইতে অনুশীলন-সমিতির সভ্যগণ আন্তরিকভাবে কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছে। ১৯৩০ সনে জাতীয় কংগ্রেস যখন আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিল তখন অনুশীলন-সমিতির সভ্যগণ ঐ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। তাঁহারা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া শুধু কারাবরণ করেন নাই, লাঠি চার্জের সম্মুখীনও হইয়াছেন। বিপ্লবীরা দেখাইয়াছেন, তাঁহারা যেমন প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে জানেন, পিস্তল ছুঁড়িতে পারেন—আবার খাঁটি সত্যাগ্রহীর ন্যায় নীরবে লাঠির আঘাতও সহ্য করিতে পারেন।

সুভাষবাবু যখন জাতীয় কংগ্রেসকে আপস মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রামশীল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন অনুশীলন-সমিতির সভ্যগণ সুভাষবাবুর পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। অনুশীলনের সভ্যগণ সুভাষবাবুর নির্দেশে আইন অমান্য করিয়া সভা করিলেন, কারাবরণ করিলেন—সুভাষবাবুর স্বপ্ন সফল করার চেষ্টা করিলেন।

১৯৪২ সনের ৯ই আগষ্ট, মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস-নেতাদের গ্রেপ্তারের ফলে ভারতব্যাপী যে গণ-বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় তাহাই আগষ্ট-বিপ্লব। সিপাহী-বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষে এত বড় বিপ্লব আর দেখা যায় নাই। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর শোষিত, নির্যাতীত জনসমূহের একদিকে যেমন দুঃখ-কষ্টের মাত্রা বৃদ্ধি পাইল আবার অপরদিকে তাহাদের মনে আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীনতা লাভের

তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিল। পৃথিবীর সর্বত্রই পরাধীন জাতিগুলি স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল—ভারতবাসীও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। আইনসভার অন্তঃসারশূন্যতা দেশবাসী উপলব্ধি করিয়াছে, ভারতবাসী শিশু নয়—চুষিকাঠি লইয়া খেলা করিবার অবস্থা পার হইয়াছে, মেকি আইন-সভার মায়া তাহারা কাটাইয়াছে, তাহারা চায় প্রকৃত ক্ষমতা হাতে পাইতে। ভারতবাসী জানে প্রকৃত ক্ষমতা একমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়াই আসিবে —বৃটিশ-মন্ত্রিসভার অনুগ্রহের দানে নয়। আগষ্ট-বিপ্লব ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল।

অনুশীলনের সভ্যগণ, যাঁহার বাংলা দেশে বা বাংলার বাহিরে ছিলেন, সকলেই সক্রিয়ভাবে এই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়াছেন। কেহ কেহ পুলিশের গুলিতে হত হইয়াছেন, কেহ কেহ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়াছেন, বহু লোক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, লাঠির আঘাত সহ্য করিয়াছেন এবং নানাভাবে নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। জেলের ভিতরে যাঁহারা পূর্ব হইতেই আবদ্ধ ছিলেন তাঁহারাও এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে আন্তরিকতার সহিত সমর্থন করিয়াছেন।

স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন চলিতেছিল তখন কম্যুনিষ্ট পার্টি দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়া দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা ভারতের স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দেয় নাই; রুশিয়ার বন্ধু বলিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই তখন কার্যতঃ সমর্থ করিয়াছে। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ ভারতবাসীর জনযুদ্ধ ছিল না।

আগষ্ট-বিপ্লবের সময় ভারতবাসী অসীম বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও নির্যাতন ভোগের পরিচয় দিয়াছে—তাহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করিয়াছে। একটা নিরস্ত্র জাতি কিভাবে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত প্রবল প্রতাপশালী গভর্নমেণ্টকে পঙ্গু করিতে পারে তাহা তাহারা দেখাইয়াছে। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সুসভ্য বৃটিশ-জাতির

স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। একটা সুসভ্য জাতি অপর জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দমন করার জন্য কতটা নিষ্ঠুর হইতে পারে—দমন-নীতির মধ্য দিয়া তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভারতের ঘটনাবলী প্রকাশ হইলে জার্মান বর্বরতা, জাপানী বর্বরতা তাহার নিকট ম্লান হইয়া পড়িবে—আদিম যুগের অসভ্য বর্বর জাতিও এই সব ঘটনাবলী শুনিলে লজ্জায় মাথা হেঁট করিবে।

আমাদের বিজয়ী মিত্রপক্ষ পরাজিত অক্ষশক্তির নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধ-অপরাধী বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছেন, মিত্রপক্ষের বন্দী সৈন্যদিগের উপর যে-সব অক্ষশক্তির কর্মচারী অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, তাহাদিগকেও গ্রেপ্তার করিয়াছেন। শত্রুপক্ষের পরাজিত বন্দীদের অপরাধ প্রমাণ করিতে বিজয়ী মিত্রপক্ষের কোনো বেগ পাইতে হয় না, তাহাদের অপরাধ প্রমাণ হইয়াছে এবং তাহারা চরম দণ্ড ভোগ করিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে কি জেলে বা জেলের বাহিরে, নিরস্ত্র দেশপ্রেমিকদের উপর এবং দেশের জনসাধারণের উপর সুসভ্য বৃটিশ-গভর্নমেণ্টের কর্মচারিগণ যে সব অত্যাচার করিয়াছে তাহার বিচার কে করিবে? পরাধীন জাতির বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। বিচারালয়ে যাইয়াও তাহাদের কোনো লাভ নাই, কারণ তাহাদেরই নিকট বিচার প্রার্থনা করিতে হইবে, যাহারা অবিচার করিয়াছে। পরাধীন জাতি সুবিচার পায় না— তাই ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া থাকে; শত শত বৎসরের অত্যাচার-অবিচারের সুবিচার তাহারাই করিবে যখন তাহাদের সুদিন আসিবে।

আমরা যখন জেলে আবদ্ধ ছিলাম তখন ঢাকা শহরে এবং মহেশ্বরদী পরগনায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। বর্তমান সভ্যতার যুগে পৃথিবীর কেহ সাম্প্রদায়িকতার কল্পনা করিতে পারে না,—একমাত্র পরাধীন ভারতেই ইহা সম্ভবপর। পরাধীনতার নিত্য সহচর হিসাবে ইহা থাকিবে এবং যখনই স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠিবে তখনই সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন দেখা দিবে ও সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হইবে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ গরীব লোক। তাহারাই মৃত্যুবরণ করে, তাহারাই উপবাসী থাকে, তাহাদেরই জেল হয়, মামলা চালাইতে তাহাদের বাড়ি-ঘর বিক্রয় করিতে হয়। যাহারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায় তাহারা বড়লোক, তাহাদের গায়ে আঁচড়ও লাগে না। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে তাহারা লাভবানই হয়। আর লাভবান হয় গুণ্ডা-শ্রেণীর লোক। যাহারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায় তাহারা এবং গুণ্ডা-শ্রেণীর লোক কেহই মরে না; সাধারণ লোক, যে কিছুই জানে না, কোনো অপরাধ করে নাই—এই শ্রেণীর লোকই প্রাণ হারায়।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানো যেমন কঠিন নয়, আবার দাঙ্গা বন্ধ করাও কঠিন নয়। দাঙ্গা যে বন্ধ হয় না, ক্রমাগত দিনের পর দিন চলিতে থাকে, তাহার কারণ গভর্নমেণ্টের দুর্বলতা। গভর্নমেণ্ট দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য যদি কৃত-নিশ্চয় হন এবং একটু শক্ত হন তবে দাঙ্গা বেশীদিন চলিতে পারে না। কিন্তু দাঙ্গাকারীদের মনে যদি এই ভরসা থাকে যে, গভর্নমেণ্ট তাহাদের পিছনে আছেন, তাহাদের কোনো ক্ষতি হইবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহারা দেখিতে পায়, দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য গভর্নমেণ্টের আন্তরিকতা নাই, তাহা হইলে দাঙ্গা বন্ধ হইবে না, বহুদিন চলিবে।

দাঙ্গা কাহারা বাধায় গভর্নমেণ্টের তাহা জানা উচিত। গভর্নমেণ্ট যদি তাহাদের উপর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেন, যদি তাহাদের সুদীর্ঘ কারাদণ্ড ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ হইবে। জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মনে যদি এই ভয় থাকে যে, দাঙ্গা বন্ধ করিতে না পারিলে তাঁহাদের অকর্মণ্যতার জন্য তাঁহাদের চাকুরি থাকিবে না, তাহা হইলেও দাঙ্গা বন্ধ হইবে। দেশের জনসাধারণের মনে যদি এই বিশ্বাস জন্মে, দাঙ্গার ফলে তাহারা শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, লাভবান হইতেছে অপর এক শ্রেণীর লোক; তাহারা কতিপয় বড়লোকের জন্য প্রাণ দিতেছে—প্রতারিত

হইতেছে, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ হইবে। দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব নাই, স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট লোক সময় সময় দেশের জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ধর্মের নামে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া কার্য হাঁসিল করে। দেশের জনসাধারণ আর অধিক দিন প্রতারিত হইবে না।

এই কয় বৎসর বাংলার উপর দিয়া দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বস্ত্রসঙ্কট প্রভৃতি গিয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে অচিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে, লক্ষ লক্ষ নর-নারী বস্ত্রের অভাবে উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ রহিয়াছে—আমরা সে দৃশ্য দেখি নাই, দেশবাসীর এই দুর্দিনে তাহাদের সেবা করার সুযোগ পাই নাই। হয়তো আমরা বিশেষ কিছু করিতে পারিতাম না, অন্ততঃ আমাদের মনে একটা সান্ত্বনা থাকিত যে, আমরা দেশবাসীর বিপদের সময় তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়া, তাহাদেরই মত একজন ভুক্তভোগী হইয়া তাহাদের সেবা করার চেষ্টা করিয়াছি। বাংলার এই দুর্ভিক্ষ, বস্ত্রসঙ্কট মনুষ্যকৃত, ইহার জন্য দায়ী প্রতিক্রিয়াশীল। মন্ত্রিমণ্ডলী, লোভী ব্যবসায়িগণ এবং সর্বোপরি দায়ী বিদেশী গভর্নমেণ্ট। পরাধীনতা যতদিন থাকিবে নিত্য নূতন সমস্যা দেখা দিবে, দেশবাসীদের আরও অনেক দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে—পরাধীনতার সহচর হিসাবে তাহারা চিরকাল লাগিয়াই থাকিবে।

যুদ্ধরত দেশগুলিতে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বস্ত্রসঙ্কটের কথা শুনা যায় নাই। জার্মানী বা জাপানের অধিকৃত দেশে খাদ্যাভাব বা বস্ত্রাভাবের কথা শুনা যায় নাই বরং অধিকৃত দেশে প্রচুর খাদ্যশস্য ছিল এরূপ প্রমাণই পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে শস্য নষ্ট হইয়াছিল এরূপ কোন কথা উঠে নাই। ভারতবর্ষে খাদ্যের অভাব ছিল না, যথেষ্ট খাদ্যশস্য গুদামে মজুত থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ লোক না খাইতে পাইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ মণ চাউল, ডাইল, আটা গুদামে পচিয়া নষ্ট হইয়াছে—কিন্তু মানুষকে খাইতে দিয়া তাহাদের প্রাণ বাঁচান হয় নাই। কোন স্বাধীন দেশে এরূপ অবস্থার

সৃষ্টি হইলে দেশে বিপ্লব হইত, গভর্নমেণ্টের পরিবর্তন ঘটিত। কোন স্বাধীন দেশে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইলে দেশের জনসাধারণ গভর্নমেণ্টকে দায়ী করিত, অপরাধীর শাস্তি হইত, তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইত। কিন্তু পরাধীন দেশে কেহ দায়ী হয় না। পরাধীন দেশে বিদেশী সরকারের আওতায় পুষ্ট মন্ত্রিমণ্ডলী ও ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় যাহারা বিদেশী সরকারের স্তম্ভস্বরূপ, তাহাদের কোন অপরাধই অপরাধের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, কারণ তাহাদের সবচেয়ে বড় গুণ তাহারা বিদেশী সরকারের অনুরক্ত। একমাত্র স্বাধীন ভারতই সকল সমস্যা সমাধান করিবে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিভাবলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং তিনি ইহাও জানিতেন যে, ভারতবর্ষে একটা বৈপ্লবিক আবহাওয়া চলিতেছে। তাই তিনি দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণের জন্য ভারতের বিপ্লবী-শক্তিগুলিকে সংহত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম কল্পনায় ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতবর্ষেই হইবে। অনুশীলন-সমিতি সুভাষবাবুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সুভাষবাবু ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি কিন্তু কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাঁহার সহিত একমত না হওয়ায় তিনি দেশে বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি যখন দেখিলেন, সুযোগ চলিয়া যাইতেছে, তখন তিনি রাসবিহারী বসুর পথ অবলম্বন করিলেন—তিনি এই আশায় ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন যে, যদি ভারতের বাহিরে যাইয়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য কিছু করিতে পারেন। ইহার সুযোগ মিলিল। বৃটিশ-সৈন্যদের পুনঃ পুনঃ পরাজয়ের ফলে বৃটিশ-গভর্নমেণ্টের শক্তির উপর ভারতীয় সৈন্যদের বিশ্বাস নষ্ট হইল। আবার বৈষম্যমূলক ব্যবহারের ফলে বৃটিশ-গভর্নমেণ্ট ভারতীয় সৈন্যদের সহানুভূতি হারাইল। সর্বোপরি ভারতীয় সৈন্যগণ পৃথিবীর স্বাধীন জাতির সংস্পর্শে আসিয়া মর্মে মর্মে ইহাই অনুভব করিতে লাগিল, "আমরা পরাধীন, পৃথিবীর

স্বাধীন জাতিসমূহের ঘৃণার পাত্র।" তাহারা দেখিল পৃথিবীর সব জাতিই নিজ নিজ দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছে, প্রাণ বিসর্জন দিতেছে, আর কেবল তাহারাই গোলামীর জন্য প্রাণ দিতেছে। তাহারা দেখিতে পাইল, স্বাধীন জাতিসমূহের মধ্যে প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা নাই। এক দেশ, এক জাতির বন্ধনে তাহারা আবদ্ধ, তখন তাহাদের মধ্যেও দেশাত্মবোধ জাগিল, তাহারাও স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে বদ্ধপরিকর হইল।

বিপ্লবী-নেতা রাসবিহারী বসু ১৯১৫ সনের ভারতের বিপ্লবপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরে জাপানে যাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন নাই। স্বাধীনতার জন্য জমি প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং জাপানে 'স্বাধীন ভারত সঙ্ঘ' (Indian Independence League) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাসবিহারী বসু তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও সংগঠন-শক্তির প্রভাবে জার্মানবাসীদের ও জাপানী সেনাপতিমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জাপানে রাজপরিবার, সেনাপতিমণ্ডলী ও জনসাধারণের উপর তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তিনি তাঁহার সেই প্রভাব ভারতের স্বাধীনতার কাজে লাগাইয়াছিলেন। অনুশীলন-সমিতির আর একজন সভ্য স্বামী সত্যানন্দ (তাঁহার পূর্ব নাম ছিল প্রফুল্ল সেন, বাড়ি ফরিদপুর জেলায়) গ্রামে থাকিয়া রাসবিহারীবাবুর সহযোগে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করিতেছিলেন। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আভাস তাঁহারা পাইয়াছিলেন। বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল, তিনি সেই পূর্ব অভিজ্ঞতা লইয়া কার্যে অবতীর্ণ হন। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু ও স্বামী সত্যানন্দ পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। স্বামী সত্যানন্দ ১৯৩৬ সনে শ্যাম দেশের রাজধানী ব্যাঙ্ককে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্যাম দেশে তাঁহার বিশেষ প্রভাব ছিল। ১৯৩৭ সনে টোকিওতে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে এক সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে স্বামী সত্যানন্দ, গিয়ানী প্রিতম সিং

প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইতে বদ্ধপরিকর হন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃটিশের পরাজয় ঘটিলে, বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে স্বামী সত্যানন্দ পুরী, গিয়ানী প্রিতম সিং প্রভৃতি দেশপ্রেমিক বিপ্লবী নেতাগণ বন্দী ভারতীয় সৈন্যগণকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের চেষ্টাতেই প্রথম 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গড়িয়া উঠে। ১৯৪২ সনের ২৮শে হইতে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত রাসবিহারী বসুর নির্দেশে টোকিওতে 'স্বাধীন-ভারত-সঙ্ঘের' এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য ব্যাঙ্কক হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি বিমানযোগে রওয়ানা হয়। তাঁহাদের মধ্যে স্বামী সত্যানন্দ পুরী, গিয়ানী প্রিতম সিং ও ক্যাপ্টেন মহম্মদ আক্রাম খাঁ ছিলেন। পথিমধ্যে বিমান-দুর্ঘটনায় তাঁহাদের মৃত্যু হয়।

প্রথম 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' ভাঙিয়া গেলে, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসুর চেষ্টায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে জার্মানী হইতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আনানো হয়। বিপ্লবী-নেতা রাসবিহারী বসু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উপর সমস্ত দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া নেতাজীর সহকর্মী হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু 'আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্টের' সর্বোচ্চ পরামর্শদাতা ছিলেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পদার্পণ করিলে অনুশীলন-সমিতির সভ্যগণ যাঁহারা মালয়, ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য স্থানে পূর্ব হইতেই ছিলেন তাঁহারা সকলেই নেতাজীর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিযুক্ত হন। নেতাজী অনুশীলন-সমিতির কয়েকজন সভ্যকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছিলেন—ডাঃ পবিত্র রায় তাঁহাদের অন্যতম। পবিত্রবাবু কয়েকজন বন্ধুসহ ধৃত হন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অবস্থায় আলিপুর জেলে অনুশীলন-সমিতির নেতৃস্থানীয় শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলির নিকট নিম্নলিখিত চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন :

"দাদা, নানা জনের নানা অভিমত থাকা সত্ত্বেও সর্বাগ্রে ও সর্বপ্রথম আমরা জানাইতে চাই যে, জাপানে বা জাপানীদের তরফ থেকে কোন কাজ করার ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা নিয়ে আমরা এদেশে আসিনি, বা ওদেশে যে বিরাট সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছে তার পেছনেও এমন-ধারা কোন চিন্তা বা পরিকল্পনা নেই। ওদেশে এবং এদেশে আমাদের যা কিছু কর্মপ্রচেষ্টা এবং যাঁরা এদেশে আমাদের এই কর্মপ্রচেষ্টার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন বা সাহায্য করছেন, আমাদের বা তাঁদের কারুর এমনধারা কোন ধারণার পিছনে ছুটে চলার কোন ইঙ্গিত নেই। এটা নিশ্চয় জানবেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে ও তারই আশু সমাধানের জন্য আমাদের যা কিছু কর্মধারা।

"১৯৪২ সনে পূর্ব-এশিয়ায় ইংরেজের পরাজয়ের ফলে তখনকার সমগ্র রাজনৈতিক আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলে যায়। যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিকল্পনা এতদিন ধরে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু টোকিওতে বাস করে আসছিলেন হঠাৎ অতর্কিতে তার সুযোগ এলো। রাসবিহারী বসু এবং আপনাদের পরিচিত যে দু'জন বাঙালী বহুকাল যাবৎ ব্যাঙ্ককে অজ্ঞাতবাস করছিলেন এবং যাঁরা সমগ্র শ্যাম দেশের উপর ভারতীয় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং অবাঙালী পূর্ব ভারতীয় যাঁরা সমগ্র পূর্ব-এশিয়ার নানা জায়গায় রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন প্রভাবশালী লোক ছিলেন এবং পূর্ব বিপ্লব-যুগের (১৯৪৫) যাঁরা ছিলেন, সেই সব নেতাগণ যাঁদের মাতৃভূমির জন্য ত্যাগ ও দুঃখবরণ আজ বেশির ভাগ ভারতবাসীর কাছে অজ্ঞাত—এমন সব নির্যাতিত নেতৃস্থানীয় প্রভাবশালী ভারতীয়গণ, আন্তর্জাতিক যে সুযোগ আপনি তাঁদের সামনে এসে পৌঁছে গেল তাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলেন। তারই ফলে সৃষ্টি হ'ল ১৯৪২-এর গোড়ার দিকে 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ'। এই লীগের আদর্শ—উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতা, বিশেষ করে এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ—জাপান এই সুযোগের স্রষ্টা। তাই লীগের সঙ্গে তার খানিকটা সম্বন্ধ রাখতে

হ'ল। সে সম্বন্ধে শুধু রাজনৈতিক। ইংরেজ জাপানের শত্রু এবং তাই ইংরেজ ভারতবাসী হিসাবে আমাদের শত্রু। জাপান চায় তার যুদ্ধ-জয়ের নীতির দিক থেকে ইংরেজের ধ্বংস। আমরাও চাই ভারতের দিক থেকে তার ধ্বংস। জাপান ও লীগের এই চিন্তাধারার ঐক্যই তাদের রাজনৈতিক সম্পর্কের যোগসূত্র। এছাড়া জাপানের ভারতবর্ষের উপরে রাজনৈতিক কোন মতলব ছিল না বা নেই। এটা সত্য ও অতি সত্য। বিশেষ করে যেখানে আমরা দেখেছি যে জাপান, বর্মা ও ফিলিপাইন অধিকারের পর সেই সব দেশের স্বাধীনতা দান করেছে ও সেই সব দেশের লোকের হাতে শাসনভার ছেড়ে দিয়েছে। এছাড়া ছোট ছোট বিজিত দেশের প্রতি ইংরেজের পূর্বেকার ব্যবহার (রাজনৈতিক) ও জাপানের বর্তমান ব্যবস্থা তুলনা করে আমরা জাপানের পররাষ্ট্র-নীতির যে পরিচয় পেলাম তাতে ভাবীকালে ভারতের প্রতি তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না। আমি ব্যক্তিগতভাবে মালয়ের বর্মার নিজস্ব শাসন-প্রণালী দেখেছি এবং যুদ্ধ থাকাকালীন ওখানকার শাসন-ব্যবস্থা যেরূপ আত্মনিয়ন্ত্রণ লাভ করলো তাতে আমরা জাপানীদের অবিশ্বাস করবার যুক্তিযুক্ত কোন কারণ খুঁজে পাইনি। এরপর আমাদের অস্থায়ী সরকার (Provisional Government) স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যখন আন্দামান ও নিকোবর সম্পূর্ণ পরিচালনার ভার আমাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হ'ল তখন জাপানীদের কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করবার আমাদের আর কিছু থাকলো না। আমি ব্যক্তিগতভাবে আন্দামানে ও নিকোবরে গিয়েছি ও সেখানে দেখে এসেছি এবং আমাদের তখনকার জন্য যদিও সেখানে জাপানী সেনা রয়েছে তবুও সেখানে 'প্রভিসনাল গভর্নমেন্টের' কর্নেল লোকনাথন স্থানীয় শাসন পরিচালনা করছেন।

''যদিও ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি 'লীগ' তার কাজ শুরু করেছিলো তবুও প্রশ্ন হতে পারে যে, ১৯৪২ সালের আগষ্ট-আন্দোলনের সময়

ঐ দেশ হতে 'লীগের' কোন সাড়া পাওয়া গেল না কেন? তার কারণ তখন 'লীগের' নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ৫০।৬০ হাজারের বেশী হয়নি এবং তারা সবাই ভূতপূর্ব বন্দী ইংরেজ-সৈন্যদলের পরিত্যক্ত অংশ মাত্র। জাপানীরা তখন 'লীগের' আন্দোলনকে ভারতের মধ্যে একটা নৈতিক সমর্থন লাভ করবার জন্য বিশেষ জোর দেয় এবং 'লীগ'ও তখন ভারতে সেই আবহাওয়া সৃষ্টি করবার জন্য তার কাজ চালাবার সিদ্ধান্ত করে।

"এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সুভাষবাবুকে ওদেশ হতে আনবার জন্য সমস্ত ভারতবাসীর পক্ষ থেকে একটা বিশেষ দাবি করা হয় এবং তারই ফলে ১৯৪৩ সনের মাঝামাঝি সময়ে সুভাষবাবু এসে 'লীগের' নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। সুভাষবাবু আসার ফলে সমস্ত আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন হয়। Indian National Army গঠিত হয়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে দিনের পর দিন দ্রুত হাজার হাজার ভারতীয় I.N.A. বাহিনীতে যোগদান করতে আরম্ভ করেন। আপনারা জানেন বোধহয় একটি নারী-বাহিনীও গঠিত হয়। পূর্ব-এশিয়ার ভারতবাসীমাত্রই নিজেদেরকে উজাড় করে এরই পেছনে এসে দাঁড়ান। তাঁদের অর্থে-সামর্থ্যে এবং পিতা-পুত্র জননী-ভগিনী তাঁদের প্রাণ উৎসর্গ করবার জন্য এতটুকু দ্বিধা করেননি। এই আই. এন. এ.-র সমগ্র খরচ, তার সাজ-পোশাক, তার খোরাক, বেতন সমস্ত ভারতবাসীর অর্থে পুষ্ট। কিভাবে মানুষ সুভাষবাবুর হাতে সর্বস্ব দেবার জন্য উন্মত্ত হয়েছিল আমার একদিনকার অভিজ্ঞতা জানাচ্ছি। পেনাং-এর এক সভায় অল্প সময়ের মধ্যে জনসাধারণ থেকে প্রায় তিন লক্ষ ডলার অর্থাৎ ২০ লক্ষ টাকা আই. এন. এ.-র জন্য আমি সুভাষবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে উঠতে দেখেছি। এমনি করে দিনের পর দিন পূর্ব-এশিয়ায় বিভিন্ন দেশ থেকে আই. এন. এ.-র জন্য কোটি কোটি টাকা স্বেচ্ছায় এসেছে।

১৯৪৩ সনের নভেম্বর মাসে 'প্রভিন্সনাল গভর্নমেন্ট' গঠিত হয়

এবং সাথে সাথে ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় অনুপ্রাণিত হয়ে দলে দলে লোক এসে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করতে শুরু করে—আমরা অবশ্য এর বহু পূর্বেই যোগদান করেছিলাম। আমরা অর্থাৎ 'অনুশীলন-সমিতির' যে ক'জন ওখানে ছিলাম সকলে সমবেত হয়ে নিজেদের মধ্যে বিশেষ বিবেচনা এবং পরামর্শ করে একমত হয়ে এর সাথে দলগতভাবে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত করে সকলেই. যোগদান করলাম। হয়ত আপনাদের কেউ না কেউ তাদের চিনতে পারবেন এমন কয়েক-জনের নাম জানালাম।

"স্বামী সত্যানন্দ পুরী বহুকাল ব্যাঙ্ককে ছিলেন। যদিও তিনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেন তবুও তাঁর সন্ন্যাসের মূলমন্ত্র ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। জন্মভূমির পূর্ণ-স্বাধীনতার জন্যে আত্মবিসর্জনে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। সমগ্র শ্যাম দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক গুরু বা নেতা। ব্যাঙ্ককের রাজদরবারেও তাঁর একটি বিশিষ্ট আসন ও প্রভাব ছিল। ১৯৪২ সালে রাসবিহারী বসু প্রথম স্বামীজীর ওখানে আসেন এবং সমগ্র এশিয়াকে কেন্দ্র করে 'ইণ্ডিয়া লীগ' গঠনের প্রথম পরিকল্পনা তাঁর (স্বামীজীর) ওখানে হয়। এজন্য ব্যাঙ্ককেই 'লীগের' হেড-কোয়ার্টার প্রথম স্থাপিত হয়।

"শ্রদ্ধেয় রাসবিহারী বসু যে দু'জনের একান্ত সাহায্যে 'লীগকে' সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের একজন এই স্বামী সত্যানন্দ পুরী ও অপরজন শ্রদ্ধেয় প্রিতম সিংজী। কিন্তু আজ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, স্বামীজী ও সিংজী কেহই আর ইহজগতে নাই। ১৯৪২ সালে আগষ্ট মাসে টোকিও সম্মেলনে যাবার পথে বিমান দুর্ঘটনায় আরো কয়েকজন স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয়ের সাথে তাঁরা মারা যান। এঁদের মৃত্যুতে 'লীগ' পরিকল্পনার যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল আজো তার পূরণ হ'ল না।

"বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর কথা লিখতে গেলে একটা বিরাট

ইতিহাস লিখতে হয়। তাও এখন সম্ভব নয়। আমার সাথে তাঁর তিন-চারদিন যে আলাপ হয়েছিলো, তার থেকে একটা কথাই শুধু স্পষ্ট করে বুঝেছিলাম যে, স্বাধীন ভারতে ফিরে আসবার একটা প্রবল আগ্রহ তাঁর মধ্যে সদাসর্বদাই ছিলো। তিনি ভারতের বহু রাজনৈতিক নেতাদের কথা আমাদের সঙ্গে আলাপে বলেছিলেন। বিশেষ করে বিপ্লব-যুগের কারো কথা তিনি ভুলেন নাই।...আমাদের মধ্যে যাঁদের তিনি দেখেছেন তাঁদের কারুর কথাই এতটুকু বিস্মৃত হন নাই; বরং আমাদের সাথে সে-সব পুরানো স্মৃতি আলোচনা করবার কালে বালকসুলভ আনন্দে মেতে উঠতেন। বয়স যথেষ্ট হয়েছিলো, কিন্তু উৎসাহ ছিল প্রচুর। নেতাজী সুভাষবাবু আসবার পর সমগ্র দায়িত্ব ও কর্মভার স্বেচ্ছায় ও সানন্দে নেতাজীর উপর তুলে দিয়ে রাসবিহারীবাবু অসুস্থ শরীরে জাপানে ফিরে যান। আমার সাথে সেই তাঁর শেষ দেখা। আমরা আসবার পূর্বে নেতাজী সুভাষবাবুর কাছ থেকে আদেশ ও উপদেশ নিয়ে এসেছিলাম। তাঁর সাথে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার সময় তিনি আপনার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, আমাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহায়তা আপনার কাছ থেকে আসবেই। আমাকে ঐ সময়ে পাঠাবার বিশেষ কারণ ছিলো যাতে আপনার সাথে এ সম্পর্কে পাকাপাকি আলাপ-আলোচনা করে আমরা কাজে অগ্রসর হতে পারি। আমি আসবার পূর্বে বাংলাদেশের সমগ্র আবহাওয়াকে রাজনৈতিকভাবে বিশ্লেষণ করে আপনার সাথে কথা বলার গুরুত্ব, প্রয়োজন আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আপনি আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে এ কাজে এগিয়ে আসবেন এবং ভারতের ভিতর থেকে আপনার সমগ্র সাহায্য পাওয়া যাবে এ বিশ্বাস আমি নেতাজীর মধ্যে দেখেছিলাম। ওখানকার সম্পূর্ণ পরিস্থিতি পরিষ্কার করে আপনাকে জানাবার হুকুম আমার উপর ছিল। দুঃখের কথা, বহু চেষ্টা করেও এসব কথা আপনাকে জানাবার কোন পথ

বা সুযোগ করতে পারিনি। দীর্ঘকাল বাংলার বাইরে থেকে এবং এসে পর্যন্ত গুপ্তভাবে অবস্থান করবার চেষ্টাতে আমরা পূর্বপরিচিত কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতেই পারিনি। মোটামুটি কিছুটা আপনাকে জানান গেল; আপনি বুঝতে পারেন, সব কথা এভাবে লেখা যায় না এবং এভাবে লিখিত আলোচনাও করা চলে না। তবু যতটা সম্ভব লিখে জানালাম। বিদায়—জয় হিন্দ।"

এখন একটা প্রশ্ন এই, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু বিদেশী গভর্নমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করিয়া অন্যায় কাজ করিয়াছিলেন কি?

আমরা যদি পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকাই, যদি আমরা পৃথিবীর পরাধীন জাতিসমূহের স্বাধীনতার ইতিহাস আলোচনা করি, তবে আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক পরাধীন জাতি বিদেশী গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। যদি তাহারা বিদেশী সাহায্য গ্রহণ না করিত, তবে তাহারা স্বাধীন হইতে পারিত না। বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ যদি অন্যায় হয়, তবে জর্জ ওয়াশিংটন, লেনিন, সান-ইয়াৎ-সেন, ডি-ভ্যালেরা, পিলসুডস্কী সকলেই অন্যায় করিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস সে-কথা বলে না, সেই সব দেশের অধিবাসিগণ সে-কথা বলিবে না—আমেরিকার অধিবাসিগণ স্বীকার করিবে না, জর্জ ওয়াশিংটন ভুল করিয়াছেন। জেনারেল দ্য-গল ও মার্শাল টিটো বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করিয়া অন্যায় করিয়াছিলেন কি? বৃটিশ গভর্নমেণ্টের প্রচার বিভাগ জেনারেল দ্য-গল ও মার্শাল টিটোকে কুইসলিং না বলিয়া তাহাদের দেশপ্রেমের প্রশংসা করিয়াছিল কেন?

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ড ও আমেরিকা, জার্মানী ও জাপানের অধীনস্থ জাতিসমূহকে পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার জন্য উৎসাহিত করে নাই কি? সেই সব পরাধীন জাতিকে সশস্ত্র বিপ্লব করার জন্য বৃটিশ ও আমেরিকান গভর্নমেণ্ট অস্ত্র-শস্ত্র ও অর্থ দ্বারা সাহায্য করে নাই কি? বৃটিশ

গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগ, জার্মান কবলিত রাষ্ট্রসমূহের অধিবাসীদের ধ্বংসাত্মক কার্য—সন্ত্রাসবাদমূলক কার্যকে দেশপ্রেমিকদের বীরত্বব্যঞ্জক কার্য বলিয়া উচ্চ কণ্ঠে প্রশংসা করে নাই কি? তাদের ধ্বংসাত্মক কার্য যদি বৃটিশ-গভর্ণমেণ্টের চোখে দেশপ্রেমিকের কার্য বলিয়া গণ্য হয় তবে আগষ্ট-বিপ্লবীদের ধ্বংসাত্মক কার্য দেশপ্রেমিকদের বীরত্বব্যঞ্জক কার্য বলিয়া গণ্য হইবে না কেন?—আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলিয়া গণ্য হইবে না কেন?

ইংলণ্ডের অধিবাসীরা তাহাদের স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়া অন্যায় করিয়াছিল কি?—ইংলণ্ডের অধিবাসীদের যদি তাহাদের স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিবার অধিকার থাকে, তবে ভারতবাসীর তাহাদের স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিবার অধিকার থাকিবে না কেন? বৃটিশ সৈনিকগণ তাহাদের স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যদি যুদ্ধ করিতে পারে, তবে ভারতীয় সৈনিকগণ তাহাদের স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে পারিবে না কেন? যে নীতি ইংলণ্ডের পক্ষে খাটিবে সেই নীতি ভারতবর্ষের পক্ষে খাটিবে না কেন? যে নীতি ইংলণ্ডের শত্রুপক্ষের দেশে প্রযোজ্য, সেই নীতি ইংলণ্ডের অধীনস্থ দেশে প্রযোজ্য হইবে না কেন?

এখন প্রশ্ন এই, বিদেশী গভর্ণমেণ্ট পরাধীন জাতির বিপ্লবীদের সাহায্য করে কেন? স্বাভাবিক অবস্থায় কোন রাষ্ট্র, সে রাষ্ট্র যতই উদার হউক না—কোন পরাধীন জাতিকে সাহায্য করে না। কারণ ঐরূপ সাহায্য করায় তাহার নিজের বিপদ আসিতে পারে—অপর রাষ্ট্রের সহিত সংঘর্ষ হইতে পারে। একটা পরাধীন জাতির মুক্তির জন্য কোন রাষ্ট্রই নিজের ঘাড়ে বিপদ ডাকিয়া আনিবে না। কিন্তু একটা রাষ্ট্রের সহিত যখন অপর রাষ্ট্রের যুদ্ধ বাধে, স্বেচ্ছায় প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহার শত্রুর অধীনস্থ দেশে বিপ্লব করিবার জন্য সেই সেই দেশের বিপ্লবী দলকে সাহায্য করে। প্রথম মহাযুদ্ধের

সময় ভারতের বিপ্লবী দলের সহিত জার্মান গভর্নমেণ্টের এই সন্ধি হইয়াছিল—"জার্মান গভর্নমেণ্ট ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিবে, ভারতবর্ষে বিপ্লব করিবার জন্য জার্মান গভর্নমেণ্ট অস্ত্র-শস্ত্র, অর্থ ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা সাহায্য করিবে।" এখন প্রশ্ন এই যে—এই সাহায্য করিবার পিছনে জার্মানীর কি স্বার্থ ছিল ? জার্মানী জানিত তাহার প্রধান শত্রু ইংলণ্ড এবং ইংলণ্ডের শক্তির মূল ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষে যদি বিপ্লব হয়, ভারতবর্ষ যদি ইংলণ্ডের হস্তচ্যুত হয়, তবে ইংলণ্ড দুর্বল হইবে এবং সহজেই জার্মানী ইংলণ্ডকে পরাজিত করিতে পারিবে। জার্মানীর সাহায্যে যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়, তবে ভারতবর্ষ জার্মানীর মিত্র রাষ্ট্র হইবে এবং পৃথিবীতে জার্মানীর কোন ভয় থাকিবে না। জার্মানীর ইহাই ছিল বড় স্বার্থ বা লাভ।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর ইতিহাস অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পথ—স্বাধীনতার পথ—সশস্ত্র বিপ্লবের পথ। এই পথেই পৃথিবীর পরাধীন জাতিসমূহ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাস এই পথেরই নির্দেশ দেয়। তাহাদের পথ যদি ভুল হয় তবে পৃথিবীর ইতিহাস ভুল।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য যখন এই সমস্ত বীরগণ মৃত্যুপণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন ভাগ্যের পরিহাসে আমি তাঁহাদের পাশে দাঁড়াইতে পারি নাই। ইংরেজের বন্দিশালায় জীবন কাটিবে ইহাই ছিল কপালে লেখা।

অবশেষে ২৩শে মে (১৯৪৬) দমদম সেনট্রাল জেল হইতে বেলা ১২টার সময় মুক্তি পাইলাম। ফিরিয়া দেখি দেশের চেহারা ইতিমধ্যে বদলাইয়া গিয়াছে, যেন এই কয়েক বৎসরেই স্বাধীনতার পথে অনেক পা আগাইয়া গিয়াছে।

সুভাষচন্দ্রকে অকস্মাৎ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয়েছিল এরূপ মনে করলে ভুল করা হবে। সমগ্র দেশের জনগণ সুভাষচন্দ্রকেই কংগ্রেস সভাপতিরূপে দেখতে চাইছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বীর সৈনিকের প্রতি দেশবাসীদের প্রীতি থাকা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ করে তাঁর সভাপতিপদে নির্বাচন সম্বন্ধে বাঙালীর মনে খুবই আগ্রহ থাকা ছিল স্বাভাবিক। কেননা ১৯২২ সালের গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পর আর কোন বাঙালী সভাপতির পদ পাননি। অথচ দেশবন্ধুর পরও বাংলা দেশে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের মত নেতা ছিলেন। যতীন্দ্র-মোহনের যখন সভাপতি হবার সম্ভাবনা দেখা দিল, তখন অকস্মাৎ তিনি দেহত্যাগ করলেন। তাই সুভাষচন্দ্রের সভাপতি হওয়া সম্বন্ধে বাঙালীদের মনে আগ্রহের অন্ত ছিল না। এ নিয়ে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন-নিবেদন যায়নি—এমনও নয়। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা দেশবাসীদের সে ইচ্ছা পূরণ করলেন। সে বৎসর কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট পদের জন্যে চারজন প্রার্থীর নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল: শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং খান আবদুল গফফার খাঁ। এঁদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র ও সীমান্ত গান্ধী ছাড়া অপর দু'জন নেতা একাধিকবার কংগ্রেস সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করেছেন। তাই তাঁরা নীরবে সরে দাঁড়ালেন। আর সীমান্ত গান্ধীকে বলা চলে ত্যাগের হিমালয়। কংগ্রেস সভাপতি পদ ভারতে শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্মান। একাধিকবার এই শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্মান তাঁকে দিতে চাওয়া হয়েছে কিন্তু নীরব কর্মী সীমান্ত গান্ধীকে কিছুতে টলানো যায়নি। মুখে মৃদু হাসি নিয়ে তিনি প্রতিবারই তা গ্রহণ করতে

অস্বীকৃত হয়েছেন। এবারও তাই ঘটল। তিনি নীরবে সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে সরে দাঁড়ালেন। গান্ধীজী কংগ্রেসে যোগদানের পর থেকে তাঁর পরামর্শ নিয়েই কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত করা হয়ে থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। তিনি সুভাষচন্দ্রের নির্বাচনই সমর্থন করলেন। ১৯৩৮ সালে গুজরাটের অন্তর্গত তাপ্তী নদীর তীরবর্তী হরিপুরে কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশন হ'ল। ১৩ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচিত সভাপতি এসে পৌঁছলেন। সে-বার কংগ্রেস-মণ্ডপের নামকরণ করা হয়েছিল পরলোকগত বিঠলভাই প্যাটেলের নামানুসারে বিঠল নগর। কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশনের প্রতীক হিসাবে সে-বার কংগ্রেস-মণ্ডপের ৫১টি দ্বার নির্মিত হয়েছিল, ৫১টি জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল এবং কংগ্রেস অধিবেশনে ৫১টি জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়েছিল। তাছাড়া নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে ৫১টি বলীবর্দবাহিত রথে করে সভাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মোট কথা, সে-বার যেরূপ বিরাট সমারোহে ও উৎসবের মধ্যে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়েছিল, সেরূপ খুবই কম দেখা যায়। কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ নর-নারী উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী কাজ করছেন। বিভিন্ন প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য অনেক মন্ত্রীও এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে বিদায়ী রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিগত বৎসরের কাজের একটি বিবরণ পেশ করে নতুন রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে আসন গ্রহণের অনুরোধ করলেন। তিনি বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে আসন গ্রহণ করলেন। কংগ্রেসের সম্মুখে সে-বার গুরুত্বপূর্ণ কাজও ছিল প্রচুর। একদিকে ইউরোপের ঘনায়মান যুদ্ধ পরিস্থিতি—অপরদিকে ভারতের অভ্যন্তরে কংগ্রেস-গভর্নমেণ্ট বিরোধ। কংগ্রেস প্রদেশে প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করলেও সে বিরোধের অবসান হয়নি। দু'টি প্রদেশে—যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারে—

রাজবন্দীদের মুক্তিপ্রসঙ্গ নিয়ে গভর্নরের সঙ্গে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলের মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ এবং শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ তাঁদের মন্ত্রিমণ্ডলের পদত্যাগপত্র পেশ করেছিলেন। কংগ্রেসের বামপন্থী দল চাইছিলেন যে, এ ব্যাপার নিয়ে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশের মন্ত্রিত্বই একযোগে ত্যাগ করে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি করুক।

১৯শে ফেব্রুয়ারি কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হ'ল। বিপুল কর্মোন্মাদনা সুবিশাল জনস্রোতের মধ্যে হরিপুর যেন সেদিন নতুন করে প্রাণ পেল। বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত দরবার গোপালদাস দেশাই একটি ছোট সুন্দর বক্তৃতায় রাষ্ট্রপতি এবং সমাগত অতিথিবৃন্দকে অভ্যর্থনা জানালেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেনঃ "আমরা এমন একজনের সভাপতিত্বের আশীর্বাদ পেয়েছি যাঁর স্বার্থত্যাগ, সেবা এবং লাঞ্ছনাভোগের ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন। আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি যে, আমাদের সভাপতির সুনিপুণ নির্দেশে আমরা যেন লক্ষ্যের দিকে আরও এগিয়ে যেতে পারি এবং আমাদের ইতিহাসে আরও গৌরবজনক অধ্যায় সংযোজনা করতে পারি।" এর পর রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র সভাপতিরূপে তাঁর চমৎকার লিখিত অভিভাষণটি পাঠ করলেন। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পটভূমিকায় ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ-সমন্বিত তাঁর অভিভাষণটি হয়েছিল অপূর্ব। স্বদেশ এবং স্বজাতির গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর মনে যে সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অভিভাষণের প্রতি ছত্রে তা ফুটে বেরিয়েছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তখন যুদ্ধের ছায়া এসে পড়েছে প্রায়। দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে সুভাষচন্দ্র প্রচুর দূরদর্শিতা এবং বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব গৃহীত হবার পর হরিপুরের কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হ'ল।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি রাষ্ট্রপতিরূপে কংগ্রেসের কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছিলেন ; একদিনের জন্যেও বিশ্রাম না নিয়ে তিনি কংগ্রেসের আদর্শ প্রচারের জন্যে ভারতের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ট্রেনে, মোটরে, এরোপ্লেনে করে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। কংগ্রেসের সম্মুখে তখন বড় প্রশ্ন ছিল ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের নতুন ভারত শাসনতন্ত্রে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জন। রাষ্ট্রপতিরূপে সুভাষচন্দ্র যে অসংখ্য বক্তৃতা এবং বিবৃতি দিয়েছিলেন তার প্রত্যেকটিতে তিনি যুক্তরাষ্ট্র গঠন প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। কংগ্রেস গ্রহণ করেনি বলে আজ পর্যন্ত বৃটিশদের প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয়নি। রাষ্ট্রপতিরূপে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের জন্যে সুভাষচন্দ্র লীগ-দলপতি মিঃ জিন্নার দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু জিন্না সাহেবের অযৌক্তিক দাবির ফলে যেমনভাবে একাধিকবার গান্ধীজী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আপস প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, তেমনইভাবে সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছিল। বিহারের অবিসম্বাদী জননেতা এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সুভাষচন্দ্র বিহারপ্রবাসী বাঙালীদের দীর্ঘস্থায়ী কয়েকটি সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করতে পেরেছিলেন। ১৯৩৯এর ২১শে জানুয়ারি দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার কয়েকদিন পূর্বে সুভাষচন্দ্র কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন পরিদর্শন করতে যান। শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে স্বয়ং কবিগুরুর নেতৃত্বে তরুণ বাঙালী রাষ্ট্রপতিকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করা হয়। কবিগুরুর সস্নেহ সাদর সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে সুভাষচন্দ্র বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন : "আমরা হয়ত আজ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছি ; কিন্তু আমাদের আদর্শ বড়। আমরা চাই সব দিক দিয়ে আমাদের অখণ্ড জাতি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হোক। এই যাত্রার পথে, এই সাধনার পথে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা একটা সোপান মাত্র।"

১৯৩৯ সাল সুভাষচন্দ্রের জীবনে একটা নাটকীয় বৎসর। কংগ্রেসের ইতিহাসেও এ বৎসরটি চিরস্মরণীয়। চরমপন্থী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে গান্ধীবাদের যে একটা আভ্যন্তরীণ বিরোধ আছে—এইবারই তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কংগ্রেস রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাবের পর হতে তিনি কংগ্রেসের প্রাণস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরই ইচ্ছাক্রমে প্রতিবৎসর রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে থাকেন। ফলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হওয়া একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রপতির পদের জন্যে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে একাধিক নেতার নাম প্রস্তাবিত হলেও, শেষপর্যন্ত একজনের অনুকূলে সকলেরই নাম প্রত্যাহার করে থাকেন। কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বরাবরই এ নীতির বিরোধী ছিলেন। রাষ্ট্রপতি ও তাঁর ওয়ার্কিং কমিটি গণতান্ত্রিক মতে নির্বাচিত হোক—এ ছিল তাঁর মনের ইচ্ছা। তিনি এই মর্মে কংগ্রেসে একবার একটি প্রস্তাব এনেছিলেন।

১৯৩৯-এর নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য তিনটি নাম উপস্থাপিত হয়েছিল—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু ও ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ছিল অন্ধ্রদেশের প্রাচীন কংগ্রেস নেতা ডাঃ সীতারামিয়াকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ও গান্ধীজীর মনোভাব জেনে মৌলানা আজাদ যথাসময়ে নিজের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে ডাঃ সীতারামিয়ার অনুকূলে একটি বিবৃতি দিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের পার্থীপদ থেকে নাম প্রত্যাহার করার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তিনি স্থির করলেন যে, দেশ ও জাতির জন্যে তিনি নির্বাচনে ডাঃ সীতারামিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। যে কোন কারণেই হোক, তাঁর মনে মনে ধারণা জন্মেছিল যে, গান্ধীপন্থী বা দক্ষিণপন্থীরা বৃটিশ গভর্নমেণ্টের যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চান বলেই তাঁরা একজন দক্ষিণপন্থীকে রাষ্ট্রপতির পদে বসাতে চান। এই যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার বিরোধিতা করার জন্যেই তিনি চরমপন্থীদের পক্ষ থেকে নির্বাচনে দাঁড়াবেন

বলে মনস্থির করলেন। মৌলানা আজাদের বিবৃতির পর তিনি একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে দেশবাসীদের জানালেন: "মিথ্যা আনুগত্য-বোধকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, কেননা সমস্যাটি ব্যক্তিগত নয়। অন্যান্য স্বাধীন দেশের ন্যায় ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুস্পষ্ট সমস্যা এবং কর্মতালিকার ভিত্তিতেই হওয়া উচিত। তবু যদি মৌলানা আমাদের মত প্রতিষ্ঠাবান নেতার আবেদনের ফলে বেশির ভাগ প্রতিনিধি আমার পুনর্নির্বাচনের বিরুদ্ধে ভোট দেন, আমি তাঁদের নির্দেশ শিরোধার্য করে একজন সাধারণ সৈনিকের মত আমার দেশ ও কংগ্রেসের সেবা করব।" ১৯৩৯-এর রাষ্ট্রপতিত্ব নিয়েই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দক্ষিণপন্থীদের বিরোধ বেধে গেল। তিনি তাঁদের আপসকামী আখ্যা দেওয়ায় তাঁরা যেন আরও বেশী চটে গেলেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্য প্রকাশ্যে ডাঃ পট্টভির অনুকূলে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন। এইবার উভয়পক্ষ থেকে শুরু হল বিবৃতির ও প্রতিবিবৃতির ঝড়। ২৯শে জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কথা। তার চারদিন পূর্বে সংবাদপত্রে প্রায় দশটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে মজা করলেন গান্ধীজী। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদ্বয়ের পক্ষ সমর্থন করেই কিছু বললেন না। কাজেই প্রতিনিধিরাও তাঁর মনোভাব টের পেলেন না। নির্বাচনের শেষে অবশ্য বোঝা গেছিল যে, তাঁর মৌন সমর্থন ছিল ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার উপর। একথা যদি তিনি আগে জানাতেন তবে নির্বাচনে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ডাঃ পট্টভি হয়ত হারতেন না। বিভিন্ন বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে দিয়ে ১৯৩৯-এর ২৯শে জানুয়ারী কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনপর্ব শেষ হল। ভোটগণনা হলে দেখা গেল যে, সুভাষচন্দ্র ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াকে ভোট-যুদ্ধে পরাস্ত করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সুভাষচন্দ্রের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ছিল ১৫৮০ এবং ডাঃ সীতারামিয়া পেয়েছিলেন ১৩৭৭ ভোট। নেতা হিসাবে সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হল।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হবার পর পুনর্নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে কলিকাতায় বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করা হল। নির্বাচনে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন বটে কিন্তু নির্বাচন উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে গান্ধীবাদী নেতাদের যেরূপ বিরোধিতা হয়েছিল, তাতে তাঁর মনে ধারণা জন্মেছিল যে, এ নিয়ে কংগ্রেসে বিরোধ বাধবার সম্ভাবনা। তাই তিনি খুব উল্লসিত হয়ে উঠতে পারেননি। যা প্রত্যাশা করা গিয়েছিল, তাই হল। সুভাষচন্দ্র যেমন এ নির্বাচনকে নীতির দিক থেকে গ্রহণ করেছিলেন, গান্ধীজীও তেমনি নীতির দিক থেকেই একে গ্রহণ করেছিলেন। ডাঃ সীতারামিয়ার পরাজয়কে গান্ধীজী নিজের অর্থাৎ তাঁর মতবাদের পরাজয় বলে গ্রহণ করলেন। বারদৌলী থেকে একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি ঘোষণা করলেন: "নির্বাচন দ্বন্দ্ব থেকে মৌলানা সাহেব তাঁর নাম প্রত্যাহার করার পর আমার চেষ্টাতেই ডাঃ পট্টভি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াননি—অতএব এ পরাজয় তাঁর চেয়ে আমারই অধিক।" গান্ধীজীর এই ক্ষোভোক্তিতে নির্বাচক কংগ্রেস প্রতিনিধিরা বুঝতে পারলেন যে, নির্বাচনের পূর্বে মুখ না খুললেও গান্ধীজীর পূর্ণ সমর্থন ছিল ডাঃ সীতারামিয়ার প্রতি। গান্ধীজীর এই বিবৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভারতের রাষ্ট্রগুরুর আশীর্বাণী থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মধ্যেও চাকা ঘুরে গেল। আলোচ্য বিবৃতিতে গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যখন দক্ষিণপন্থী বা গান্ধীপন্থী নেতাদের সম্বন্ধে এত অনাস্থাশীল, তখন তিনি যেন শুধু বামপন্থীদের নিয়ে একটি এক-মতাবলম্বী ওয়ার্কিং কমিটি গড়ে তোলেন। তাতে তাঁর কাজের সুবিধা হবে। গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রের বিজয়কে নিজের পরাজয় বলে গ্রহণ করায় দেখা গেল যে, ত্রিপুরী কংগ্রেসে ভোটাধিক্যে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। গান্ধীজীকে বাদ দিয়ে যে কংগ্রেস চলতে পারে না কিংবা কংগ্রেসের মধ্যে থেকে ব্যক্তি বিশেষ গান্ধীনীতিকে বর্জন করতে পারে না একথা ভালভাবে প্রমাণিত হল।

গান্ধীজীর বিবৃতি পড়েই সুভাষচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে, নির্বাচনের মুখে আপসকামী দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে তাঁর বিভিন্ন উক্তি এবং তৎপরে তাঁর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তাতে শীঘ্রই কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট ব্যবধান রচিত হতে পারে। এই দুর্দৈব যাতে না আসতে পারে তার জন্যে অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি হন্তদন্ত হয়ে ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ছুটে গেলেন ওয়ার্ধায়—গান্ধী-সন্দর্শনে। গান্ধীজীর সঙ্গে বহু আলাপ-আলোচনার পর তাঁদের দুজনের মধ্যে কি স্থির হয়েছিল তা জানা যায়নি। কিন্তু ওয়ার্ধা থেকে ফিরে সুভাষচন্দ্র যখন ১০৩ ডিগ্রী জ্বরে শয্যাশায়ী তখন হঠাৎ জানা গেল যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বারোজন দক্ষিণপন্থী সদস্য একযোগে পদত্যাগ করেছেন। এটা ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা। পদত্যাগী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, সীমান্ত গান্ধী, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, ডাঃ সীতারামিয়া এবং কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আচার্য কৃপালনী। যখন পদত্যাগের সংবাদ নিয়ে টেলিগ্রাম এল তখন রাষ্ট্রপতি তাঁর কলকাতার বাড়িতে প্রবল জ্বরে প্রায় হতচৈতন্য। দক্ষিণপন্থীদের এই অসহযোগ নীতিতে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, তাঁরা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে ইচ্ছুক। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সে শক্তি-পরীক্ষা হয়ে গেল। এদিকে ত্রিপুরী কংগ্রেসের মাত্র দুই এক সপ্তাহ বাকি। অথচ রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্যের অবস্থা উদ্বেগজনক। একটু সুস্থ হবার পর ২৬শে ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্র আলোচ্য বারোজন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন। না করে তাঁর পক্ষে উপায়ান্তর ছিল না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পদত্যাগকারী সদস্যেরা বেশ ভেবে-চিন্তেই এ-কাজ করেছিলেন। তিনি যদি তাঁদের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন, তাতে কোন কাজ হবে না। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের ৫২তম বার্ষিক অধিবেশন

হল। এ অধিবেশনও খুব জাঁকজমকপূর্ণ হয়েছিল। নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে ৫২টি হস্তিবাহিত রথে করে বিরাট শোভাযাত্রাসহকারে কংগ্রেসনগরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু সবকিছু পণ্ড হয়ে গেল রাষ্ট্রপতির অসুস্থতার জন্যে। তাঁর চিকিৎসকরা তো তাঁকে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতেই নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু দুঃসাহসী সুভাষচন্দ্র কোন নিষেধই কানে তুললেন না। তিনি অসুস্থ শরীরে অ্যাম্বুল্যান্স গাড়িতে ৬ই মার্চ নিঃশব্দে ত্রিপুরীতে প্রবেশ করলেন। তাঁর বদলে তাঁর বিরাট একটি প্রতিমূর্তিকে হস্তিবাহিত রথে স্থাপন করে শোভাযাত্রা বের করা হল।

গান্ধীজী প্রায় প্রত্যেক কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিলেও ত্রিপুরী কংগ্রেস যোগ দেননি। যখন ত্রিপুরী কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তখন তিনি দেশীয় রাজ্য রাজকোটে আমরণ অনশন করছেন। তাঁকে নিয়ে দেশব্যাপী উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। গান্ধীজীর রাজকোট অনশনের কারণ রাজকোটের শাসনকর্তা ঠাকুর সাহেবের চুক্তিভঙ্গ। ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে তাঁর রাজ্যের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তা তিনি পালন করতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। গান্ধীজীর অনুরোধ উপরোধও যখন তিনি শোনেননি, তখন গান্ধীজী আমরণ অনশন আরম্ভ করেন। দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঠাকুর সাহেবের চুক্তিভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠেছিল। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে ৫ই মার্চ নিখিল ভারত রাজকোট দিবস প্রতিপালিত হয়েছিল। এদিকে যখন এই অবস্থা ত্রিপুরীতে তখন অন্য নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। ভোটাধিক্যে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র সহসা বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে তাঁর সমর্থকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নন—সেখানে দক্ষিণপন্থীদের তরফ থেকে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ একটি প্রস্তাবে গান্ধীবাদে কংগ্রেসের আস্থা পুনর্জ্ঞাপন করলেন। এই প্রস্তাবে বলা হল যে, কংগ্রেস এ পর্যন্ত গান্ধীজীর নির্দেশক্রমে পরিচালিত হয়ে এসেছে এবং

ভবিষ্যতেও তার ব্যতিক্রম হবে না। কাজেই কংগ্রেস কর্মকর্তা পরিষদের উপর গান্ধীজী যাতে পরিপূর্ণ আস্থাশীল থাকতে পারেন, সেজন্যে রাষ্ট্রপতি যেন মহাত্মা গান্ধীর অনুমোদনক্রমে তাঁর ওয়ার্কিং কমিটি নির্বাচিত করেন। সুভাষচন্দ্রের সমর্থকদের বিরোধিতা ও সংশোধনী প্রস্তাব সত্বেও এই প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হল। এমনইভাবে নির্বাচিত সভাপতির স্বাধীন সত্তাকে সুদৃঢ় নিয়মের নিগড়ে বেঁধে দেওয়া হল। *

দুদিন পরে ১০ই মার্চ কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হল। তার পূর্বে রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্য সহসা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ে। জব্বলপুরের সাহেব সিভিল সার্জেন তাঁকে পরীক্ষা করে বললেন যে, অবিলম্বে তাঁর চিকিৎসার জন্যে তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা উচিত। কিন্তু সম্মুখের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে রেখে তিনি কিছুতেই হাসপাতালে যেতে রাজী হলেন না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর স্বাস্থ্যের উদ্বেগজনক অবস্থা দেখে তাঁকে হাসপাতালে যাবার অনুরোধ করায়, স্বাধীনতার এই বীর সৈনিক জবাব দিয়েছিলেন: 'আমি জব্বলপুরের হাসপাতালে যাবার জন্যে এখানে আসিনি। অধিবেশন শেষ হবার পূর্বে কোথাও স্থানান্তরিত হবার চেয়ে আমি এখানে মরাই বেশী পছন্দ করি।" এ সংকল্পের বিরুদ্ধে আর কথা চলে? কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনেও পন্থ-প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হল। যে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি এতদিন সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করে আসছিলেন, শেষ মুহূর্তে তাঁরাও সরে দাঁড়ালেন। এমনইভাবে ত্রিপুরী অধিবেশন শেষ হল। সুভাষচন্দ্র পন্থ-প্রস্তাব মেনে নিয়ে ভাবলেন যে, তিনি মহাত্মাজীর সঙ্গে পরামর্শ করেই তাঁর ওয়ার্কিং কমিটি মনোনীত করবেন। দিনের পর দিন চলে যেতে লাগল, কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি দেখা গেল না। কাজেই তাঁর পক্ষে ওয়ার্ধায় গিয়ে মহাত্মাজীর সংস্পর্শে আসা সম্ভব হয়ে উঠল না। এইভাবে কংগ্রেসে একটা সাময়িক অচল অবস্থার সৃষ্টি হল এবং তার জন্যে তাঁকে লোকনিন্দাও কম সহ্য করতে হল না।

অবশেষে তিনি ২৮শে এপ্রিল তারিখে কলিকাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আহ্বান করলেন। কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এই ঐতিহাসিক অধিবেশন হল। দক্ষিণপন্থীরা ত্রিপুরীর মতই সংখ্যায় অধিক ছিলেন। গান্ধীজীও এ অধিবেশন উপলক্ষে এসেছিলেন। গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতার সঙ্গে আলোচনা করে সুভাষচন্দ্র যখন বুঝলেন যে, তাঁদের সঙ্গে আপসরফা করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়, তখন তিনি স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দিলেন যাতে জাতীয় কংগ্রেসের কাজে কোন বাধা সৃষ্টি হতে না পারে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের জন্য অনেক অনুরোধ করলেন। কিন্তু সে অনুরোধে কাজ হল না। তার কারণ সুভাষচন্দ্র যখনই কোন বিষয়ে একবার মনস্থির করে ফেলতেন, তখন সে বিষয় থেকে তিনি এক ইঞ্চিও নড়তেন না। ফলে সুভাষচন্দ্রের স্থলে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন এবং মহাত্মা গান্ধীর অনুমোদনক্রমে তিনি তাঁর ওয়ার্কিং কমিটি মনোনীত করলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে এবং পরে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য নজির সৃষ্টি করে গেলেন।

সুভাষচন্দ্রের জীবন-পঞ্জী

২৩শে জানুয়ারী,	১৮৯৭	... জন্ম
	১৯১৩	... ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় দ্বিতীয়স্থান অধিকার
	১৯১৯	... বি. এ. উপাধি লাভ
সেপ্টেম্বর,	১৯১৯	... ইংলণ্ড যাত্রা
	১৯২১	... ভারত প্রত্যাবর্তন
১০ই ডিসেম্বর,	১৯২১	... গ্রেফতার
	১৯২২	... কারাবাস হইতে মুক্তিলাভ
১৪ই এপ্রিল,	১৯২৪	... কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
২৫শে অক্টোবর,	১৯২৪	... বঙ্গীয় ফৌজদারী আইন-সংশোধন অর্ডিনান্সে গ্রেফতার
২০শে ফেব্রুয়ারী,	১৯২৬	... মান্দালয়ে বন্দী অবস্থায় অনশন
৪ঠা মার্চ,	১৯২৬	... অনশন-ব্রত পরিহার
১৬ই মে,	১৯২৭	... কারাগার হইতে মুক্তি
২৮শে ডিসেম্বর,	১৯২৮	... হিন্দুস্থান সেবাদল কনফারেন্সের সভাপতি
২৩শে জানুয়ারী,	১৯৩০	... কারাদণ্ড
২২শে আগস্ট,	১৯৩০	... কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র
ডিসেম্বর,	১৯৩০	... দি বেঙ্গল স্বদেশী লীগ প্রতিষ্ঠা
২৬শে জানুয়ারী,	১৯৩১	... শোভাযাত্রাকালে পুলিশের লাঠিদ্বারা প্রহৃত
১লা জানুয়ারী,	১৯৩৩	... ইওরোপ যাত্রা
৮ই এপ্রিল,	১৯৩৬	... ৩নং রেগুলেশন অনুসারে গ্রেফতার
	১৯৩৮	... হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত
	১৯৩৯	... ত্রিপুরী কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত
২৪শে মার্চ,	১৯৪০	... রামগড়ে আপস-বিরোধী সম্মেলনের সভাপতি
জুন,	১৯৪০	... হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের আন্দোলন
২৬শে জানুয়ারী,	১৯৪১	... অন্তর্ধান-সংবাদ প্রচার
২১শে অক্টোবর,	১৯৪৩	... সিঙ্গাপুরে আজাদ্ হিন্দ্ গভর্নমেন্ট গঠন
১৮ই আগস্ট,	১৯৪৫	... তাই-হোকুতে বিমান দুর্ঘটনা ও মৃত্যু-সংবাদ প্রচার।